প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৩৬৭ (জুন ১৯৬০)

প্রকাশক : শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ
সাহিত্যলোক, ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ শিল্পী : অমিয় ভট্টাচার্য

মুদ্রক : শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিণ্টার্স, ৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

‘চেতনিক’-সম্পাদক

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সুহৃদ্বরেষু

নিবেদন

'লেখক পাঠক ও সমাজ' বই প্রকাশিত হলো। এই গ্রন্থে প্রকাশিত সমস্ত লেখাগুলির মধ্যেই একটি ঐক্যসূত্র বিদ্যমান— সমাজের সঙ্গে লেখক ও পাঠক এই দুই শ্রেণীর মানুষের গভীর যোগে ওই ঐক্যের ভিত্তি রচিত হয়েছে। প্রতিটি প্রবন্ধেই এই ত্রিকোণ সম্পর্কের কোন-না-কোন দিক দেখানো হয়েছে।

বেশীরভাগ প্রবন্ধই এই প্রথম গ্রন্থাকারে সংবদ্ধ হলো। কেবল "লেখক ও সমাজ" এবং "লিখিয়ে ও পড়িয়ে" এই দুটি প্রবন্ধ আমার পূর্বতন প্রবন্ধের বই 'সাহিত্যভাবনা' থেকে নেওয়া হলো। এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সঙ্গে ওই দুটি রচনার বিষয়বস্তুর নৈকট্য হেতুই তাদের এই বইয়ে স্থান দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, পাঠকের অবগতির জন্য জানাই, 'সাহিত্যভাবনা' বই এখন আর পাওয়া যায় না, কবেই তাব কপি নিঃশেষ হয়ে গেছে। সুতরাং এই পুনর্মুদ্রণ দোষাবহ নয় বলে মনে করি।

বইখানির প্রকাশে 'সাহিত্যলোক' প্রকাশন সংস্থার স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত নেপাল ঘোষ মুদ্রণ ও প্রচার এই দুই খাতেই যথেষ্ট যত্ন ও অভিনিবেশের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর সংস্থা থেকে আমার এই প্রথম বই বেরতে যাচ্ছে, স্বল্পকালীন পরিচয় মধ্যেই তাঁর আন্তরিকতায় ও পরিচালন নৈপুণ্যে আমি মুগ্ধ। এই সুযোগে তাঁকে আমার সধন্যবাদ প্রীতি ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি।

পাঠক মহলে বইখানির আকাঙ্ক্ষিত সমাদর হলে লেখক হিসাবে আমার শ্রম সার্থক মনে করবো।

নারায়ণ চৌধুরী

এই লেখকের ঃ

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ও অন্যান্য

সংগীত পরিক্রমা (৩য় সংস্করণ)

রাগসংগীত ও লোকসংগীত

কাজী নজরুলের গান

বাঙালীর গীতচর্চা

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র (২য় সং)

লিও টলস্টয় ঃ জীবন ও সাহিত্য (২য় সং)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য মূল্যায়ন

উত্তর-শরৎ বাংলা উপন্যাস

বরণীয় লেখক, স্মরণীয় সৃষ্টি

সমাজপ্রবাহে সাহিত্য

সুকান্তের কথা

সুস্থ সংস্কৃতির পক্ষে

কথাসাহিত্য

চতুরঙ্গ

Maharshi Devendranath Tagore

Saratchandra Chatterjee : His Life and Literature

সম্পাদিত গ্রন্থ

মানিক-সাহিত্য সমীক্ষা

সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতি

শিশুশিক্ষার ভাষা

অজয়গীতি-সংগ্রহ

ইত্যাদি

সূচীপত্র

বর্তমান লেখকদের সমস্যা

বর্তমান লেখকের সমস্যা অনেক। তার মধ্যে কতকগুলি পড়ে জীবিকার খাতে, কতকগুলি চিন্তার স্বাধীনতার খাতে। লেখকের জীবিকার সমস্যা অর্থাৎ বেঁচে-বর্তে থাকার সমস্যাটা কেবলমাত্র এখনকারই সমস্যা নয়, তা সব সময়েই লেখকের ভাগ্যের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে আছে। অর্থাৎ লিখনকর্ম থেকে জীবনধারণোপযোগী আর্থিক নিশ্চিন্ততা লাভের প্রশ্নে লেখককে সব সময়েই ভাবিত থাকতে হয়. বিব্রত থাকতে হয়, সদাসচেষ্ট থাকতে হয়— এটা কিন্তু আজকেরই নতুন সমস্যা নয়।

চিন্তার স্বাধীনতা লেখকের একটি মূলগত স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা ভিন্ন লেখকের লেখনী ধারণেরই কোন অর্থ হয় না। মানুষের বাঁচবার স্বাধীনতা যেমন তার জন্মগত অধিকার, লেখকের চিন্তার স্বাধীনতাও তেমনি লেখকের বৃত্তিগত অখণ্ডনীয় এক অধিকার। এ অধিকার তাঁর নিঃশ্বাস-বায়ুর তুল্য। মাছকে জল থেকে ডাঙায় তুললে যেমন তার খাবি খাওয়ার দশা হয়, স্বাধীনতার পরিমণ্ডল থেকে বিচ্যুত করে লেখককে বশ্যতার আবহাওয়ার মধ্যে টেনে আনলে তেমনি অসহনীয় দশা তাঁর হয়। সে-অবস্থায় তাঁব নিঃশ্বাস নিতেই কষ্ট হয়।

সৃষ্টিশীল লেখকদের সম্বন্ধে এ কথাটা আরও বেশী করে খাটে। 'সৃষ্টিশীল' বলতে এখানে আমি কবি নাট্যকার ঔপন্যাসিক গল্পলেখক প্রাবন্ধিক রম্যরচনা-কার সকলকেই বোঝাচ্ছি। কবি যদি তাঁর অন্তরের সত্য অনুভব ও কল্পনার মৌলিকত্বকে ভাষা দিতে নাই পারলেন তবে তাঁর কাব্যরচনা বৃথা। নাট্যকার গল্পকার ও ঔপন্যাসিক যদি তাঁদের রচনা কর্মের ভিতর চলমান সমাজের প্রকৃত রূপটি ফুটিয়ে তুলতে নাই পারলেন তবে তাঁদের কলম চালনা করাই নিরর্থক। তাঁরা চলমান সমাজ প্রবাহের ছবি না এঁকে গতদিনের ইতিহাসে আশ্রয় নিতে পারেন কিংবা চিত্র ও চরিত্রের রূপায়ণে বর্তমান জীবনের সঙ্গে অসম্পর্কিত অবাস্তব রোমান্টিকতার কুহক সৃষ্টি করতে পারেন, কিন্তু সেটা জীবন থেকে পালানোরই নামান্তর। লেখকের উপর যুগের দাবী বরাবরই অত্যন্ত বেশী। যে-যুগে যে-লেখক জন্মগ্রহণ করেন সেই যুগের কাছে সেই লেখকের একটা

বিশেষ ঋণ থাকে। সেই ঋণ স্বীকার ও পরিশোধ না করে লেখক যদি অব্যাহতি চেয়ে পরের কুমন্ত্রণায় প্রাচীন কাল অথবা মধ্যযুগের ইতিহাসে আশ্রয় গ্রহণ করেন কিংবা কাহিনীচয়নে ও চরিত্রসৃষ্টিতে নিছক বিশুদ্ধ রোমান্টিকতারই চর্চা করেন তাহলে যুগের দাবী পরিপূরণের কৃত্য থেকে তিনি ভ্রষ্ট হন। এ প্রায় অঙ্গীকার খেলাপ করারই সামিল এক বিচ্যুতি। একে পলায়নবাদী বিচ্যুতি ছাড়া বুঝি আর অন্য কোন নাম দেওয়া যায় না।

পক্ষান্তরে প্রাবন্ধিক সমালোচকরাও এক অর্থে সৃষ্টিশীল লেখক। সবাই নন, কেউ কেউ। গতানুগতিক ভাবধারার পুনরাবৃত্তি করাই যেসব প্রবন্ধকার বা সমালোচক তাঁদের রচনার সারকর্ম বলে জেনেছেন, সিলেবাস মিলিয়ে বই লেখা কিংবা অর্থ-পুস্তক লেখাই যাঁদের কাজের চোদ্দআনা অংশ জুড়ে আছে, সেইসব রোমন্থনধর্মী পুরানোর উপর দাগা বুলনো অধ্যাপকবর্গীয় লেখকদের কথা বলছি না ; বলছি তাঁদের কথা যাঁদের কাছে 'আইডিয়া' বা ভাব একটা অতিশয় জীবন্ত বস্তু এবং যাঁরা তাঁদের লেখায় আইডিয়াকে সমাজ-প্রগতি তথা সমাজ পরিবর্তনের পক্ষে একটা প্রধান হাতিয়ার স্বরূপ গণ্য করেন। 'আইডিয়ার অ্যাডভেঞ্চার' তাঁদের কাছে একটা মস্ত বড দামী জিনিস। এ কাজে তাঁরা অসীম স্ফূর্তি অনুভব করেন আর ওই স্ফূর্তির অনুভূতির মধ্য দিয়েই তাঁদের রচনায় সঞ্চারিত হয় সৃষ্টিশীলতার আবেগ। এ কাজ 'নোটমেকার' লেখকদের জন্য নয়, এর জন্য আলাদা গোত্রের প্রাবন্ধিক সমালোচকের প্রয়োজন।

ঠিক এই গোত্রেরই লেখক ছিলেন রুশো, ভলতেয়ার, ফরাসী এনসাইক্লোপিডিস্ট লেখকবর্গ, সুইফট, কার্ল মার্কস, এঙ্গেলস, বার্নার্ড শ, বার্টরাণ্ড রাসেল, রোমাঁ রোলাঁ প্রমুখ চিন্তানায়কগণ। তাঁদের পরস্পরের চিন্তার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে কিন্তু এই এক বিষয়ে তাঁদের মৌলিক মিল যে, তাঁরা প্রত্যেকেই চিন্তার স্বাধীনতায় বিশ্বাসী, উপর থেকে চাপানো কৃত্রিম বিধিনিষেধের দ্বারা তাঁদের লেখকব্যক্তিত্বকে তাঁরা খর্ব করতে দিতে নারাজ। ভলতেয়ারকে তাঁর চিন্তার স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য ফরাসী দেশ থেকে ইংলণ্ডে গিয়ে সাময়িক আস্তানা গাড়তে হয়েছে ; মার্কস তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তার দীপশিখাটি জ্বালিয়ে রাখতে গিয়ে জীবনে কী অসীম মূল্যই না দিয়েছেন বারবার— স্বীয় স্বদেশভূমি জার্মানী থেকে বিতাড়িত হয়ে ফ্রান্সে আশ্রয় নিয়েছেন, সেখানে অবস্থা অসহনীয় হয়ে উঠতে বেলজিয়ামে পালিয়ে গেছেন, সেখানেও টিকতে না পেরে ইংলণ্ডে

পাড়ি দিয়েছেন এবং জীবনের শেষভাগ এই ইংলণ্ডেই স্বেচ্ছা-নির্বাসনে কাটাতে বাধ্য হয়েছেন। এর সবই তিনি করেছেন এই একমাত্র উদ্দেশ্যে যে, চিন্তার স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্নে কোনমতেই কোন শক্তির কাছে বশ্যতা স্বীকার করা চলবে না, সর্ব অবস্থায়, এবং যে কোন মূল্যে, নিজের বিশ্বাসকেই আঁকড়ে ধরে থেকে লেখনী চালনা করে যেতে হবে। যুদ্ধ প্রচেষ্টার বিরোধিতা করবার দরুন প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধকালে রোলাঁকে তাঁর স্বদেশবাসীর হস্তে অনেক নিগ্রহ সহ্য করতে হয়েছিল। ফ্রান্সের তৎকালীন আবহাওয়া তাঁর নিকট পীড়াদায়ক বোধ হওয়ায় তিনি তাঁর জন্মভূমি থেকে বিদায় নিয়ে সুইজারল্যাণ্ডের 'ভিল-নভে' আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে নাৎসী বাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ হওয়ার আগে পর্যন্ত এখানেই জীবন অতিবাহিত করেন। চিন্তার স্বাধীনতাকে অব্যাহত রাখবার জন্যই তাঁর এই স্বেচ্ছা-নির্বাসন বরণ। বার্টরাণ্ড রাসেল সাম্যবাদী ছিলেন না, বরং সাম্যবাদের বিরোধীই তাঁকে বলা যায়। তিনি ছিলেন উদার মানবতাবাদী ঘরানার একজন বলিষ্ঠ ভাবুক। সেই রাসেল জীবনের সায়াহ্নভাগে পারমাণবিক যুদ্ধ সম্ভাবনা নিরোধের জন্য এবং ভিয়েত-নামে মার্কিন বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য স্বীয় লেখনীকে যে অতুলনীয় নির্ভীকতার সঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন তা বিবেকের স্বাধীনতার ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

এই রকম আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। জার্মানীতে নাৎসী অপশক্তির অভ্যুদয়ের কালে এবং দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ চলতে থাকা কালে জার্মানীর একাধিক প্রথম শ্রেণীর শিল্পী, বিজ্ঞানী ও মনীষী দেশ ছেড়ে দেশান্তরে শরণ নিয়ে তাঁদের বিবেকের স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখেন। এজন্য তাঁদের বহু ক্ষয়ক্ষতি নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে তবু তাঁরা হিটলারী জুলুমবাজীর কাছে আত্মসমর্পণ করেন নি। শাসক শক্তির অনুমোদিত চিন্তার দাসখতে সই করে তাঁরা তাঁদের আত্মাকে খোয়াতে একেবারেই রাজী ছিলেন না, তাই তাঁদের স্বভূমি থেকে স্বেচ্ছা-নিষ্ক্রমণ। এইরকম কিছু সাহসী বিবেকবান জার্মান শিল্পী, মনস্বী ও বিজ্ঞানী হলেন— আইনস্টাইন, ফ্রয়েড, টমাস মান ও তাঁর দাদা হাইনরিখ মান, হারমান হেস, স্টীফান ৎসাইগ প্রমুখ।

ইতালীতেও মুসোলিনির অত্যাচারে বহু লেখক ও চিন্তাচর্চাকারীকে কারারুদ্ধ অথবা দেশছাড়া হতে হয়েছিল। গ্রামচি, বেনেদেত্তো ক্রোচে এঁদের অন্যতম।

লেখকেরা দায়িত্বশীল নাগরিক। চিন্তায় সংযম রক্ষা করা সম্বন্ধে তাঁদের দীর্ঘদিনের মানসিক প্রস্তুতি রয়েছে, তাঁরা তদুপযোগী ভাষার অনুশীলনও করে এসেছেন বহুদিন যাবৎ। লেখ্যবৃত্তির আত্মআরোপিত অনুশাসন, লিখনকর্মের নিজস্ব বিধিবিধান বলে কতকগুলি কথা আছে। এসব ক্ষেত্রে তাঁদের অভিজ্ঞতাই চূড়ান্ত বলে গৃহীত হওয়া উচিত, কেননা তাঁদের অভিজ্ঞতা দীর্ঘ-বিস্তৃত ও প্রমাণিত। বিস্তৃত অধ্যয়ন ও ব্যাপক মনন তাঁদের সেই মূল্যবান অভিজ্ঞতার পিছনে একটি নির্ভরযোগ্য পশ্চাৎপটের মত বিরাজ করছে। এই ক্ষেত্রে তাঁদের দায়িত্ববোধকে মর্যাদা না দিয়ে যদি কোন বাইরের কর্তৃপক্ষ সেই মর্যাদা স্বয়ং আত্মসাৎ করতে চায় এবং লেখকদের কী লেখা উচিত বা অনুচিত সে-সম্বন্ধে খবরদারী করতে যায়, সে স্থলে ব্যাপারটা অনেকক্ষেত্রে দৃষ্টিকটু হয়ে ওঠে। অনধিকার-চর্চা বলেই এটা দৃষ্টিকটু। চোখের পক্ষে পীড়াদায়ক এবং মনের পক্ষে ক্লেশকর।

লেখ্যবৃত্তি একটা পবিত্র কর্ম। তার চেয়েও পবিত্রতর লেখকের স্বাধীনতা। আমি বাজারী পত্র-পত্রিকার ভাড়া-করা কলম চালিয়েদের লেখার কথা বলছি না, স্থিতাবস্থার সেবা ও মালিকের স্বার্থ পূরণের কাজে তাঁরা তাঁদের কলমকে ভোগ্যপণ্যের মত বিকিয়ে দিয়েছেন, সুতরাং তাঁদের কথা এক্ষেত্রে ওঠেই না। আমি সেই সব লেখকদের কথা বলছি— তা তাঁরা যিনি যে-বিভাগেরই লেখক হোন না কেন— যাঁরা সাম্য ও উদার মানবিকতার আদর্শে বিশ্বাসী, সাহিত্য-সেবাকে যাঁরা দেশ ও জাতির সেবার সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করেন, দেশের অগণিত জনমানুষের আনন্দ ও কল্যাণ বিধানে লেখনীকে সুফলপ্রসূরূপে ব্যবহার করতে যাঁরা নিজ নিজ বিবেকের কাছে দায়বদ্ধ। আর্ট এঁদের চোখে শৌখীনতা নয়, ব্যক্তিক খেয়াল চর্চার লক্ষ্যহীন লীলাবিলাস নয়, পরন্তু এক মহান সামাজিক কর্ম। এ কাজের পরতে পরতে গভীর দায়িত্ববোধ অনুস্যূত রয়েছে। সমাজ চৈতন্যের দ্বারা এ কাজ অনুপ্রাণিত, সমষ্টি ভাবনায় এ দীপ্ত। এমন কাজকে যে লেখকেরা তাঁদের জীবনব্রত রূপে গ্রহণ করেছেন, হেঁজিপেঁজি লেখকদের সঙ্গে তাঁদের এক করে দেখার উপায় নেই।

আমরা যাঁরা বাংলা ভাষার লেখক তাঁদের মাথার উপরে রয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ বরেণ্য পূর্বাচার্যগণ। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বিখ্যাত 'লেখকদের প্রতি উপদেশাবলী'র ভিতর লেখককে সব কিছুর উপরে

সত্যনিষ্ঠ হবার পরামর্শ দিয়েছেন। লেখক সত্য বলে যা অনুভব না করবেন তাকে যেন তিনি রচনায় গ্রথিত না করেন, মনীষী বঙ্কিমের নতুন লেখকদের প্রতি এই উপদেশ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আমাদের শিখিয়েছেন ভগবানের কাছে প্রার্থনার ভাষায়ঃ "ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা, / হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা / তোমার আদেশে / যেন রসনায় মম / সত্যবাক্য ঝলি উঠে খর খড়্গ সম / তোমার ইঙ্গিতে।" একই 'নৈবেদ্য' গ্রন্থের আর একটি কবিতায় পুনরায় মঙ্গলময়ের কাছে প্রার্থনার ভঙ্গীতে অন্তরের আকূতি জানাচ্ছেন এই বলেঃ "এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময় / দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয় / —লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর।" তৃতীয় আর একটি কবিতায় বলেছেনঃ "বীর্য দেহো ক্ষুদ্র জনে / না করিতে হীনজ্ঞান, বলের চরণে / না লুটিতে।" সবত্র কবির প্রার্থনার সুর এক। রাজভয়ই হোক আর লোকভয়ই হোক আর মৃত্যুভয়ই হোক, কোন ভয়কেই গ্রাহ্য করা চলবে না। ক্ষমতাবানের অনুগ্রহের অপেক্ষা না রেখে এবং নিগ্রহের পরোয়া না করে সত্যবাক্য খরখড়্গসম রসনায় ঝলসিত হয়ে উঠুক— এই যেন হয় সংকল্প। অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে সে তৃণসম দগ্ধ হওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তি, সে যেন সমাজের কোন প্রশ্রয় না পায়। এমন বীর্য চাই, যা বলের চরণে লুটবার হীনতা থেকে অন্তরকে রক্ষা করে।

এসব কথা কবি সকল স্তরের ভারতবাসীকে লক্ষ্য করেই উচ্চারণ করেছেন। সাধারণ পর্যায়ে ভারতবাসী সম্পর্কে এ সকল কথা যদি প্রযোজ্য হয়ে থাকে তো লেখকদের প্রতি এ সকল কথা আরও কত বেশী প্রযোজ্য সে কথা সহজেই অনুমান করা চলে। কেননা লেখকেরা সমাজের সব চাইতে জাগ্রত অংশের প্রতিনিধি-স্থানীয়। কবি ভাবুক চিন্তাশীল দার্শনিকদের মন আগে ক্রিয়া করে, তারপর সেই ভাব জনজীবনে আস্তে আস্তে ছড়ায়। সবচাইতে প্রবল ভাব সবচেয়ে বেশীদূর ছড়ায়, সবচেয়ে গভীরে ছড়ায়। ভাব আগে, কাজ পরে। ভাবের পৃষ্ঠপটেই আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি হয়। রুশো, ভলতেয়ার, দিদেরো, হলবাক প্রমুখ লেখকগণ ফরাসী মানসের জমিতে যথাকালে উপযুক্ত ভাবের বীজ ছড়িয়ে ছিলেন বলেই পরবর্তী সময়ে সেই জমি থেকে ফরাসী বিপ্লবের ফসল উঠে এসেছিল। মার্কস, এঞ্জেলস প্লেখানভ, লেনিন, ট্রটস্কি, স্টালিন প্রমুখ প্রসিদ্ধ রাষ্ট্র ও সমাজবিজ্ঞানী লেখকগণ অকুতোভয়ে বিপ্লবের বাণী প্রচার করেছিলেন বলেই

রুশ বিপ্লব সম্ভব হতে পেরেছিল।

নির্ভীকতা লেখকশ্রেণীর বৃত্তিগত যোগ্যতার প্রথম সর্ত। এই সর্ত পালন না করলে আর যাই হওয়া যাক না কেন, লেখক হওয়া যায় না। সাহিত্য একটা ব্রত, একটা 'মিশন', একটা কাম্যকর্ম। যাঁকে-তাঁকে দিয়ে এ কাজ হয় না। এর জন্য সম্যক্ পূর্বপ্রস্তুতি দরকার। ভয়হীনতা এই পূর্বপ্রস্তুতির একেবারে গোড়াকার কথা।

অপরাজেয় কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র তাঁর 'তরুণের বিদ্রোহ' গ্রন্থের 'সত্য ও মিথ্যা' প্রবন্ধের এক জায়গায় লিখেছেন— "একদিন এ দেশ সত্যবাদিতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, কিন্তু আজ ইহার দুর্দশার অন্ত নাই। সত্য-বাক্য সমাজের বিরুদ্ধে বলা যেমন কঠিন, রাজশক্তির বিরুদ্ধে বলা ততোধিক কঠিন। সত্য লেখা যদি বা কেহ লেখে, ছাপাওয়ালারা ছাপিতে চায় না ; —প্রেস তাহাদের বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে। লেখা যাঁহাদের পেশা, জীবিকার জন্য দেশের সংবাদপত্রের সম্পাদকতা যাঁহাদের করিতে হয়, অসংখ্য আইনের শতকোটি নাগপাশ বাঁচাইয়া কি দুঃখেই না তাঁহাদের পা ফেলিতে হয়। মনে হয় প্রত্যেক কথাটি যেন তাঁহারা শিহরিতে শিহরিতে লিখিয়াছেন। মনে হয় রাজকোষে প্রত্যেক ছত্রটির উপর দিয়া যেন তাঁহাদের ক্ষুব্ধ ব্যথিত চিত্ত কলমটার সঙ্গে নিরন্তর লড়াই করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছে। তবুও সেই অতি সতর্ক ভাষার ফাঁকে ফাঁকে যদি কদাচিৎ সত্যের চেহারা চোখে পড়ে তখন তাহার বিক্ষত, বিকৃত মূর্তি দেখিয়া দর্শকের চোখ দুটাও যেন জলে ভরিয়া আসে। ভাষা যেখানে দুর্বল শঙ্কিত, সত্য যে দেশে মুখোস না পরিয়া মুখ বাড়াইতে পারে না, যে রাজ্যে লেখকের দল এতবড় উঞ্ছবৃত্তি করিতে বাধ্য হয়, সেদেশে রাজনীতি, ধর্মনীতি, সমাজনীতি সমস্তই যদি হাত ধরাধরি করিয়া কেবল নীচের দিকেই নামিতে থাকে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কি আছে?"

একটু বিস্তারিতভাবে উদ্ধৃতি দেওয়া গেল, কিন্তু সেটা এই বোঝাবার জন্য যে, আমাদের দেশে লেখকদের স্বাধীনতা কত বাধানিষেধের দ্বারা সচরাচর কণ্টকিত।

এরকম অবস্থায় যে লেখকের স্বাতন্ত্র্য-স্পৃহা ক্রমেই নিম্নাভিমুখী হতে থাকবে সে তো একপ্রকার অবধারিত বলা চলে।

তারপরই শরৎচন্দ্র আর একটু অগ্রসর হয়ে লিখেছেন— "যে রাজ্যের শাসন-

তন্ত্রে সত্য নিন্দিত, যে দেশের গ্রন্থকারকে জানিয়াও মিথ্যা লিখিতে হয়—লিখিয়াও ভয়ে কণ্টকিত হইতে হয়, সে দেশে মানুষে গ্রন্থকার হইতে চায় কেন?" সত্যই তো, সে দেশে মানুষ গ্রন্থকার হতে চায় কেন? সে দেশের অসত্য সাহিত্য রসাতলে ডুবে গেলে কার কী ক্ষতি? সত্যহীন দেশে ততোধিক সত্যহীন সাহিত্যের দ্বারা কার কোন্ চতুর্বর্গ ফললাভ হবে? শরৎচন্দ্র এই অস্বস্তিকর প্রশ্নই সকলের সামনে তুলে ধরেছেন উপরের উদ্ধৃতির মাধ্যমে।

এ তো গেল শরৎচন্দ্রের বক্তব্য, এবার প্রমথ চৌধুরী মহাশয় কী বলে গেছেন সেটা একবার পরখ করা যাক। তিনি বলেছেন—"ঘুমন্ত মনকে জাগিয়ে তোলাই সাহিত্যের কাজ।" সেই কাজটা কি আমাদের দেশের সাহিত্যের দ্বারা বিধিমতে নিষ্পন্ন হচ্ছে? একেই তো দেশবাসী জরা ও কুসংস্কারের প্রকোপে ঘুমে অচেতন। তার উপরে যদি সেই অচৈতন্য দেহটাকে বিধিনিষেধের নাগপাশে সাতপাকে বেঁধে আরও বেশী অসাড় করে তোলার আয়োজন হয়, তাহলে সাহিত্যিক কেমন করে সেই গাঢ় মোহনিদ্রার অবসান ঘটাবেন? যে ডাকে ঘুম ভাঙবে, সে ডাকটাও যদি নানা শাসন বারণের চাপে ক্ষীণকণ্ঠ হয় তবে ঘুমন্তের কানে সাড়া জাগবে কী করে? আর কানে সাড়া না জাগলে প্রাণেই বা সাড়া জাগে কী উপায়ে?

পুঁজিবাদী সমাজে লেখকের অবস্থান

পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থায় লেখকের ভূমিকার গুণাগুণ নির্ভর করে তাঁর অবস্থানের উপর। অর্থাৎ লেখক কোন্ পক্ষে তাঁর লেখনীর শক্তি প্রয়োগ করবেন তা দেখে বিচার করতে হবে লেখক ভাল কি মন্দ। ভাল কি মন্দ, অর্থাৎ প্রগতিশীল কি প্রতিক্রিয়াশীল। লেখক যদি যাকে বলে 'এস্টাব্লিশমেণ্ট' তার সেবক হন, তিনি যদি স্থিতাবস্থার পক্ষে কলম চালান এবং কায়েমী স্বার্থের পোষকতা করেন, তাহলে তাঁর যতই লিখন ক্ষমতা থাকুক না কেন, তাঁকে সত্যিকারের সৎ লেখক বলা যাবে না। পক্ষান্তরে কোন লেখক যদি পরাক্রান্ত শ্রেণীগুলির বিরুদ্ধে এবং শোষিত অত্যাচারিত শ্রেণীগুলির পক্ষে লেখনী চালনা করেন এবং এ পথে বহু বাধাবিপত্তি জেনেও তা থেকে নিবৃত্ত না হন তাহলে তাঁর ভূমিকাকে আন্তরিক স্বাগত জানাবার জন্য আমাদের সর্বদাই প্রস্তুত থাকতে হবে। তিনিই সেই লেখক যিনি তাঁর সামাজিক দায়িত্ব পালন করেন, মানুষের প্রতি তাঁর যে দায়বদ্ধতা আছে তার বাধ্যবাধকতা স্বীকার করে নিয়ে সেই বাধ্যতার অনুযায়ী লেখনীর শক্তিকে গড়ে তোলেন।

এই থেকে যে জিনিসটা বেরিয়ে আসে তা হলো এই যে, সত্যিকারের সৃজনশীল লেখক কখনও ক্ষমতাবানের ভজনা করেন না, তাঁর স্থান সর্বদাই নিপীড়িত ও নির্যাতিত শ্রেণীগুলির পাশে। এ কথা আমরা আমাদের সাহিত্যের দৃষ্টান্ত থেকেও বোঝাতে পারি, বিশ্বসাহিত্যের দৃষ্টান্ত দিয়েও বোঝানো যায়। আমাদের সাহিত্যের বিদ্যাসাগর, মাইকেল, অক্ষয়কুমার, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র, সত্যেন দত্ত, নজরুল, মানিক-সুকান্ত প্রমুখ গণনীয় লেখক মাত্রেই মানবতার পক্ষে, প্রগতিশীলতার পক্ষে, কেউ কেউ সুস্পষ্ট-রূপে দলিত-শোষিত শ্রেণীর পক্ষে তাঁদের লেখনীর শক্তি প্রয়োগ করে গেছেন। সমাজে অগ্রসর চিন্তার বিস্তৃতির অনুকূলে তাঁদের প্রভাব বিস্তার করেছেন। মানবতার পক্ষে ছিলেন বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, সত্যেন দত্ত প্রমুখ লেখকবর্গ; প্রগতিশীল র‍্যাডিকাল চিন্তার পক্ষে ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত এবং দলিত-পীড়িত-আর্ত শ্রেণীগুলির নরনারীর দুঃখ-বেদনাকে ভাষা দিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র, নজরুল, মানিক, সুকান্ত প্রভৃতি শ্রেণী-

সচেতন দরদী লেখককুলের সবচেয়ে বিশ্বস্ত প্রতিনিধিগণ।

এই তালিকায় বঙ্কিমচন্দ্রকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু এই অন্তর্ভুক্তি কিছুটা সর্তাধীন। বঙ্কিম-ব্যক্তিত্ব দ্বিধাবিভক্ত। যখন পর্যন্ত তিনি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা সম্পাদনা করছিলেন (১৮৭২-৭৬) তখন পর্যন্ত তিনি প্রগতিশীল ভাবের ভাবুক। কিন্তু যখন থেকে তিনি 'প্রচার' ও 'সাধারণী' পত্রিকার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করলেন এবং 'অনুশীলন' তত্ত্বের ভাব প্রচারে ব্যস্ত হলেন তখন থেকে তাঁর আর এক রূপ। উদীয়মান নয়া বুর্জোয়া হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিভূরূপে তিনি হিন্দুধর্ম ও সমাজের রক্ষণশীল ধ্যান-ধারণাগুলিকে একই কালে প্রচার করতে লেগে গেলেন। অর্থাৎ নবোদ্ভূত জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বতোবিরোধগুলি তাঁর মধ্যে ক্রিয়া করতে থাকল। রাষ্ট্রিক চিন্তায় তিনি দেশের আধুনিকীকরণের পক্ষে এবং ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার সুফলগুলিকে আত্মস্থ করতে ব্যাকুল এবং দেশবাসীকে তদনুরূপ পরামর্শ দানেও অগ্রণী; কিন্তু সামাজিক চিন্তায় তিনি সনাতন হিন্দু ভাবধারার উদ্গাতা। আধুনিকতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতার মধ্যে এই দোলাচলচিত্ততা বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ বয়সের রচনাবলীকে প্রগতিশীল ভাবধারার সমর্থকদের কাছে কিয়ৎপরিমাণে অগ্রহণীয় করে রেখেছিল। যদিও এ কথা একশোবার মানব, বঙ্কিমচন্দ্র অসাধারণ শক্তিশালী লেখক।

বিদেশী সাহিত্য, বিশেষ করে রুশ ও ফরাসী সাহিত্যের উদাহরণ থেকে দেখানো যায় কেমন করে ওই দুই দেশের গণনীয় লেখকেরা মানবমুক্তির জন্য এবং নির্যাতিত শোষিত শ্রেণীর ভাগ্যোন্নয়নের জন্য তাঁদের লেখনীর শক্তি পরিচালনা করে গেছেন। রুশ সাহিত্যের কাব্যে ও কথা সাহিত্যে পুশকিন, লার্মন্টভ, গোগোল, ডস্টয়েভস্কি, গনচারভ, টুর্গেনিভ, টলস্টয়, গর্কি, শেখভ, ইলিয়া এরেনবুর্গ, আলেক্সি টলস্টয়, শোলোকভ, মায়কোভস্কি প্রভৃতি এবং ফরাসী সাহিত্যের কাব্যে ও কথা সাহিত্যে এবং সমাজ চিন্তা মূলক রচনায় রুশো, ভলতেয়ার, ভিক্টর হুগো, লা ফঁতেন, বালজাক, আনাতোল ফ্রান্স, জোলা, মোপাসাঁ, রমা রলাঁ, আঁরি বারবুস, সার্ত, কামু প্রমুখ লেখক শিল্পীগণ মুখ্যতঃ এমনভাবে তাঁদের কাব্য, উপন্যাস ও সমাজ সমালোচনা আদি রচনা করে গেছেন যাতে জ্ঞাতসারে হোক অজ্ঞাতসারে হোক ফরাসী সমাজের অগ্রগতির কাজটিকে তাঁরা বহুগুণ ত্বরান্বিত করেছেন, তাঁদের কেউ কেউ কখনো কখনো বিপ্লবের পক্ষেও সুস্পষ্ট প্রণোদনা জুগিয়েছেন। যথা রুশো ও ভলতেয়ার। এঁরা দুজন বুর্জোয়া

সমাজের প্রতিনিধি হয়েও শুধুমাত্র বৈপ্লবিক ভাবের আবেগে নিজ নিজ পথে এমন সজোরে ফরাসী সমাজের গোড়া ধরে নাড়া দিয়েছিলেন, যে তাঁদের তিরোধানের কিছুকালের মধ্যে দেখতে দেখতে ফরাসী দেশে আগুন জ্বলে উঠল এবং রাজন্য-অভিজাত-যাজক শাসিত ফরাসী সমাজ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। 'কমেডি হিউমেইন' উপন্যাসমালা ও অগণিত ছোটগল্পের লেখক বালজাক অভিজাত না হয়েও অভিজাত শ্রেণীতে প্রমোশন পাবার জন্য অশোভন ভাবে ব্যগ্র ছিলেন, নিজের নামের সঙ্গে মিথ্যা 'ব্যারন' উপাধিটি জুড়ে দিতে ভালবাসতেন ; কিন্তু এমনি তাঁর শিল্পের মহিমা যে তাঁর লেখনীর তুলিকাপাতে অভিজাত ফরাসী সমাজের সত্য চিত্র ও সেই চিত্রে প্রতিফলিত ফরাসী সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীগুলির অবস্থান ও পারস্পরিক সম্পর্কের নির্ভুল নিশানা সাহিত্যে সমাজ বাস্তবতার তত্ত্বটিকে অভ্রান্তরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। বালজাক অচেতনভাবে সমাজবিপ্লবের অন্যতম হোতার ভূমিকা পালন করে গেছেন, যেজন্য মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিন বারবার তাঁর লেখার প্রশংসা করে গেছেন।

বালজাকের দৃষ্টান্ত থেকে আরও একটি বস্তুর প্রমাণ হয়। সেটা এই যে, শ্রেণীস্বরূপের দিক থেকে বিচার করলে যে-লেখক বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি স্থানীয় শিল্পী, তিনিও ইচ্ছা করলে এবং অন্তরে সদভিপ্রায় থাকলে অবনত শ্রেণীর লোকেদের মঙ্গলের জন্য তাঁর শিল্পের প্রভাব প্রয়োগ করতে পারেন। এ কথার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত টলস্টয়। টলস্টয় অভিজাত পরিবারের সন্তান ছিলেন, 'কাউন্ট' উপাধিধারী একজন ধনাঢ্য জমিদার ছিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি ছিলেন মানবতার শ্রেষ্ঠ আদর্শে উদ্বুদ্ধ ও শোষিত শ্রেণীর মানুষদের প্রতি অপরিমেয় দরদে ভরা একজন সত্যিকার জনকল্যাণকামী লেখক সেই কারণে তাঁর লেখায় জার-শাসিত উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের রুশ সমাজের প্রকৃত প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছিল দর্পণে প্রতিফলিত মানুষের যথার্থ মুখচ্ছবির মত। সত্য বটে টলস্টয়ের আমলের রুশ সমাজ ছিল সর্বাংশে কৃষিকেন্দ্রিক সমাজ, রাশিয়ায় তখন পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার অঙ্গস্বরূপ কল-কারখানার অথবা ভারী শিল্পের সামান্যই পত্তন হয়েছে। কিন্তু লেখক যদি মানবপ্রেমী হন এবং সত্যের প্রতি তাঁর প্রবল অনুরাগ থাকে, তাহলে সামন্ততান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থার আওতার মধ্যে থেকেও তাঁর বাস্তবতা চর্চার অন্তরায় হয় না এবং তিনি তাঁর সাহিত্যে মানবিকতার শ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটাতে সমর্থ হন। টলস্টয় রুশ কৃষকের শ্রেষ্ঠ বন্ধু ছিলেন এবং তাদের

দুঃখ-বেদনা অভাব-অভিযোগ শোষণ-বঞ্চনাকে জীবন্ত শিল্পরূপ দিয়েছেন তাঁর বিবিধ গল্প-উপন্যাসের কায়ার ভিতর। ১৮৬১ সালের সম্রাট আলেকজাণ্ডারের প্রবর্তিত ভূমিসংস্কার (সার্ফ মুক্তি যার প্রধান অঙ্গ ছিল)-এর সময় থেকে ১৯০৫ সালের ব্যর্থ বিপ্লবের সময় পর্যন্ত প্রসারিত কালপরিধির মধ্যবর্তী রুশ কৃষিসমাজের সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত চিত্রকর ছিলেন টলস্টয়। ওই সমাজের ক্ষোভ বঞ্চনা অবদমন অত্যাচার শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মনোভাব সব কিছুকে তিনি রূপ দিয়েছেন তাঁর অনুপম সৃষ্টিগুলির মধ্যে। তিনি হয়ত রক্তক্ষয়ী বিপ্লব সমর্থন করতেন না এবং আরও যদি সাত বৎসর বেঁচে যেতে পারতেন (তাঁর মৃত্যু হয় ১৯১০ সালে) তাহলে সোভিয়েট বিপ্লবকে তিনি কী চোখে দেখতেন সে কথাও নিশ্চয় করে বলা যায় না। তবে তাঁর শিল্পের এমনিই মহিমা যে, তিনি জেনে হোক না জেনে হোক আমৃত্যু বিপ্লবেরই বাণী প্রচার করে গেছেন তাঁর রচনার ধারার মধ্য দিয়ে; শুধু তাই নয়, বিপ্লবের পথও প্রশস্ত করে গেছেন। বিপ্লবীদের কর্মপন্থা সমর্থন না করলেও বিপ্লবীদের প্রতি টলস্টয়ের একটা গোপন মমতা ছিল। এ কথা বোঝা যায় 'রেজারেকশন' উপন্যাসে অঙ্কিত তরুণ বিপ্লবীদের স্নেহসিক্ত আলেখ্যায়নের সাক্ষ্য থেকে। লেনিন টলস্টয় সাহিত্যকে বলেছেন "রুশ বিপ্লবের দর্পণ"। এ কথা যে কতদূর খাঁটি তা উপরের বিশ্লেষণ অনুধাবন করলেই উপলব্ধি করা যেতে পারে।

মার্কসীয় সমাজ বিজ্ঞানের সূত্র অনুযায়ী মানব সমাজ পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উপনীত হওয়ার আগে কয়েকটি বিবর্তনের স্তর অতিক্রম করে এসেছে। যথা আদিম কৌম সমাজ, দাস সমাজ, সামন্ত সমাজ, পুঁজিবাদী সমাজ, ইত্যাদি। আবার পুঁজিবাদী সমাজের অবধারিত পরিণতিতে আছে সমাজতান্ত্রিক সমাজ, সাম্যতন্ত্রী সমাজ, অবশেষে বিবর্তনের চূড়ান্ত পর্যায়ে সম্পূর্ণ শ্রেণীহীন সমাজ। ধাপে ধাপে এই যে পরিবর্তনগুলি দেখা যায় তার সঙ্গে অর্থনীতির অতি নিকট সম্পর্ক। যে-কালে যে-ধরনের উৎপাদন ব্যবস্থা বলবৎ থাকে সে-কালে সে-ধরনের সমাজ বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করে। গ্রীস ও রোমের রাষ্ট্রিক কাঠামোর মূলে ছিল দাসশ্রমের উপর নির্ভরতা। আমাদের দেশের গোটা মধ্যযুগ জুড়ে ছিল সামন্ত-তান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থার সঙ্গে অপরিহার্যরূপে জড়িত তেমনিধারা উৎপাদনের প্রকরণ।

ভারতবর্ষের রাজন্যতন্ত্র, যাজকতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র সব এই সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার কোটর থেকে উদ্ভূত। ব্রিটিশ আমলের জমিদাররা ছিল সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার শেষ পর্যায়ের সৃষ্টি। তাদের বিলয় অবধারিত ছিল। পুঁজিবাদ এ দেশে ভাল করে শিকড় গেড়ে বসতে আজ তাদের অবলোপ প্রায় চূড়ান্ত। পুঁজিবাদ এসেছে অষ্টাদশ শতকের ইউরোপখণ্ডে সংঘটিত শিল্পায়িতকরণের সূত্রে ও তার হাত ধরে। শিল্পায়িতকরণের প্রক্রিয়ার অচ্ছেদ্য অঙ্গস্বরূপ কল-কারখানার সংখ্যা যত বেড়েছে তত বেশী পুঁজিবাদ বা ধনবাদ বিস্তৃতি লাভ করেছে। আজ ভারতের অর্থনীতি মূলতঃ পুঁজিবাদ নিয়ন্ত্রিত, যদিও গ্রামাঞ্চলগুলিতে সামন্ত-তন্ত্রের অবশেষ এখনও টিকে রয়েছে এবং এই তন্ত্র নিজের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রাণপণ অর্থাৎ দাঁত্মুখ-খিঁচোনো সংগ্রাম করে চলেছে। বাতিল জমিদার, জোতদার, তালুকদার প্রভৃতি মধ্যস্বত্বভোগী এতকালের সুবিধাপ্রাপ্ত সমাজের লোকেরা সব একজোট হয়েছে গ্রামের কৃষক-জাগরণকে ঠেকাবার অপচেষ্টায়। কিন্তু তাদের মৃত্যুর ঘণ্টাধ্বনি বেজে গেছে, তাদের আসন্ন নিশ্চিত ধ্বংসের সমাধিভূমির উপর জেগে উঠেছে গ্রাম-পঞ্চায়েতের উত্তুঙ্গ সৌধ।

মার্কসীয় বিশ্লেষণ অনুযায়ী আরও দেখা যায় যে, উৎপাদন-ব্যবস্থার প্রকার-ভেদের দ্বারা নিরূপিত সমাজের উপরিতলার কাঠামোয় থাকে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রভৃতি সুকুমার কলাসমূহ ; নীচুতলায় অর্থনীতির বুনিয়াদ। অর্থনীতি গোটাসমাজ কাঠামোরই ভিত্ স্বরূপ কাজ করে। উপরতলার শিল্প-সংস্কৃতির রূপ নিয়ন্ত্রিত হয় তত্তৎ সময়ের উৎপাদনভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার রূপের দ্বারা। যেমন দাস সমাজে লেখকদের ভূমিকা ছিল অভিজাততন্ত্রের তথা মুষ্টিমেয় ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীর জয়গান করা। গ্রীসদেশের দাসশ্রমপুষ্ট নগর রাষ্ট্রগুলিতে শিল্পীদের কবিদের দার্শনিকদের নাট্যকারদের অভিজাততন্ত্রের মহিমা কীর্তন করাই ছিল অভ্যস্ত ভূমিকা। সক্রেটিশ এই ভূমিকা পালনে অস্বীকার করেছিলেন বলে তাঁকে বিষপান করে জীবন-আহুতি দিতে হলো। মধ্যযুগের ইউরোপে যাজকতন্ত্রের দাপট এত প্রচণ্ড ছিল যে তার বিরুদ্ধে টু শব্দটি করবার উপায় ছিল না। করলে প্রভূত নিগ্রহ ভোগ করতে হতো, কখনো কখনো 'স্টেক'এর আগুনে পুড়ে মরতে হতো। সূর্য আর পৃথিবীর পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে পুরাতন ভ্রান্ত টলেমীয় মতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে গিয়ে খৃষ্টীয় যাজকদের রোষের শিকার হয়ে গ্রহবিজ্ঞানী ব্রুনোকে অগ্নিদাহে প্রাণ দিতে হয়েছিল। গ্যালিলিওর ভাগ্যে

কী দুর্ভোগ ঘটেছিল তার ইতিহাস সকলেই জানেন। কোপারনিকাশ, কেপলার প্রভৃতি সত্যসন্ধ গ্রহবিজ্ঞানীদের অবশ্য এতটা ভোগান্তি পোয়াতে হয়নি তবে কেপলারের সময়ে মধ্যযুগের অন্ধকার অনেকটা ফিকে হয়ে এসেছিল এবং ইউরোপ খণ্ডে রেনেসাঁস-এর পদপাত শুরু হয়ে গিয়েছিল। এক সময়ে রেনেসাঁস-এরই সহযাত্রী হয়ে আসে শিল্পায়িতকরণ। পশ্চিমী দুনিয়ার প্রচলিত উৎপাদন ব্যবস্থার বদল ঘটে, তার ফলে সমাজেরও সেইমত পরিবর্তন সাধিত হয়। সামন্ততন্ত্র থেকে সমাজ ধনতন্ত্রে উন্নীত হয়।

আমাদের দেশের মধ্যযুগেও কমবেশী একই অবস্থা সামন্ততন্ত্রের একচ্ছত্র আধিপত্য চোখে পড়ে। তবে এখানে যাজকতন্ত্র বা পুরোহিত তন্ত্রের যত না ক্ষমতা তার চেয়ে বেশী ক্ষমতার ধারক ছিল রাজন্যতন্ত্র জায়গীরতন্ত্র প্রভৃতি ভূমি-ভিত্তিক প্রচুর সুবিধা-সুযোগের অধিকারী মালিকের দল। মধ্যযুগের ভারতবর্ষে সম্রাট, রাজচক্রবর্তী, রাজা বাদশা, নবাববর্গের ব্যক্তিদের তো কথাই নেই, বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে নিবদ্ধ সামন্তসর্দার বা জায়গীরদারদের ক্ষমতার কোন সীমা-পরিসীমা ছিল না। এঁদের এই অপ্রতিহত ক্ষমতার কাছে কবিদের বশ্যতা স্বীকার করা ছাড়া উপায় ছিল না। বশ্যতা স্বীকার না করলে অনশন অথব নির্বাসন, এমন কি মৃত্যু অবধারিত ছিল।

এই জন্যই দেখা যায় মধ্যযুগের সব কবিই কম বা বেশী পরিমাণে রাজার বন্দনাকারী। রাজস্থানের চারণ কবিরা ও ভাটেরা রাজপুত রাজা ও রাজপুত্রদের শৌর্য-বীর্য সাহসিকতার কীর্তনে মুখর। বাংলা মঙ্গলকাব্যের কবিরা সরস্বতী বন্দনার পাশে পাশে রাজবন্দনাতেও প্রায় সমান তৎপর ছিলেন। গৌড়ের বিদ্যোৎসাহী পাঠান সুলতান হুসেন শাহের মাহাত্ম্যের উদ্‌ঘোষণে শ্রীকর নন্দী সন্ধ্যাকর নন্দী পরাগল খাঁ প্রমুখ কত যে কবি লেখনীমুখে গদ্‌গদ হয়েছিলেন তাঁর ইয়ত্তা নেই। এরকম হবার একটা কারণ এই যে, সে সময়কার কবিদের নিজের ও তাঁদের পরিবারস্থ মানুষজনদের ভরণ পোষণের জন্য রাজা বা আঞ্চলিক জায়গীরদারের বদান্যতার উপর একান্তরূপে নির্ভর করতে হতো। এঁদের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া কবিদের টিকে থাকার যো ছিল না। রাজাদের আশ্রয়ে ও তাঁদের দত্ত ভূমিখণ্ডে কবিদের দিনগুজরান চলতো। সুতরাং দাতার প্রশস্তি গাওয়া ছাড়া কবিদের গত্যন্তর ছিল না। যে কবি রাজার বা সামন্ত-প্রভুর ক্রোধের উদ্রেক করতেন তাঁর কপালে অশেষ ভোগান্তি ছিল। দৃষ্টান্ত-

স্বরূপ, মুকুন্দরামের ও ভারতচন্দ্রের উল্লেখ করা যায়। কোনও কারণে চণ্ডী-মঙ্গলের কবি কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম তাঁর অঞ্চলের জায়গীরদারের কোপে পড়েছিলেন, তাঁকে আত্মরক্ষার্থে স্বগ্রাম দামুন্যা ছেড়ে পালাতে ও অন্যত্র গিয়ে বাস করতে হয়। অন্নদামঙ্গলের কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র বর্ধমানরাজের রোষের বলি হয়ে স্বীয় জন্মভূমি পেড়ো গ্রাম ত্যাগ করে স্থান থেকে স্থানান্তরে পরিভ্রমণ করে অবশেষে নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজদরবারে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। কিন্তু ভবী ভোলবার নয়। বর্ধমানরাজের প্রশস্তি কীর্তনের বাধ্যবাধকতা থেকে যদিবা তিনি অবস্থাচক্রে রক্ষা পেয়েছিলেন, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের স্তুতিবাদ করা থেকে রক্ষা পাননি। শুধু তাই নয়, তৎকাল প্রচলিত রাজসভার অপকৃষ্ট রুচির কাছে ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল। এই ভাবেই 'অন্নদা-মঙ্গল' কাব্যের 'বিদ্যাসুন্দর' অংশের জন্ম।

সামন্তযুগে কবিদের অবস্থা যে কত অসহায় ছিল এ থেকে তার প্রমাণ মেলে। মধ্যযুগের সামন্ততন্ত্রীয় ট্রাডিশন ব্রিটিশ আমলেও কম-বেশী অব্যাহত ছিল। রাজা-মহারাজ জমিদারদের প্রশস্তি কীর্তন করে কাব্য-কবিতা রচনা করবার রেওয়াজ এই সেদিন পর্যন্ত বলবৎ ছিল দেখা যায়। ত্রিপুরা রাজ, বর্ধমান রাজ, কাশীমবাজার রাজ, নাটোর রাজ, দীঘাপাতিয়া রাজ, মহিষাদল রাজ, নাড়াজোল রাজ, পাইকপাড়া রাজ, হেতমপুর রাজ প্রভৃতি রাজা ও জমিদার বংশগুলির পৃষ্ঠপোষকতায় কত যে গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়েছে তার সীমা-সংখ্যা নেই। এরূপ স্থলে সংশ্লিষ্ট লেখকদের বশংবদ ভূমিকা সহজেই অনুমান করে নেওয়া চলে। পৃষ্ঠপোষকতা করা হবে অথচ পৃষ্ঠপোষিত লেখক পৃষ্ঠ-পোষকের ইচ্ছা অগ্রাহ্য করে তাঁর স্বাধীন সত্তা-বজায় রেখে চলবেন— এরকম হওয়া সম্ভব নয়। মানবীয় মনস্তত্ত্বের নিয়মেই এ জিনিস অসম্ভব। কথাই আছে— 'টু পে দি পাইপার অ্যাণ্ড কল দি টিউন'। বাঁশী বাজিয়েকে দাদন দিলে সে কী গৎ বাজাবে তা ফরমায়েস করারও অধিকার জন্মায় যে দাদন দিয়েছে তার। জমিদারী বদান্যতার আশ্রয় পুষ্ট লেখকদের বেলায়ও এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাবার কখনও কারণ ঘটেনি। অনেক সময় এমনও দেখা গেছে যে, রাজা জমিদার শ্রেণীর লোকেরা তাঁদের অর্থ সামর্থ্যের জোরে কবির কাব্যগ্রন্থ বা ইতিহাসকারের রচিত ইতিহাস গ্রন্থ বেমালুম নিজের নামে চালিয়ে দিয়েছেন— অসহায় গ্রন্থকারদের ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া গত্যন্তর থাকেনি।

পরের লেখা নিজের নামে আত্মসাৎ করা শোষণের চরম। আমাদের জমিদার শ্রেণীর লোকেদের অন্য অনেক রকম শোষণ-তৎপরতার সঙ্গে এই শোষণটিকেও যুক্ত করতে হবে। এই বিদ্যায়ও তাঁরা বড় কম যেতেন না।

কিন্তু সেই অধীনা যুগেও লেখকদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন যাঁরা রাজা জমিদারদের স্বেচ্ছাতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে নিজের উপর বিপদ ডেকে আনতে পরাঙ্মুখ হননি। ভাওয়াল রাজ এস্টেটের কবি গোবিন্দদাসের প্রতিবাদী ভূমিকা সুবিদিত। তিনি ভাওয়ালের রাজা ও রাজনিযুক্ত ম্যানেজারের প্রজা-পীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জয়ধ্বজা উত্তোলন করে প্রজাদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এজন্য তাঁকে মূল্যও কম দিতে হয়নি। যে কাব্যগ্রন্থে তিনি জমিদারী স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ ধ্বনিত করেছিলেন, সেই 'মগের মুলুক' বইখানি ইংরেজ সরকারকে দিয়ে বাজেয়াপ্ত করিয়েই ভাওয়াল স্টেটের তদানীন্তন ম্যানেজার কালীপ্রসন্ন ঘোষ ('প্রভাত চিন্তা' ও 'নিশীথ চিন্তা'র লেখক এবং অধিকন্তু 'বিদ্যাসাগর' উপাধির ধারক!) ক্ষান্ত হননি, কবির ভিটে-মাটি উচ্ছেদ করে তাঁকে ভাওয়াল থেকে তাডিয়ে দিতেও পেছপা হননি। স্বভূমি থেকে নির্বাসিত বিতাড়িত সর্বস্বান্ত কবির চরম দারিদ্র্যদশায় ও অসহায় অবস্থায় পরাশ্রয়ে মৃত্যুবরণ মনে গভীর বেদনার অনুভূতি জাগায়। কিন্তু সেই সঙ্গে এই ভেবেও গর্ববোধ হয় যে, শত দুর্বিপাকের মধ্যেও ভাওয়ালের বিদ্রোহী কবি গোবিন্দদাস অন্যায়ের কাছে মাথা নোয়াননি, প্রায়ানশনে তাঁর মৃত্যু হলেও তিনি মাথা উঁচু রেখেই এই মর সংসার থেকে বিদায় নিয়েছিলেন।

আরেকজন দরিদ্র কবি ও সাংবাদিক ইংরেজ আমলের শাসকশ্রেণীর প্রশ্রয় পুষ্ট পরাক্রান্ত জমিদারতন্ত্রের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করে নিজের উপর বিপদ ডেকে এনেছিলেন। তিনি উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আবির্ভূত কুমারখালির (নদীয়া জেলা) কাঙাল হরিনাথ। বহু বাউল গানের রচয়িতা সাধক শ্রেণীর এই কবি তাঁর জীবনচর্চার সরলতা ও পবিত্রতার জন্য তাঁর অঞ্চলের সাধারণ মানুষদের কাছ থেকে তাদের অকৃত্রিম ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ 'কাঙাল' এই উপাধি লাভ করেছিলেন। কিন্তু ধর্মপথের লোক হলেও তিনি অন্যায়ের সঙ্গে কোনওক্রমে আপস করেননি, যা তথাকথিত ধর্মপথের পথিকেরা প্রায়শঃ করে থাকেন। তিনি নদীয়ার ঠাকুর এস্টেটের অত্যাচার নিপীড়নের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ হস্তে লেখনী চালনা করে ঠাকুর এস্টেটের তদানীন্তন মালিক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের

কোপে পড়েছিলেন তার নজীর আছে। কাঙাল হরিনাথ শুধু কলম ধরতেই জানতেন না, প্রয়োজন হলে লাঠি ধরতেও জানতেন। জমিদারের নিযুক্ত দুর্নীতি-পরায়ণ নায়েব ও তার সাঙাতদের কী করে শায়েস্তা করতে হয় তার তত্ত্ব তিনি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন।

এদেশে পুঁজিবাদের অভ্যাগমের আগে সামন্ততন্ত্রের দাপটের কালেও এমনতর লেখকের অভ্যুদয় হয়েছিল এটা আমাদের পক্ষে পরম শ্লাঘার কথা। এঁদের সঙ্গে যোগ করতে হয় নীলচাষীদের পক্ষাবলম্বী লেখক দীনবন্ধু মিত্র ও 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আসামের চা-করদের শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রবলকণ্ঠে প্রতিবাদ ধ্বনিকারী 'সঞ্জীবনী' সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র ও ওই পত্রিকার লেখক দ্বারিকানাথ গাঙ্গুলী, 'জমিদার-দর্পণ' নাটকের রচয়িতা মীর মশারফ হোসেন, 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' নাটকের প্রণেতা উপেন্দ্রনাথ দাস প্রমুখের গৌরবদীপ্ত নাম। সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে অমৃতলাল, গিরিশচন্দ্র, মন্মথ রায়, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বিজন ভট্টাচার্য প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নাট্যকারদের ভূমিকাও কম গৌরবদীপ্ত নয়।

এ দেশে পুঁজিবাদী পর্বের যেটা সাম্রাজ্যবাদী শাসনের কাল তার অবসান হয়েছে, এখন অর্থনৈতিক পর্বের সূত্রপাত হয়েছে। এ যুগ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাল। ধনী-নির্ধনের মধ্যে বিভেদের যে উঁচু পাঁচিলটি খাড়া থেকে এক শ্রেণী থেকে অন্য শ্রেণীকে আড়াল করে রেখেছে তাকে ঘুচিয়ে দিয়ে সমাজ-সাম্য প্রতিষ্ঠার কাল। এই কালে লেখকদের ভূমিকা অতি পরিষ্কার। তাঁকেই আমি সত্যিকারের লেখক বলব যিনি শত প্রলোভনেও বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের মালিকদের কাছে তাঁর বিবেক বিক্রয় করবেন না এবং সর্বাবস্থায় দরিদ্র-আর্ত-পীড়িত শ্রেণীর পাশে পাশে থাকবেন। তাদের পাশে থেকে তাদের মনে বল যোগাবেন, প্রবলের অত্যাচার রুখতে তাদের প্রেরণা দেবেন। সেই লেখক লেখক নামেরই যোগ্য নন যিনি মালিকের সামান্যতম হাতছানিতে সীমারেখার অপর পারে গিয়ে বাসা বাঁধেন এবং তিলমাত্র বিবেকের দংশন অনুভব না করে কায়েমী স্বার্থবাদীদের সযত্নরচিত টোপ গেলেন।

বুর্জোয়া শাসক শোষকশ্রেণীর নিরাপদ আশ্রয়ের গাছের গুঁড়িতে নৌকা বেঁধে

সাহিত্য দরিয়া পার হতে চাওয়ার দিন অপগত হয়ে গিয়েছে। আজকের সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতে শিবির বিভাগ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। এক দিকে প্রতিক্রিয়াশীল লেখকদের শিবির, অন্য দিকে প্রগতিশীল লেখকদের শিবির সন্নিবেশ। এই দুই শ্রেণীর পরস্পরের মধ্যে আনাগোনার পথ অবরুদ্ধ হওয়া উচিত। লেখক সম্প্রদায়ের সমভ্রাতৃত্বের অজুহাতে শত্রুকে মিত্র বলে কোল দেওয়ার বিপদ সম্পর্কে যেন আমরা সর্বদা সচেতন থাকি। এ বিষয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর জীবৎকালে সাবধান-বাণী উচ্চারণ করে গিয়েছিলেন। আমরা যেন তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে ভুল না করি। তথাকথিত উদার গণতান্ত্রিক ঐক্যের আওয়াজে বিভ্রান্ত না হয়ে আমরা যেন খাড়া ও সোজা পথে চলতে সর্বদা তৎপর থাকি। উদার গণতান্ত্রিক ঐক্য রাজনীতিতে চলে, সাহিত্যে চলে না। সেখানে কোদালকে কোদাল বলার সাহস থাকা চাই, শত্রু কে মিত্র কে তাকে নির্ভুলভাবে চিহ্নিত করা চাই। নয়তো সুবিধাবাদ আর আপসরফার পিচ্ছিল পথের খানা-খন্দে মুখ থুবড়ে পড়ে অপঘাত ডেকে আনা বিচিত্র নয়।

একটা স্পষ্ট কথা সকলকে ভাল করে বুঝতে হবে। যে লেখক 'এস্টাব্লিশমেণ্ট'-এর সেবক, কায়েমী স্বার্থের বশংবদ তল্পীবাহক, তাঁর প্রগতির শিবিরে কোন স্থান নেই। প্রগতির শিবিরের লেখকদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকারগত তারতম্য থাকতে পারে, ক্ষমতার পরিমাণগত বৈষম্য থাকতে পারে; কিন্তু এক ব্যাপারে তাঁদের ভিতর কোনরকম অনৈক্য থাকা চলবে না। সে হলো দুঃস্থ-নিপীড়িত দুর্বল-অসহায় শ্রেণীর মানুষের প্রতি অত্যাজ্য কর্তব্যবোধ অসংশয়ে পালনের ক্ষেত্রে তাঁদের দায়-দায়িত্বের সমানতা। এ কাজে তাঁরা পরস্পর পরস্পরের শরিক। এই দায়িত্ব সংসাধনে তাঁদের কোন রকম ঢিল দেওয়ার অবকাশ নেই।

পুঁজিবাদী সমাজে যথার্থ লেখক-শিল্পী-সাহিত্যিক সর্বদাই দরিদ্রের বন্ধু। এর আর নড়চড় হতে নেই।

লেখক ও সমাজ

১

সমাজের সঙ্গে লেখকের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। শুধু যে লেখকের সৃষ্ট সাহিত্যেই সমাজের প্রতিফলন ঘটে তা-ই নয়, সরাসরি সম্পর্কের ক্ষেত্রেও লেখক সমাজের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। সমাজের প্রতিটি বিশিষ্ট ঘটনা লেখকের মনে আলোড়নের তরঙ্গ তোলে এবং লেখকের সেই আলোড়িত চিন্তা ও কল্পনা স্বতঃই তাঁর লেখার উপরে ছাপ ফেলে। তিনি সমাজ দ্বারা প্রভাবিত হন, বিপরীতে সমাজও তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়। এ কথা বোঝার জন্য কোনো দ্বান্দ্বিক বৈজ্ঞানিক সূত্রের শরণ নেবার প্রয়োজন নেই— যদিও দ্বান্দ্বিক বৈজ্ঞানিক সূত্রের প্রয়োগের দ্বারা এ ভালভাবেই প্রমাণ করা যায়। সাহিত্যের স্ব-ধর্মের মধ্যেও এ কথার পূর্ণ সমর্থন মিলবে। যাঁরা এতকাল বলে এসেছেন সাহিত্য হচ্ছে বিশুদ্ধ আনন্দের লীলা, অন্য-নিরপেক্ষ সৌন্দর্য সৃষ্টিই তার একমাত্র কাজ, সেইসব অস্কার ওয়াইল্ডীয় শুদ্ধ শিল্পবাদীদের যুক্তিতে আজকাল কেউ বড়ো আর একটা কর্ণপাত করেন না। কর্ণপাত করেন না তার কারণ লেখকেরা তাঁদের নিজ জীবনের অভিজ্ঞতায় বুঝেছেন যে, আনন্দই হোক আর সৌন্দর্যই হোক তা শূন্যে ঝুলে থাকতে পারে না, সমাজ মাটির গভীরে ওই দুইয়ের শেকড় দৃঢ়রূপে প্রোথিত না থাকলে তাদের বিকাশ তো পরের কথা, অঙ্কুরোদ্‌গমই সম্ভব হয় না। সমাজ ও মানুষের সঙ্গে একান্তভাবে সম্পৃক্ত না হলে তথাকথিত আনন্দ বা সৌন্দর্যবাদের কোনো অর্থ থাকে না।

সুখের বিষয়, আমাদের আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অর্থাৎ এদেশে ইংরেজ-অভ্যাগমের পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে প্রায় বলতে গেলে গোড়া থেকেই সমাজের সঙ্গে সাহিত্যের যোগ কোন-না-কোন ভাবে স্বীকৃত হয়ে এসেছে। এ কথার প্রমাণ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বস্তুভিত্তিক কবিতা, রঙ্গলাল-মধুসূদন-হেম-নবীনের জাতীয়তার উদ্বোধক কাব্য, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ও প্রবন্ধাবলী, এবং দীনবন্ধু মিত্রের সমাজ-সচেতন নাটক। গুপ্তকবিকে বাদ দিলে অন্যরা ইংরেজী সাহিত্যের ভাবধারায় মোটামুটি নিস্নাত ছিলেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও, লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, উনিশ-শতকে প্রচলিত ইউরোপীয় শুদ্ধ শিল্পবাদী বা কলাকৈবল্যবাদী ধারণা

তাঁদের মনের উপর বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারেনি। সত্যি কথা বলতে কি, ইউরোপীয় সাহিত্যের শুদ্ধশিল্পবাদকে একপ্রকার পাশ কাটিয়েই আমাদের সাহিত্য প্রথমাবধি সমাজচিন্তার অনুশীলনে নিরত থেকেছে। বঙ্কিমচন্দ্র তো কেবলমাত্র তাঁর লেখায় সমাজের প্রতিফলন ঘটিয়েই ক্ষান্ত হননি, সমাজ-চেতনাকে তিনি একটি সজ্ঞান ভাবাদর্শরূপে বাঙালী লেখক মানসে মুদ্রিত করে দিতে চেয়েছিলেন। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজ চেতনা আর আজকের দিনের সমাজচেতনায় বলাই বাহুল্য কিছু পার্থক্য আছে এবং সে পার্থক্য মৌলিক। কিন্তু এ কথা তো অস্বীকার করা যায় না যে, তিনিই বাংলা সাহিত্যে সমাজ-চৈতন্যের আদর্শের প্রথম এবং এখনও পর্যন্ত প্রধান প্রচারক। বঙ্কিমচন্দ্রের সকল মতামত আজকের দিনে গ্রাহ্য হওয়া সম্ভব নয় কিন্তু তিনি যে বাংলায় উত্তর-পুরুষদের কাছে সমাজচেতনার আদর্শ উত্তরাধিকার স্বরূপ ধরে দিয়ে গেছেন তার জন্য সকলেরই আমাদের তাঁর কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

কিন্তু সমাজচেতনার এই স্রোত বাংলা সাহিত্যে অবিচ্ছেদে বইতে পারেনি। উনিশ শতকীয় সাহিত্যের অগ্রগতির মুখে এমন একটা বাঁক এলো যখন স্রোতের মুখ গেল ঘুরে। বিহারীলাল, অক্ষয় বড়াল, রবীন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ সেন-প্রমুখ কবিগণ সাহিত্যে রোমান্টিক আত্মলীনতার সংস্কারের জন্মদান করে শুধু যে বাংলা সাহিত্যের এতাবৎ অনুস্যূত সমাজ মানসিকতাকেই আঘাত করলেন তা-ই নয়, প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যের বস্তুভিত্তিটাকেই দিলেন উড়িয়ে। এর ফল উত্তর-কালীন বাংলা সাহিত্যের পক্ষে সবটাই শুভ হয়েছে এমন কথা বলা চলে না। এই সব খ্যাতকীর্তি কবিদের রেখাচিহ্ন অনুসরণ করে আমরা আমাদের সৌন্দর্য চেতনাকে যতটা উদগ্র করতে পেরেছি ঠিক ততটাই বোধ হয় হারিয়েছি সমাজ চেতনার খাতে। লাভ ক্ষতির হিসাব কষতে গেলে পাল্লা কোন্ দিকে বেশী ঝুঁকবে সে একটা চমৎকার বিচারযোগ্য বিষয় কিন্তু এই আলোচনা তার প্রকৃত ক্ষেত্র নয় বলে এইখানেই সেই প্রসঙ্গের ইতি ঘটানো উচিত। শুধু প্রসঙ্গটির উপর যবনিকা টানবার আগে এইটুকু বলে নেওয়া দরকার যে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যসাধনার শেষপ্রান্তে এসে তাঁর কাব্যে আপেক্ষিক বস্তু-ভিত্তিকতার অভাবের অভিযোগ প্রকারান্তরে মেনে নিয়েছিলেন এবং বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের ধ্যান পরিহার করে সমাজতন্ত্রের আবাহনে ব্রতী হয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য তার পর আর বেশীদিন তিনি জীবিত ছিলেন না।

২

আমাদের বর্তমান নিবন্ধ সাহিত্য-বিষয়ক যত-না তার চেয়ে অনেক বেশী সমাজ-বিষয়ক। সাহিত্য অপেক্ষা সমাজতত্ত্বের দৃষ্টিকোণটিই এই আলোচনায় সমধিক প্রাধান্য পাবে। লেখকেরা সমাজের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে এসে কীরূপ প্রভাবিত হন এবং সেই প্রভাব তাঁদের লেখায় প্রতিক্রিয়া বা প্রগতির পক্ষে কী ভাবে নিয়োজিত হয় সেটি দেখানই এই আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। এবং এই আলোচনার ধারা থেকেই নিঃসন্দেহে প্রমাণ করা যাবে— যদি সেই প্রমাণের এখনও প্রয়োজন থেকে থাকে— যে, সাহিত্যে আষ্টেপৃষ্ঠে সমাজস্পর্শ দ্বারা অনুলিপ্ত। যে সকল লেখক সমাজের গা বাঁচিয়ে, তাকে এড়িয়ে, সাহিত্যসৃষ্টির চেষ্টা করেন এবং ওই চেষ্টায় নিয়োজিত থাকা কালে এই আত্মপ্রসাদে মগ্ন থাকেন যে, তাঁরা যা রচনা করছেন তা বিশুদ্ধ আনন্দের লীলাজাত সৌন্দর্যকমল, তাঁদের সেই সৃষ্টির জন্য সমাজের মুখাপেক্ষী হওয়ার আদৌ প্রয়োজন করে না, তাঁরা আত্মপ্রবঞ্চনা করেন মাত্র। হয় তাঁরা সাহিত্যের স্বরূপের পরিচয় রাখেন না, নয় তাঁরা যে সমাজে বাস করছেন সে সমাজের প্রকৃত চেহারা কী তা জানেন না। জীবিকার সূত্রে, পৈতৃক ধনসম্পত্তি ভোগের সূত্রে, আত্মীয়তা-বন্ধনের সূত্রে, দলের প্রতি আনুগত্যের সূত্রে, আরও অন্যান্য নানা সূত্রে, লেখক তাঁর জন্মকাল থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত আক্ষরিক অর্থে সমাজের হাতে-ধরা হয়ে বাস করেন। এই মৌলিক সত্যটিকে অস্বীকার করার অর্থ সমাজকে না বোঝা, নিজেকেও না বোঝা। আত্মপরিচয়ের অভাব থেকেই বেশীর ভাগ কল্পিত বা অবাস্তব মতবাদের উদ্ভব হয়, এটি পরীক্ষিত অভিজ্ঞতা।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যে কালকে 'ভারতী'র যুগ বলা হয় সেই কালের লেখকদের মধ্যে নন্দনবাদী মনোভাবের প্রাবল্য ছিল। তাঁরা তাঁদের গল্পোপন্যাসে যে-সকল চরিত্রের সৃষ্টি করতেন তাদের জীবিকার ভাবনা ছিল না, জীবন একটা একটানা উপভোগের বস্তু এই মনোভাব থেকে নায়ক-নায়িকারা উপার্জনচিন্তাহীন নিরবচ্ছিন্ন প্রেমচর্চায় সময় কাটিয়ে আজ মধুপুর কাল দেওঘর পরশু হাজারীবাগ প্রভৃতি সাঁওতাল-পরগণা ও ছোটনাগপুরের অধুনা-পরিত্যক্ত স্বাস্থ্যনিবাসগুলিতে ঘুরে বেড়াত। এই যে কর্মচিন্তাবর্জিত ভোগের ধারণা, এ তৎকালীন লেখকেরই মনের ছবি মাত্র। খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে, শুধু নায়কেরই যে উপার্জনচিন্তা ছিল না তা নয়, তার স্রষ্টা লেখকটিরও উপার্জন-

চিন্তার বালাই ছিল না। পিতৃপিতামহের সূত্রে আগত কোম্পানীর কাগজ বা অকুস্থলে-অনুপস্থিত জমিদারী সূত্রে আহৃত রসদ সংশ্লিষ্ট লেখকের খোরপোষের ভাবনা মেটাত। আজকের দিনেও যে সব লেখক মনে করেন যে তাঁরা স্রেফ সৃষ্টির আনন্দে বুঁদ হয়েই সাহিত্য রচনা করেন, টাকার জন্য লেখাটা সাহিত্যিকের পক্ষে গ্লানিজনক, তাঁরা বরং লিখবেন না তবু অর্থকরী সাহিত্যের পোষকতা করে সাহিত্যের অবমাননা ঘটাতে রাজী নন, তাঁরাও ওই 'ভারতী'র লেখকেরই স্বগোত্র জীব। তাঁদেরও হয় পরিস্ফীত ব্যাঙ্কব্যালান্স আছে, নয় তো জীবনের দাবী কৃত্রিম উপায়ে তাঁরা এতটা খাট করে এনেছেন যে তাকে প্রায় 'বায়ুভুক' অস্তিত্ব বলা চলে। এই দুই অবস্থার কোনোটিই আদর্শ জীবনযাপনের প্রণালী নয়। সমাজে বাঁচতে হলে সমাজের নানাবিধ স্বাভাবিক ও সুস্থ দাবি স্বীকার করেই বাঁচতে হবে এবং তা করতে গেলেই সমাজের মানুষ ও ঘটনার সঙ্গে নিবিড় ভাবে সম্পৃক্ত না হয়ে সেটা করা যাবে না।

সমাজ একটি নানা শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট জটিল প্রতিষ্ঠান। এড়াতে চাইলেই তাকে এড়ানো যায় না। আমরা যখন ভাবছি সমাজের থেকে বিমুক্ত হয়ে শুধু মাত্র নিজের কল্পনা ও মননের জোরে সাহিত্য সৃষ্টি করছি, হয়তো দেখা যাবে তখনও আমরা কোনো-না-কোনো ভাবে সমাজের সঙ্গে সংযুক্ত থেকেই এই কাজ করছি। আমাদের অজ্ঞাতসারে অথবা অস্পষ্ট চেতনায় এটা ঘটছে বলে সেই সম্পর্কের সত্যতা অস্বীকৃত হয়ে যায় না। আমি লেখকের সঙ্গে সমাজের নানা সূত্রে সংযোগের কথা বলেছি। জীবিকার সূত্র, দল বা গোষ্ঠীর প্রতি আনুগত্যের সূত্র, সম আদর্শের অনুসরণের সূত্র,, ইত্যাদি। এই সংযোগ-সূত্রগুলি জ্ঞাতসারে হোক অজ্ঞাতসারে হোক লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী প্রভাবিত করে থাকে। যিনি যে প্রভাব বলয়ের মধ্যে বাস করেন তাঁর পক্ষে সেই প্রভাব বলয় পুরোপুরি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয় না— তা তিনি যতো বড়ো মাপেরই লেখক হোন না কেন। বরং বড়ো মাপের লেখক হলে আরও ভয় বেশী, কারণ সে ক্ষেত্রে বক্তৃতার সঙ্গে এসে মেশে শক্তি এবং সেই শক্তি প্রয়োগে স্বীয় বিচরণ ক্ষেত্রের অন্তর্গত অতি প্রতিক্রিয়াশীল আদর্শকেও মনোহর বর্ণে চিত্রিত করে পরিবেশন করতে তাঁর আটকায় না। প্রতিভাবানের পক্ষে যে কোনো সমাজ ব্যবস্থা বা শ্রেণী ব্যবস্থার অনুকূলে যুক্তি যোগানো চলে যদি সেই বিশেষ ব্যবস্থার সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ স্বার্থের যোগ থাকে। বেশীরভাগ যুক্তি-

ক্রিয়ার ক্ষেত্রে এই জাতীয় মনস্তত্ত্বই সচরাচর কাজ করে থাকে। 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের স্রষ্টা হয়েও বঙ্কিমচন্দ্র এদেশে ইংরেজ শাসনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সময় হিন্দু মধ্যবিত্তের বিস্তারের কাল। ইংরেজ শাসন থেকে ওই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় নানা ভাবে উপকৃত হচ্ছিল। মুসলমানদের প্রতি তৎকালীন ইংরেজ শাসকের প্রতিকূলতা এবং মুসলমানদেরও সাম্রাজ্য হারাবার ক্ষোভে ইংরেজদের প্রতি বৈরিতা বশতঃ ইংরেজের অনুগ্রহ তখন কেবল মাত্র হিন্দু শিক্ষিত মধ্যবিত্তকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছিল। এই রাষ্ট্রনৈতিক স্থিতিতে বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের একজন স্বীকৃত প্রতিনিধিরূপে বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজ শাসনকে স্বাগত জানাবেন তাতে আর বিচিত্র কী। যদিও আজকের দিনে তাঁর এই শ্রেণীস্বার্থ প্রসূত ইংরেজ শাসনের মহিমা প্রচার আমরা প্রসন্নমনে গ্রহণ করতে পারি না, আমাদের মনে কেবলই খটকা দেখা দেয় তিনি এ কাজটি না করলেও পারতেন। বঙ্কিমের ইংরেজ মাহাত্ম্য প্রচারের পক্ষে আরও একটি কারণ যোগ করা যেত— তাঁর নিজের উচ্চ-পদাধিকারী রাজকর্মচারিত্ব— কিন্তু ওটা নাকি কারও কার্যে স্থূল motive আরোপের সামিল, তাই ওই কার্য-কারণ নিরূপণের প্রক্রিয়া থেকে বিরত রইলুম। কিন্তু তার পরেও যে কথাটা থেকে যাচ্ছে তা হল এই যে, লেখক মাত্রই নিজ নিজ সমাজ ব্যবস্থার দ্বারা গুরুতররূপে প্রভাবিত হয়ে থাকেন। যে দেশে ও কালে তিনি তাঁর লেখনী চালনা করেন সেই দেশ ও সেই বিশেষ কালের রাষ্ট্রিক সামাজিক স্থিতি একটি বিশেষ পরিমণ্ডলের মত তাঁকে ঘিরে থাকে, যার দৃশ্য এবং অদৃশ্য প্রভাবের জাল ছিন্ন করে তাঁর বেরিয়ে আসার উপায় নেই। বঙ্কিম যে সময়ে ইংরেজ মাহাত্ম্যের নান্দী গেয়েছেন ঠিক তার কিছুকাল পরেই দেখি ভারতীয় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীর দল জাতীয়তাবাদী অভীপ্সায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কংগ্রেসের পতাকাতলে এসে দাঁড়িয়েছেন এবং হিন্দু মুসলমান উভয়কেই ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানাচ্ছেন। তার কারণ আর কিছু নয়, ততদিনে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি ইংরাজের বিমাতৃসুলভ নীতির অবসান হয়ে গেছে এবং তার বদলে দেখা দিয়েছে বিভেদাত্মক নীতি অনুসরণের আবরণে হিন্দু-স্বার্থের সুস্পষ্ট প্রতিকূলতা-চরণ। এই পরিবর্তন ভারতীয় হিন্দুর মানসিকতায় অনিবার্যভাবেই দূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল।

যাই হোক, এ সকল পুরাতন কথার গহনে অধিক দূর প্রবেশের দরকার

নাই। শুধু এখানে এই কথা বলাই যথেষ্ট যে, সামাজিক বা রাষ্ট্রিক স্থিতিকে বাদ দিয়ে লেখকের চলবার যো নেই। আমরা রবীন্দ্রকাব্যের আপেক্ষিক নির্বস্তুকতা তথা বিমূর্ততার কথা বলেছি। আমাদের কথা নয়, বাংলাদেশের একাধিক প্রথিতযশা সমালোচক রবীন্দ্রকাব্যের এই দিকটির প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করে গেছেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও তো মনে রাখতে হবে যে, আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরবের ধন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং স্বাধীনচিত্ততার এক অসাধারণ দৃষ্টান্তস্থল হয়েও পরাধীন ভারতের মৃত্তিকায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে গেছেন এবং পরাধীনতার মর্মান্তিক বেদনা এক স্থায়ী ধুয়ার মত তাঁর সকল রচনার আপাত-আনন্দোজ্জ্বল সৃষ্টিরহস্যকে ঘিরে থেকে এক নিবিড় বিষাদের সুর চারদিকে রচিত করে তুলেছিল। তা যদি না হত তো কাব্যে আত্মমগ্ন মনোভাবের সর্বোচ্চ প্রতীক হয়েও শত শত প্রবন্ধে, গানে, কবিতায়, বিশেষ করে জাতীয় ভাবোদ্দীপক অগণিত স্বদেশী সংগীতে তিনি ভারতবাসীর পরাধীন অবস্থার বেদনাকে দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতেন না। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বেও তিনি ইংরেজ শাসনকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় অভিসম্পাত জানিয়ে গেছেন। ইংরেজ শাসনের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপের উপর এক নূতন প্রভাতের অভ্যুদয় তিনি চাক্ষুষ করে যেতে পারেননি কিন্তু এই প্রত্যাশার চাঞ্চল্যে তাঁর শেষের দিকের সকল রচনা থমথমে হয়ে ছিল।

এর থেকে একটি কথারই শুধু প্রমাণ হয়, তা এই যে, সাহিত্যিক যিনি যে ভাবেরই উদ্গাতা হোন্ না কেন, তিনি ভাববাদেরই প্রচারক হোন আর বাস্তববাদেরই প্রচারক হোন, সমাজের বস্তুগত অবস্থা তাঁর এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। তিনি কেমন করে তা এড়িয়ে যাবেন, যখন দেখতে পাওয়া যায় যে তাঁর চিন্তা-ভাবনা-কল্পনার পঞ্জরে পঞ্জরে সেই সমাজের ঘটনাপ্রবাহের কলকোলাহলের নিত্য অনুরণন? সমাজের কাছ থেকে তিনি শুধু যে তাঁর সৃষ্টির প্রেরণা সংগ্রহ করেন তা-ই নয়, তাঁর খোদ অস্তিত্বই সমাজের বস্তুগত অবস্থার সঙ্গে জড়িত এবং কোনো-না-কোনো ভাবে ওই অবস্থা থেকেই তিনি তাঁর বাঁচার উপকরণ সংগ্রহ করে থাকেন। প্রেরণার অঙ্কুশ-তাড়না কেবল বৃহত্তর সমাজের কাছ থেকেই আসে না, আসে সেই সমাজের খণ্ড খণ্ড অংশের সহিত নৈকট্যের প্রভাববশেও। আবার, প্রেরণা যেমন আসে তেমনি প্রেরণার প্রতিবন্ধকতাও আসে। কখনও প্রেরণার বিস্ফার আবার কখনও প্রেরণার অভাবজনিত স্ফূর্তিহীনতা ও অবসাদ এই দুই বিপরীত মনোভাবের টানাপোড়েনে আলোড়িত-মথিত হতে

হতে লেখক ঢেউয়ের দোলায় দোলায়মান নৌকার মত ভাসতে ভাসতে তাঁর চলার পথে এগিয়ে চলেন। লেখক যে জীবিকায় নিরত থাকেন, যে জাতীয় বন্ধুসংস্পর্শে তিনি আসেন, যে সমাজ পরিবেশে তাঁকে বিচরণ করতে হয়, যে ধরনের আদর্শের টান তিনি তাঁর অন্তরে অনুভব করেন, অবধারিতভাবে সে সকলেরই ছাপ তাঁর লেখায় পড়ে। এক দিকে তাঁর স্বকীয় রুচি ও প্রবণতা, অন্য দিকে যে সামাজিক গণ্ডীর ভিতর তিনি চলাফেরা করেন তার প্রভাব এই দুয়েরই ভাব-সংঘাতে গড়ে ওঠে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী। কোনো লেখক মার্ক্সবাদের বিরোধিতা করেন বা পোষকতা করেন, গান্ধীবাদের প্রতি আনুগত্য নিবেদন করেন কি তার প্রতিকূলতা করেন, ভিয়েতনামের প্রশ্নে মার্কিনীদের মতের প্রতিধ্বনি করেন কি মানবতার দাবীতে ভিয়েতনামী সংগ্রামী জনগণের পাশে এসে দাঁড়ান, তথাকথিত ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের 'পবিত্র' অধিকার রক্ষার ঘোষণায় উচ্চকণ্ঠ হন কি জনসাধারণের রুটির লড়াইয়ের সামিল হন—এই একগুচ্ছ বিকল্পদ্বয়ের কোনো একটি অবলম্বনের মূলে সবসময় যে ব্যক্তিগত প্রত্যয়ের সুদৃঢ় প্রণোদনা থাকে তা নয়, যাঁদের সঙ্গে লেখক চলেন-ফেরেন, জীবিকার যোগে যুক্ত থাকেন, অন্যান্য ভাবেও বাধ্যবাধকতার টান অনুভব করেন, তাঁদের দ্বারাও দৃষ্টিভঙ্গী অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হতে দেখা যায়। এই ক্ষেত্রে স্বকীয় প্রত্যয়ের ভূমিকা কতটা আর সামাজিক পরিবেশের ভূমিকা কতটা অথবা কোন্ ভূমিকা এখানে অগ্রবর্তী কোন্ ভূমিকা পশ্চাৎবর্তী সে নিরূপণ করা এক দুরূহ কাজ, কেন না সমস্ত ব্যাপারটাই ঘটে তালগোল পাকানো এক মিশ্র সংঘটনের আকারে এবং সে জটিলতার জট ছাড়ানো মোটেই সহজসাধ্য নয়। বোধ হয় একমাত্র বিচক্ষণ মনস্তাত্ত্বিকের দ্বারাই এই কঠিন রহস্যভেদ সম্ভব।

৩

ইউরোপীয় সাহিত্যের নজীর থেকেও লেখকদের উপর তৎকালীন সামাজিক স্থিতির প্রভাবের প্রমাণ পাই। ফরাসী বিদ্রোহের আগে ফরাসী দেশে অভিজাত ও যাজকদের অত্যাচার চরমে উঠেছিল, "third estate" অর্থাৎ জনসাধারণের অধিকার বলতে বিশেষ কিছুই ছিল না। রাজতন্ত্র জনগণের দাবীর প্রতিকূলাচরণে অভিজাততন্ত্র ও যাজকতন্ত্রের প্রতি সুস্পষ্ট পক্ষপাতিত্ব করে চলেছিল। এই অবস্থার প্রতিক্রিয়াতেই রুশো ও ভলটেয়ার এবং ভলটেয়ারের সহযোগী

দিদেরো, হলবাক, ত্ত আমবার্ট্ প্রমুখ যুক্তিবাদী, জগতের mechanistic বা যান্ত্রিক ধারণায় প্রত্যয়শীল 'এনসাইক্লোপিডিস্ট' লেখকদের জন্ম। এঁদের "যান্ত্রিক" মতবাদ আজকে আর বেঁচে নেই কিন্তু এঁদের আপসহীন সম্মিলিত লেখনী চালনার ফলেই যে ফরাসী বিদ্রোহ সম্ভব হয়েছিল তা ইতিহাসবিদিত। ইংলণ্ডের ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ প্রমুখ কবিগণ গোড়ায় ফরাসী বিদ্রোহের 'সাম্য' মৈত্রী, স্বাধীনতা'-র আদর্শের উৎসাহী সমর্থক ছিলেন কিন্তু জ্যাকোবিনদের অনুষ্ঠিত 'Reign of terror'-এর হিংসার মাত্রাতিশয্যে ভীত-সন্ত্রস্ত-প্রতিহত হয়ে শেষ পর্যন্ত নির্বিরোধ রোমান্টিকতার শান্তির কোলে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। 'লেক ডিস্ট্রিক্টের' সুস্থির সমাহিত আবহাওয়ায় নিরবচ্ছিন্ন প্রকৃতি-চর্চা বিরূপ অভিজ্ঞতার আঘাতে ছিন্নভিন্ন স্নায়ুতন্ত্রীকে বিশ্রামের বিশল্যকরণীর দ্বারা আরোগ্য করে তোলার মানসেই শুধু নয়, বাস্তব থেকে পালিয়ে বাঁচবার প্রাণান্তকর তাগিদেও বটে। এ মজ্জাগত রোমান্টিকেরই উপযুক্ত আচরণ!

আরও অনেক পরে ওই ফরাসী দেশেই জোলা, আনাতোল ফ্রান্স, রেঁালা প্রমুখ লেখকের অভ্যুদয় ঘটেছিল। এঁরাও সমাজমননের দ্বারা সবিশেষ প্রভাবান্বিত লেখক। প্রকৃতিবাদী লেখক জোলা ও মূলতঃ সৌন্দর্যবাদী লেখক ফ্রান্স-এর "Dreyfus Affair"-এর চরম অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাহসিকতার সঙ্গে রুখে দাঁড়ানো এখনও বিশ্ব-শিল্প-সংস্কৃতির জগতের মূল্যবান স্মৃতির সম্পদ্ হয়ে রয়েছে। আনাতোল ফ্রান্স অবশ্য পরে, প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধ সংঘটিত হবার কালে, উগ্র জাতীয়তাবাদের আবর্তের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন কিন্তু সেই সময়ে রেঁালার বীরত্ব অবিস্মরণীয়। তিনি ফরাসী-জর্মান নৃশংস ভ্রাতৃযুদ্ধের শরিক হতে দৃঢ়রূপে অস্বীকার করে লেখকের ব্যক্তি-বিবেকের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন। পরেও তিনি একাধিক উপলক্ষ্যে মানবতার বিজয় পতাকা উচ্চে তুলে ধরেছিলেন। আর-একজন প্রণম্য লেখক হলেন টলস্টয়। তাঁর ভগবৎপ্রেম ও অহিংসা-তত্ত্ব বিদিত, কিন্তু তাতেই তাঁর পরিচয় নিঃশেষিত নয়। ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা বিপন্ন ও রাজরোষ অগ্রাহ্য করে তিনি শুদ্ধমাত্র ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য স্বৈরতন্ত্রী জারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে 'দুখোবর'দের আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ও তাদের দেশত্যাগে সাহায্য করেছিলেন। যুগ যুগ ধরে নিপীড়িত সর্বহারা রুশ কৃষক সমাজের প্রতি তাঁর মমত্বের তুলনা ছিল না। রাজনীতিতেও মত ছিল খুবই বৈপ্লবিক। যদিও দুইয়ের পথের ভিন্নতা সুস্পষ্ট তবু টলস্টয়ের

নৈরাজ্য-তত্ত্বের সঙ্গে মার্ক্সীয় "রাষ্ট্রশূন্যতা" বা "Statelessness" তত্ত্বের আশ্চর্য মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

আমাদের কালে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আমরা একাধিক লেখককে বীরত্বপূর্ণ ভাবে সংগ্রাম করতে দেখেছি। তাঁদের কারও কারও জীবন ফ্যাসিস্ট ঘাতকদের হস্তে বিনষ্ট হয়েছে, অনেকেরই জীবন কারাপ্রাচীরের অন্তরালে অবসিত হয়ে গেছে। এঁদের সকলেরই নাম আজ আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী কালে, তিরিশের দশকে যে সকল লেখক স্পেনের গৃহযুদ্ধে গণতন্ত্রীদের পক্ষে লড়াই করে যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মদান করেছিলেন তাঁদের মহিমময় স্মৃতি পরবর্তী লেখকদের মনের মণিকোঠায় অক্ষয় হয়ে আছে। ফ্যাসিবিরোধী ও কম্যুনিস্ট সমর্থক লেখকদের মধ্যে পরে অবশ্য কেউ কেউ ফ্রণ্ট বদল করেছেন —দৃষ্টান্তস্বরূপ স্টীফেন স্পেণ্ডার, কোয়েস্টলার, হাওয়ার্ড ফাস্ট প্রমুখ লেখকদের নাম করা যায়—, কিন্তু তাতে এঁদের ক্ষীণপ্রাণতাই বোঝায়, যে আদর্শের বর্তিকা তাঁরা একদা জ্বালিয়েছিলেন তার দ্যুতির মলিনতা বোঝায় না। মাঝপথে রণে ভঙ্গ দেওয়ার নজির এই প্রথম ঘটল না যে এই দৃষ্টান্তে মুষড়ে পড়তে হবে।

দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধে নাৎসী বাহিনী কর্তৃক ফরাসী ভূমি পর্যুদস্ত হওয়ার কালে প্রগতিশীল ফরাসী লেখকদের প্রাণতুচ্ছকারী প্রতিরোধ সংগ্রাম এবং পরে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে আলজিরীয় বুদ্ধিজীবীদের আপসহীন লড়াই লেখকের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক দায়িত্ব পালনের ঐতিহ্যকে উজ্জ্বল করে রেখেছে। ফরাসী প্রতিরোধ সংগ্রামের অন্যতম নায়ক জাঁ-পল-সার্ত্রের সংগ্রামী ভূমিকা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। অসমসাহসিক লেখক নবতিপর বৃদ্ধ ব্রিটিশ দার্শনিক বার্টর‍্যাণ্ড রাসেলের সঙ্গে মিলিত হয়ে ভিয়েতনামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের চূড়ান্ত নিষ্ঠুরতা ক্রূরতাহীন রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে তিনি একাই একশোর সাহস নিয়ে সুদৃঢ় প্রতিরোধ চালিয়ে গিয়েছিলেন। ব্যক্তিগত প্রত্যয়ে বার্টর‍্যাণ্ড রাসেল কম্যুনিস্টতন্ত্রের বিরোধী শিবিরভুক্ত ছিলেন ; কিন্তু কী তাঁর সাহস, ক তাঁর সংকল্পের অজেয়তা ! মার্কিন বর্বরতার বিরুদ্ধে কী তাঁর ঘৃণা ! মানবতাবাদের ধূমলেশহীন শিখাটিকে অনির্বাণ জ্বালিয়ে রাখতে আজকের দিনের কোনো লেখক সবচেয়ে বেশী সাহায্য করে থাকেন তো তিনি প্রয়াত বার্টর‍্যাণ্ড রাসেল। সংগ্রামী যুবকতুল্য দৃঢ়চেতা বৃদ্ধ মনীষীর উদাহরণ আমাদের উদ্দীপিত করুক।

৪

এই সব সমাজ ও রাষ্ট্র সচেতন সাহসী ইউরোপীয় লেখকদের দৃষ্টান্ত এত সবিস্তারে বলবার আবশ্যক হত না, যদি আমাদের দেশে আমরা এঁদের মহান্ আদর্শবাদ থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করতুম। পরিতাপের বিষয়, আজও আমাদের লেখকদের একাংশ তথাকথিত শুদ্ধশিল্পবাদের ধারণায় বুঁদ হয়ে থেকে সমাজের জনগণের প্রতি তাঁদের দায়িত্ব অবহেলা করে চলেছেন। যে-সব লেখক ব্যক্তিস্বার্থে প্ররোচিত হয়ে অথবা অজ্ঞতা বশতঃ প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলির অনুকূলে স্বীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করে চলেছেন তাঁদের চোখ ফোটাবার জন্যে হলেও বার বার এই সব দৃষ্টান্ত তাঁদের সামনে তুলে ধরা আবশ্যক। তাঁরা তা হলে বুঝতে পারবেন সাহিত্যসেবা একটি পবিত্র অধিকার— এই অধিকার প্রয়োগে সর্বদাই অতন্দ্র প্রহরার দরকার ; কৃত কার্যের তাৎপর্য না বুঝে, সমাজ-মনের উপর তার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার হিসাব না কষে, আর যা-ই করা যাক, সাহিত্য সেবা অন্ততঃ করা চলে না। সাহিত্যব্রত পালনে হেলাফেলার মনো-ভাবের কোনো স্থান নেই।

প্রতিক্রিয়ার শিবিরভুক্ত যে সকল লেখকের কথা বললুম এঁদের একটা অংশ জীবিকার সূত্রে তথাকথিত জাতীয়তাবাদী বৃহৎ সংবাদপত্র গোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িত, একটা অংশ মুনাফাপরায়ণ স্থূলমনা ব্যবসায়ী প্রকাশকের আজ্ঞাবহ, একটা অংশ আত্মীয়তার সুবাদে বিগতকালীন ক্ষয়িষ্ণু অভিজাততন্ত্রের সঙ্গে মমত্বের যোগে যুক্ত। বৃহৎ সংবাদপত্রগুলির সঙ্গে যে সকল লেখকের যোগ, অন্নোপার্জনের তাগিদে তাঁরা এতটাই বিবেকধর্মশূন্য হয়ে পড়েছেন যে ভিয়েতনামের প্রশ্নে মার্কিনী দস্যুতাকে সমর্থন করতে তাঁদের বাধেনি, ভিয়েতকঙ্ গেরিলাদের গভীর বিস্ময় ও শ্রদ্ধা উদ্রেককারী ঐতিহাসিক প্রতিরোধ-সংগ্রামের খবর চেপে ও মার্কিন পক্ষের একতরফা বক্তব্য ও বিবৃতি ছেপে তাঁরা মালিক-মনোরঞ্জনে ব্যস্ত-ছিলেন। কিছু কিছু লেখক আছেন যাঁরা এ বাবদে মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগ থেকে আর্থিক সাহায্য পেতেন। বাংলার লেখক-শ্রেণীর একাংশের সঙ্গে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের ঘৃণিত অঙ্গ সি. আই. এ-র আর্থিক যোগাযোগ আজ আর কথার কথা হয়ে নেই, সি. আই. এ.-র কর্তারাই সেই সংযোগের কথা প্রকাশ করে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়েছেন। এই কেলেঙ্কারী আজ এতটাই ছড়িয়ে পড়েছে যে সংশ্লিষ্ট লেখকেরা আত্মরক্ষায় সচেতন হয়ে উঠেছেন এবং

নানা ছেঁদো যুক্তির আড়াল রচনা করে স্বীয় দোষ স্খালনের চেষ্টা করছেন। এতে ভবী ভোলবার নয়। কেন না এতকাল এঁরা যে "গণতন্ত্র" ও "ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের" পবিত্রতার জয়গানে মুখর ছিলেন, এখন দেখা যাচ্ছে সেই জয়ঘোষণা নিঃস্বার্থ নয় বা প্রত্যয়জনিত নয়; পর্দার আড়ালে তার সুতো ধরা ছিল মার্কিন প্রচার বিশারদের সুদক্ষ অঙ্গুলিতে। একটানা মার্ক্সবাদের বিরুদ্ধ প্রচার ও তথাকথিত গণতন্ত্রের উদ্‌ঘোষণের রহস্য এখন দিবালোকের মত স্পষ্ট। কিন্তু এতকাল এই পুতুলনাচের খেলা খুব ভালোই জমানো হয়েছিল। মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগের টাকা খেয়ে ব্যক্তি-স্বাধীনতার মহিমা কীর্তন— এ মনুষ্য-লোকের ত বটেই, দেবতাদেরও অবলোকন করবার মত একটা দৃশ্য!

একদল লেখক মুনাফাগৃধ্নু প্রকাশকের বশম্বদ হয়ে তাঁদের মার্জিমফিক লিখে কী ভাবে দিনের পর দিন বাংলা সাহিত্য ও শিল্প-সংস্কৃতির মানের অপকর্ষ ঘটিয়ে চলেছেন সে তথ্যও আজ আর কারুর অবিদিত নেই। আজকাল এক ধরনের "ঐতিহাসিক" উপন্যাসের চল হয়েছে। তারই বাজারদর আজ প্রকাশক মহলে সবচেয়ে বেশী। এক শ্রেণীর লেখক কে কার আগে এইজাতীয় উপন্যাস লিখে প্রকাশকের মুনাফা মৃগয়ায় সহায়তা করবেন তার এক অলিখিত প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত। কিন্তু এই জাতীয় উপন্যাসের কিছু কিঞ্চিৎ খোঁজ খবর যাঁরা রাখেন তাঁরা জানেন এই সকল উপন্যাস আসলে কী বস্তু। ইতিহাসের নামমাত্র ছিটেফোঁটার ফোড়ন দিয়ে অনেকাংশেই আদিরসাত্মক কল্পিত ঘটনার মিশাল যোগে যে দুষ্পাচ্য বস্তুটি প্রায়শঃ তৈরী হয় তা ইতিহাসও নয় উপন্যাসও নয়, তা আসলে নবাব-বাদশাহদের হারেমবিহারিণী অসূর্যম্পশ্যা বেগম ও বাঁদীদের নিয়ে বানানো কেচ্ছাকাহিনী। আমাদের দেশের পাঠকের সমাজবোধ এখনও যথেষ্ট পরিমাণে উদ্রিক্ত হয়নি, তাই হাতের কাছে যা পান তা-ই গেলেন। পাঠকদের এই আপেক্ষিক অচেতনতা ও প্রস্তুতিহীনতার সুযোগের অপব্যবহার এখনই কঠোর হস্তে দমন করা দরকার। দীর্ঘদিনের সাধনায় বাংলা সাহিত্যে প্রগতিশীলতার একটা সংস্কার গড়ে উঠেছে। কিছু সমাজবিরোধী লেখকের উদ্দেশ্যমূলক ক্রিয়াকলাপের ছোঁয়ায় আমরা সে সুস্থ-সংস্কার কলুষিত হতে দিতে পারি না।

আর একশ্রেণীর লেখক আছেন যাঁরা মুখে প্রগতিশীলতার বুলি আওড়ান কিন্তু কার্যত সমাজবিরোধী অপরাধে অপরাধী। অস্তিবাদ (**Existentialism**)

বা ওই-জাতীয় আধুনিকদের গ্রাহ্য অন্য কোনো মনোহর মতবাদের রাংতা মুড়িয়ে গল্পোপন্যাসের আকারে এঁরা আসলে যা পরিবেশন করেন তা পোর্নোগ্রাফী ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু প্রচার মাহাত্ম্যে ওই সকল বইয়ের কী কাটতি! এমনিতেই এ ঘটনা দুর্ভাগ্যজনক, তার ওপর এই সব অপকৃষ্ট সৃষ্টির অনুকূলে সার্টিফিকেট দেবার মত লেখকের বা সমালোচকের অভাব হয় না। তাতে দুর্ভাগ্য আরও মর্মান্তিক হয়ে উঠেছে। এই সব দেহগন্ধী বইয়ের সঙ্গে আবার অধুনা যুক্ত হয়েছে বিদেশী গল্পের নকল কিছু মনোবিকলনধর্মী "জনপ্রিয়" সিনেমা-গল্পের বই। বাংলা সাহিত্যের সুস্থ ঐতিহ্যের উপর নানা দিক থেকে আঘাত আসছে। এই আঘাত ও তজ্জনিত ক্ষতি অচিরেই বন্ধ হওয়া দরকার। বাংলার আধুনিক প্রগতিশীল লেখকবৃন্দ এই ক্ষতি নিবারণে যত্নবান হবেন এটা আমরা সঙ্গতভাবেই তাঁদের কাছ থেকে আশা করব। সাহিত্যের প্রতি যেমন তাঁদের দায়িত্ব আছে তেমনি সমাজের প্রতিও তাঁদের দায়িত্ব আছে। বস্তুতঃ ওই দুই দায়িত্ব অচ্ছেদ্য এবং একই লেখকধর্মের এ-পিঠ আর ও-পিঠ। সার্থকনামা লেখক হতে গেলে যুগপৎ সাহিত্যমনা ও সমাজমনা লেখক হওয়া আবশ্যক।

৫

আমার আলোচনা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। কিন্তু আলোচনা শেষ করার আগে একটি বিতর্কমূলক বিষয়ের অবতারণা করতে চাই। বিষয়টি বর্তমান আলোচনায় প্রাসঙ্গিক বলেই এখানে সে কথার উল্লেখ করতে চাইছি, নয় তো অন্য কোনো অবসরে তা করা যেত।

লেখক সমাজ-সচেতনতা ও প্রগতিশীলতার আদর্শে বিশ্বাসী হলেও প্রগতিশীল সমাজবাদী রাজনৈতিক দলগুলির কোনো-একটিতে যোগ দেওয়া তাঁর উচিত কিনা এই হল প্রশ্ন। এই প্রশ্নে আমার কোনো-কোনো সাহিত্যিক-সুহৃৎ সদর্থক অর্থাৎ রাজনৈতিক দলে যোগদানের অনুকূলে মত প্রকাশ করেছেন। সবিনয়ে নিবেদন করি, এই প্রশ্নে আমার মত কিছু ভিন্ন। আমার ধারণা, জগৎ, জীবন ও মানুষের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশ্নে লেখক প্রগতিমুখী সমাজবোধের দ্বারা চালিত হয়েও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান থেকে নিজেকে বিমুক্ত রাখতে পারেন এবং সম্ভবতঃ তা-ই তাঁর রাখা উচিত। লেখক সমাজবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হবেন তাতে

সন্দেহ কী, কিন্তু তাঁর সাহিত্যধর্মের মধ্যেই এমন একটা কিছু আছে যা তাঁকে স্বাতন্ত্র্যের অভিমুখী করে, নির্দলীয় করে। এই স্বাতন্ত্র্য তাঁর ব্যক্তি-বিবেকের রক্ষাকবচ স্বরূপ এবং সব প্রশ্নকেই তাদের গুণাগুণের নিরিখে বিচারের প্রেরণাদাতা। আগেভাগেই তিনি কোনো একটা চিন্তা বা মতের সঙ্গে আপনাকে মিলিয়ে বসে থাকবেন না, তিনি খোলা মন নিয়ে বিচার করে তবে সিদ্ধান্তে আসবেন। তিনি রাজনীতির প্রবহমান ঢেউয়ের গতি অবশ্যই পর্যবেক্ষণ করবেন, শুধু একটু দূরে দাঁড়িয়ে পর্যবেক্ষণ করবেন; ঢেউয়ের স্রোতে তিনি মিশে যাবেন না, তিনি তটস্থ হয়ে তরঙ্গভঙ্গ লক্ষ্য করবেন। এই "তটস্থতা" তাঁর সাহিত্যিক স্বরূপেরই একটি অঙ্গ।

রাজনৈতিক সংস্থা, তা সে যতই অগ্রসর মনোভাবাপন্ন হোক, তার সঙ্গে লেখকের নিজেকে একাত্ম করার সুবিধা-অসুবিধা দুইই আছে। বোধ হয় খতিয়ে দেখলে অসুবিধার ভাগই বেশী। সুবিধা এই যে, তাতে অনেকের সঙ্গে মিলিত হয়ে কাজ করবার ঐক্যবোধ, সঙ্ঘশক্তি অনুভব করা যায় এবং তার ফলে একাকিত্বের বোধ কমে আসে ও আত্মপ্রত্যয় বাড়ে। অন্যান্য ব্যবহারিক সুবিধা, যেমন প্রচারভাগ্য, সঙ্গসুখ, গোষ্ঠীবদ্ধতাজনিত নানা বৈষয়িক লাভ এ সব তো আছেই। কিন্তু অসুবিধা এই যে, তাতে লেখকের আনুগত্যবোধের উপর প্রচণ্ড চাপ পড়ে। দলের খাতায় নাম লেখাবার অর্থই হল পুরোপুরি দলীয় নীতির অনুগত হয়ে চলা, অন্ততঃ শৃঙ্খলাপরায়ণ সদস্যের কাছ থেকে এইটেই আশা করা হয়। কিন্তু যে কোনো স্বধর্মনিষ্ঠ বিবেকী লেখকের পক্ষে দলীয় শৃঙ্খলার খাতিরেও বুঝি দলের সঙ্গে পুরোটা পথ যাওয়া চলে না। লেখকের স্বাতন্ত্র্যের হানি না ঘটিয়ে এটা সম্ভব নয়। এইরূপ সর্বগ্রাসী আনুগত্য দান করা বোধ হয় তখনই সম্ভব যখন লেখক আর তাঁর স্বাধীনতাকে প্রাণের বস্তু বলে জ্ঞান করেন না এবং অল্পস্বল্প বা নামমাত্র মূল্যে তা বিকিয়ে দেবার জন্য প্রস্তুত থাকেন। রাজনীতির ধর্ম আর সাহিত্যের ধর্ম এক নয়, যদিও এই দুইয়ের মধ্যে কোনো কোনো ব্যাপারে ভাবের মিল থাকা সম্ভব।

জানি প্রতিবাদীরা বলবেন, সাহিত্যিক যে আপনাকে কোনো রাজনৈতিক দলীয় সংস্থার সঙ্গে পুরোপুরি জড়াতে চান না তার মধ্যে তাঁর সুবিধাবাদী চরিত্র প্রকটিত। এবং ভীরু চরিত্রও। সুবিধাবাদ এইখানে যে, তার ফলে তাঁর পক্ষে হাওয়ার গতিক বুঝে যে-কোনো দলের সঙ্গে গা-শোঁকাশুঁকি করা সম্ভব হয়ঃ

তাল বুঝে তিনি এ-দল বা ও-দলের সঙ্গে মিশে নানা ব্যবহারিক সুবিধা করে নিতে পারেন। ভীরুতা এইজন্য যে, জনগণের অধিকার রক্ষার সংগ্রামে কিংবা অনুরূপ অন্য কোনো প্রশ্নে জনদরদী কোনো দলের নীতির সঙ্গে ষোল-আনা একাত্ম হয়ে চলবার ও তার ফলাফল ভোগ করতে প্রস্তুত থাকবার মত তাঁর মনোবল নেই বলেই তিনি দূরে সরে থাকতে চান। লেখকের স্বাতন্ত্র্যের যুক্তি একটা অজুহাত, অপ্রিয় পরিণাম থেকে আত্মরক্ষার একটি কৌশল।

এই যুক্তিক্রমের মধ্যে কিছুটা জোর আছে এবং এমন ব্যাপার যে ঘটে না তা-ও নয়, কিন্তু তৎসত্ত্বেও বলব, এমনতরো ভুল-বোঝাবুঝির ঝুঁকি নিয়েই লেখককে তাঁর স্বনির্দিষ্ট স্বতন্ত্র কক্ষপথে চলতে হবে। তার সাহিত্যের ধর্ম সুরক্ষিত রাখবার জন্যই তাঁকে তাঁর নিজের পথ আঁকড়ে থাকতে হবে। প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের সঙ্গে নিজের সত্তা মিশিয়ে দিয়েছেন এমন শক্তিমান সাহিত্যিকের অভাব নেই পৃথিবীতে, আবার তার বিপরীত দৃষ্টান্তও ভূরি-ভূরি আছে। শেষোক্ত বর্গের লেখকদের কেউ কেউ হয়তো প্রতিক্রিয়াশক্তির কুক্ষিগত হয়ে থাকবেন কিন্তু বেশীর ভাগ লেখকই তাঁদের নির্দল স্বাতন্ত্র্য অব্যাহত রেখে প্রগতির অনুকূলে জোরালো ভাবে লেখনী চালনা করেছেন। রাজনীতিতে যোগ দিয়ে তাঁরা যতটা না তার পোষকতা করতে পারতেন এইভাবে আলাদা থেকে তার চেয়ে অনেক বেশী পোষকতা করেছেন। রাজনীতিজ্ঞদের মধ্যে যাঁরা বিচক্ষণ তাঁরাও বোধ হয় স্বদলের সঙ্গে সাহিত্যিকের একাঙ্গীভূত হয়ে যাওয়াটা পছন্দ করেন না। তাঁরা সাহিত্যিকের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা সব সময়ই কামনা করেন কিন্তু রাজনৈতিক কারণেই এই দুই ধারার, সম্ভবতঃ ভিন্ন প্রকৃতিরও, মানুষের মধ্যে কোথাও না কোথাও একটা সীমারেখা থাকুক এটা দেখতে চান। রাজনীতিজ্ঞের এই মনোভঙ্গীটিই আমার নিকট সুস্থ মনোভঙ্গী বলে মনে হয়— কি রাজনীতির দিক্ থেকে, কি সাহিত্যের দিক্ থেকে।

লেখক তাঁর স্বতন্ত্র সত্তা বজায় রাখবেন কিন্তু অবশ্যই তিনি তাঁর শক্তি প্রতিক্রিয়ার সপক্ষে প্রয়োগ করবেন না, তাঁর সবটুকু বল ও নিষ্ঠা দিয়ে প্রগতির আদর্শের সেবা করবেন। তিনি জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষা ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক দাবির অতন্দ্র প্রহরী। এই প্রশ্নে বাদী-প্রতিবাদী উভয় পক্ষ যদি একমত হন তা হলে বাদানুবাদের আর কোনো ক্ষেত্র অবশিষ্ট থাকে বলে মনে করি না।

মানবমুক্তি ও লেখকের ভূমিকা

লেখকসমাজের পক্ষে আজ আত্মানুসন্ধান করবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে তাঁরা কোন পক্ষে থাকবেন— তাঁরা কি স্থিতাবস্থা ও কায়েমী স্বার্থের পক্ষ সমর্থনে তাঁদের লেখনীর শক্তি ক্ষয় করবেন, নাকি সমাজের অবহেলিত নির্যাতিত শোষিত শ্রেণীর অগণিত জনমানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের অন্তরের বেদনাকে প্রকাশ এবং তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন তাঁদের লেখনীমুখে ?

একটা সময় ছিল যখন দু-নৌকায় পা দিয়ে চললেও চলতে পারা যেত, কিন্তু এখন আর সে অবস্থা নেই। এখন হয় এই রাস্তা নয় তো ওই রাস্তা— এর একটিকে বেছে নিতেই হবে।

ধর্ম ও রাজমহিমার স্তুতি

আধুনিক কালের অভ্যাগমের আগে পর্যন্ত সর্বদেশে কবি শিল্পীদের অবস্থা কি ছিল? হয় তাঁরা রাজার মহিমা কীর্তন করেছেন, নয় তাঁরা ধর্মের বন্দনাগান গেয়েছেন। ক্ষমতাবানের পক্ষ ত্যাগ করে ক্ষমতাহীনদের পক্ষে দাঁড়াতে তাঁদের ক্বচিৎ দেখা গেছে। এরই মধ্যে হয়তো তাঁরা অপূর্ব শিল্প সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন অবিস্মরণীয় এপিক ও খণ্ড কাব্য, গাথা, ব্যালাড, চারণগীতি ইত্যাদি। কিন্তু তাই বলে কবিদের রাজসভাভিমুখী প্রবণতা তার দ্বারা ঢাকা পড়েনি। আমাদের ভারতীয় সাহিত্যের অনুষঙ্গে দেখতে পাই, বেদ-পুরাণের যুগ, সংস্কৃত কাব্যযুগ, মধ্যযুগ, প্রাক্-আধুনিক যুগ— প্রত্যেকটি পর্বে ধর্ম ও রাজমহিমার স্তুতি অব্যাহত ধারায় চলেছে। মানব মুক্তির সপক্ষে খুব কম কবিকেই তাঁর শক্তি প্রয়োগ করতে দেখা গেছে। ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়, তবে ওই ধরনের ব্যতিক্রম কোটিতে গোটিক বললেও চলে। যেমন মধ্যযুগের সহজিয়াপন্থী সাধক কবিগণ, কবীর, দাদু, রজ্জব প্রভৃতি কিংবা বাংলার বাউল কবিগণ। কিন্তু তাঁরা মানবমুক্তির বন্দনা করেছেন আধ্যাত্মিক অর্থে, লৌকিক জগতের পরিভাষায় তাঁরা মানুষের মুক্তির কথা বলেননি। সবচেয়ে যে বন্ধন জনসাধারণকে পীড়িত করে রেখেছে, তাদের উন্নতির পথে পদে পদে বাধার

সৃষ্টি করেছে, সেই অর্থনৈতিক বন্ধন থেকে মুক্তির কোন ইঙ্গিত তাঁরা দিতে পারেননি। মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে নিপীড়িত ও অবজ্ঞাত শ্রেণীর মানুষের দুঃখ দারিদ্র্যের বেদনা কিছু কিছু রূপ পেয়েছে, কিন্তু ধর্মের প্রসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে এই শোষণকে তার অর্থনৈতিক স্বরূপে ব্যাখ্যা করবার কোন চেষ্টা দেখা যায় না মঙ্গলকাব্যগুলিতে, হয়তো সেটা সেযুগের কবিদের পক্ষে সম্ভবও ছিল না।

পাশ্চাত্যের সাহিত্যের ইতিহাসেরও প্রায় একই চিত্র। মধ্যযুগ পর্যন্ত সাহিত্য ও শিল্পে ছিল খৃষ্টীয় যাজকতন্ত্রের আধিপত্য। একদিকে ধর্মগুরু পোপের নিরঙ্কুশ সর্বাধিনায়কত্ব, অন্যদিকে গির্জাশাসিত 'স্কুলমেন'দের প্রতি পদে সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ সৃষ্টিশীল প্রতিভার স্বাধীন বিকাশকে সর্বতোভাবে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। শিল্প ও জ্ঞানরাজ্য থেকে যুক্তি ছিল নির্বাসিত, অজ্ঞতা ও কুসংস্কার খৃষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসের ছদ্মবেশে দিকে দিকে অন্ধকার ছড়িয়ে চলেছিল। রেনেশাঁসের মুক্তির হাওয়া লাগতে এই অবস্থার পরিবর্তন হলো, কিন্তু তার মানে এ নয় যে, মানবমুক্তির জয়পতাকা চারদিকে বাধাবন্ধনহীনভাবে পত্‌পত্‌ করে উড়তে লাগলো। রেনেশাঁসের ফলে লাভ যেটা হয়েছিল তা হলো যুক্তিহীনতা, অতিপ্রাকৃতবাদ আর ধর্মীয় কুসংস্কাব মস্ত বড় একটা ঘা খেলো, দৈবের আর ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত হলো মানুষ আর নানাবিধ বন্ধন থেকে মুক্তির কামনা একটা নির্ভরযোগ্য আশ্বাস পেয়ে বহুমুখী সৃষ্টির উল্লাসে অবারিত হয়ে উঠলো। রেনেশাঁসের বুদ্ধির মুক্তির আলোকে পথরেখা চিনে নিয়ে মানবিকতার আদর্শ তার জয়যাত্রায় এগিয়ে চললো।

কিন্তু রেনেশাঁসের ভাবধারায় লালিত শিল্পী সাহিত্যিক কবিরা কি অবহেলিত শ্রেণীর মানুষের দুঃখবেদনাকে তাঁদের শিল্প সাহিত্যে কাব্যে রূপ দিতে পেরেছিলেন? মোটেই নয়। তার কারণ তাঁদের যুক্তিবাদ ও সংস্কারমুক্তির কামনা তাঁদের একটা সীমানা পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে গেছে, তার ওদিকে আর তাঁদের নিয়ে যেতে পারেনি। তাঁরা তাঁদের লেখায় রাজতন্ত্র, যাজকতন্ত্র আর অভিজাততন্ত্রকে আঘাত করে এই তিনের প্রভাব ক্ষুণ্ণ করেছেন ঠিকই, কিন্তু নতুন কালের যে-শিল্পবিপ্লবের মুখোমুখি এসে তাঁদের দাঁড়াতে হলো তার স্বার্থবন্ধন থেকে নিজেদের ছাড়িয়ে নেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব হলো না, অর্থাৎ শিল্প-বিপ্লবের মুখে উদ্গত বুর্জোয়া বা নবধনিকতন্ত্রের স্বার্থকে অতিক্রম করে খেটে-খাওয়া মেহনতী শ্রেণীর

গণনাহীন সাধারণ মানুষের পাশে গিয়ে তাঁরা দাঁড়াতে পারলেন না। ইতিহাসের চলার পথে বুর্জোয়া স্বার্থ আর এই সব তথাকথিত মানবতাবাদী শিল্পী সাহিত্যিক লেখকদের স্বার্থ অভিন্ন হয়ে দাঁড়ালো। কতকগুলি পুরনো বন্ধনকে ছাড়িয়ে গিয়েও তাঁরা নতুন এক বন্ধনে আপনাদের ধরা দিলেন।

জনগণের জাগরণ

কিন্তু এখন অবস্থা সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। আজকের জণগণ অতিশয় সচেতন, আপন অধিকার দাবি ও রক্ষার বিষয়ে যত্নশীল। তার উপর জনসাধারণ খুবই সঙ্ঘবদ্ধ ঐক্যের বোধে সংহত। জনগণকে রক্তচক্ষুর ভীতি প্রদর্শন দ্বারা দাবিয়ে রাখার দিন চলে গেছে। এ কথা অবশ্য ঠিক যে, পৃথিবীর দেশে দেশে পুঁজিবাদের অতন্দ্র প্রহরায় নিযুক্ত বুর্জোয়া শ্রেণীকে পরাভূত করা অদ্যাবধি সম্ভব হয়নি, ধনিক-বণিক-শিল্পপতি আজও তাঁদের শ্রেণীস্বার্থ অব্যাহত রাখবার জন্য প্রাণান্তিক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে; কিন্তু যে সত্যটিকে কোনমতেই আর ঢেকে রাখা যাচ্ছে না তা হলো— জনগণের জাগরণ। শ্রমিক-কৃষক আর অন্যান্য শোষিত স্তরের মানুষ আজ সকলেই তাঁদের অধিকারের বিষয়ে অতিমাত্রায় সজাগ এবং সেই অধিকার আদায়ের জন্য লড়াইয়ের ময়দানে নেমে পড়েছেন। কল-কারখানার মজুর আর ক্ষেতখামারের চাষী সকলেই আজ সংগ্রামকে তাঁদের জীবিকার অঙ্গীভূত করে নিয়েছেন। আর দিন দিন যতই এই সংগ্রামের প্রবলতা বাড়ছে ততই কায়েমী স্বার্থবাদীরা সব খোয়াবার আশঙ্কায় একেবারে হন্যে হয়ে উঠেছে। অস্তি ও নাস্তির এই মহাসমরে উভয় পক্ষই অন্য পক্ষকে পরাজিত করবার জন্য তাদের সকল শক্তি একত্র সংহত করবার চেষ্টা করছে, সর্বসাধ্য আয়ুধ আর রণসজ্জায় নিজেদের ভূষিত করে তুলতে চাইছে।

এতকালের প্রবল পক্ষ কায়েমী স্বার্থবাদীরা তাদের চিরকালীন অভ্যাস অনুযায়ী লেখক সমাজকে হাত করে আপনাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির কাজে লাগাবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। এজন্য মোটা আর্থিক প্রাপ্তির হাতছানি, পুরস্কারের ফাঁদ, উৎকোচ ও উপঢৌকন, লোভনীয় চাকরির আশ্বাস— কোন প্রলোভনের দ্বারাই লেখকদের বিভ্রান্ত করার জারিজুরি থেকে এরা প্রতিনিবৃত্ত হচ্ছে না। শক্তিমান লেখকদের কুক্ষিগত করবার জন্য এরা কল্পনীয়-অকল্পনীয় সম্ভব-অসম্ভব সকল প্রকার উপায়ই পরীক্ষা করে দেখছে। অন্যপক্ষে এতাবৎকালীন শোষিত

শ্রেণীর পক্ষের বক্তব্যও সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অঘোষিত বা অপ্রচারিত থাকছে না। ক্ষমতাবান শ্রেণীর অনুগ্রহ নিগ্রহের পরোয়াবিহীন রাজদণ্ডের ভীতিভ্রূকুটি অগ্রাহ্যকারী একদল আদর্শনিষ্ঠ সাহসিক লেখক স্বতঃপ্রণোদিতভাবে মেহনতী মানুষের সংগ্রামের ক্ষেত্রে তাঁদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। দুই পক্ষের মধ্যে সংগ্রাম যত তীব্র হচ্ছে তত লেখকদের মধ্যে এই শিবির বিন্যাসের প্রক্রিয়া তীব্রতর হচ্ছে। এইভাবে প্রগতি ও প্রতিক্রিয়া এই দুই ভাগে সাহিত্যের ভাগ হয়ে যাচ্ছে। কায়েমী স্বার্থ আর প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থ (এস্টাব্লিশমেণ্ট) এক শ্রেণীর লেখককে কিনে নিয়ে তাদের প্রতিক্রিয়ার সেবায় নিয়োজিত করছে, অন্য এক শ্রেণীর লেখক আদর্শের প্রণোদনায় তথা আপন প্রাণের টানে প্রগতির শিবিরে গিয়ে সমবেত হচ্ছেন। এই ভাবেই আমাদের পশ্চিমবাংলায় একদিকে বাজারী সাহিত্যের সৃষ্টি ও পুষ্টি হয়ে চলেছে, অন্যদিকে গণমুখী সাহিত্য ক্রমশঃ জোরালো হচ্ছে।

লেখকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

মানবমুক্তির প্রশ্নে আজ পশ্চিমবঙ্গের লেখক সমাজ এক পথসন্ধিতে এসে দাঁড়িয়েছেন। লেখকদের কে কোন্ পথে চলবেন সে তাঁর নিজ নিজ অভিরুচির উপর নির্ভর করছে। তবে খেয়াল রাখা দরকার, যুগের প্রয়োজন, প্রত্যাশা ও দাবি লেখকের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিরূপণের ক্ষেত্রে কোনরূপ অস্পষ্টতার অবকাশ রাখছে না। এ কথা বোঝবার সময় হয়েছে যে, সত্যিকারের লেখক যিনি, যিনি যথার্থ শিল্পীনামবাচ্য হতে চান, তাঁর স্থান অবশ্যই শোষিত ও নির্যাতিত শ্রেণীর পাশে। ক্ষমতাবানের ভজনা, কায়েমী স্বার্থের পরিপোষণ কোনমতেই লেখকের স্বধর্ম হতে পারে না। পুরাতনকালের লেখক নিরুপায়তার বশে অদৃষ্টরূপী ধর্মের রাজার ও শক্তিমানের স্তুতি করতে বাধ্য হতেন ; এখন আর সমাজের সে অবস্থা নেই। পাল্লা এখন দৃষ্টিগ্রাহ্যভাবেই জনগণের দিকে ঝুঁকেছে। তাই যদি হয় তো লেখকদের কিসের এত ভয় ? কেন তাঁরা এখনও কায়েমী স্বার্থের ফাঁদে পা দিয়ে শোষিত শ্রেণীর বিপক্ষাচরণ করবেন ? আজকের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জাগ্রত জনগণই প্রবলতর পক্ষ। বুর্জোয়াদের পায়ের তলা থেকে ক্রমেই মাটি সরে যাবার দাখিল হয়েছে। এক্ষেত্রে লেখকদের কর্তব্য নিধারণের বেলায় কোনরূপ দ্বিধার মনোভাব থাকা উচিত নয়। আদর্শের ন্যায্যতার কারণে তো

বটেই, বাস্তব বুদ্ধির বিচারেও, যে তরী অবশ্যই ডুবতে বসেছে তাকে বাঁচাবার ব্যর্থ চেষ্টা না করে যে তরী যুগযুগ সঞ্চিত প্রবল ঝড়ঝাপটার আঘাত সহ্য করেও অদ্যাবধি ভাসমান রয়েছে এবং ভেসে চলতেই বদ্ধপরিকর, তার পালে হাওয়া যাতে আরও জোরদার হয় তৎপক্ষে শক্তি জুগিয়ে চলাই লেখকদের কর্তব্য। জনগণের পক্ষে লেখনী ধারণ একটি পবিত্র দায়িত্ব। এই দায়িত্ব সুষ্ঠু-ভাবে পালনের উপর লিখনকর্মের সার্থকতা, যৌক্তিকতা দুই ই নির্ভর করছে।

বাংলা সাহিত্যে যুক্তিবাদ

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে যুক্তিবাদের ঐতিহ্য উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত প্রায় অবিচ্ছেদে প্রবাহিত। খতিয়ে দেখতে গেলে উনিশ শতকেই এই ঐতিহ্য প্রবলতব ছিল, আধুনিককালে এর ধারা কিঞ্চিৎ ক্ষীয়মাণ বলে মনে হয়। অবশ্য মার্কসীয় চিন্তাদর্শনেব অনুসারী প্রগতিশীল লেখকদেব বচনানীতিব মধ্যে এবং কিছু সংখ্যক স্বভাবগতভাবেই যুক্তিপন্থী লেখকদেব বচনাকর্মের মধ্যে যুক্তিবাদী মনোভাব আজও বেশ লক্ষণীয়রূপে বহমান, তবে তুলনামূলকভাবে বলতে গেলে উনবিংশ শতাব্দীতেই যে যুক্তিবাদের প্রভাব সমধিক গণনীয় ছিল সে বিষযে সন্দেহ কবা চলে না।

যুক্তিবাদের একটি প্রধান আশ্রয় গদ্য শিল্প। আবও সংকুচিত করে বললে, প্রবন্ধ সাহিত্য। কবিতায যুক্তি চলে না এমন নয। তবে কবিতাব যুক্তির জাত আলাদা। তাকে বলা যেতে পারে emotive logic অর্থাৎ ভাবাবেগ দীপ্ত যুক্তিক্রম। গদ্যের লজিক এর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতেব বস্তু। গদ্যেব লজিকের একটি কেন্দ্রীয় প্রতিপাদ্য বা বক্তব্য থাকে। এবং এই বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য একটি যুক্তিব শৃঙ্খল গডে তোলা হয় যার আদি আছে মধ্য আছে অন্ত আছে এবং এই তিনটি সুচিহ্নিত স্তরেব মধ্যে চিন্তার অবশ্যম্ভাবী ধাবাবাহিকতা আছে। একটি সুগ্রথিত প্রবন্ধ দাঁড করাতে গেলে প্রস্তাব উত্থাপন কবেই তক্ষুনি সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো যায় না — ধাপে ধাপে যুক্তিগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয এবং যখন পক্ষের সব কথা বলা হয়েছে এবং বিপক্ষের সম্ভাব্য সব মত খণ্ডন কবা হয়েছে তখুনি মাত্র প্রবন্ধটিকে সিদ্ধান্তের কিনারায় নিয়ে যাওয়ার মত অবস্থা দাঁডায, তার আগে প্রবন্ধেব সমাপ্তি ঘটালে সেটা আধ-খেঁচড়া প্রবন্ধ হয, পূর্ণাবয়ব প্রবন্ধের আকার পায না। মাঝের স্তরগুলি বাদ দিয়ে শুরুর পরেই উপসংহারে যাবাব চেষ্টা করলে যুক্তিক্রম সাংঘাতিকভাবে ব্যাহত হয়, সুতরাং সেটি আব বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাপাব থাকে না, এমত ক্ষেত্রে বোধবুদ্ধি প্রায়শঃ বিপর্যস্ত হতেই বরং দেখা যায়।

আদি-মধ্য অন্তক্রমে সুবিন্যস্ত যুক্তিনিষ্ঠ গদ্যেরই অপর নাম প্রবন্ধ। যুক্তিবাদ প্রবন্ধেব মূলাশ্রয বললেও চলে।

মুদ্রণ-যন্ত্রের প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে সব দেশের সাহিত্যেই গদ্যের বিকাশ হয়েছে, এ দেশের সাহিত্যও তার ব্যতিক্রম নয়। বাংলা গদ্যের ক্রমোন্নতির সঙ্গে বাংলা মুদ্রণ-যন্ত্রের অগ্রগতির ইতিহাস অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অথবা কথাটাকে ঘুরিয়ে বলা যায়, এদেশে মুদ্রণযন্ত্রের যত উন্নতি হয়েছে তত গদ্য সাহিত্যের বিস্তার হয়েছে। দুইয়ের সহাবস্থান পাশাপাশি হাত-ধরাধরি করে এগিয়ে চলার সম্বন্ধে বিধৃত। কেরী-মার্শমান-ওয়ার্ড প্রমুখ শ্রীরামপুরের পাদ্রীদের এই দ্বিবিধ ক্ষেত্রে অবদানের কথা সকলেই জানেন। তাঁরা শুধু এদেশে মুদ্রণ-যন্ত্রের প্রবর্তন করেই ক্ষান্ত থাকেননি, বলতে গেলে বাংলা গদ্য সাহিত্যেরও জনক তাঁরা। এবং তাঁদের প্রদর্শিত রেখাচিহ্ন অনুসরণ করেই তাঁদের সম-সাময়িকদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামরাম বসু, তারিণীচরণ মিত্র, ভবানী-চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় এবং রামমোহন রায় এবং অব্যবহিত পরবর্তীদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বাংলা সাহিত্যে গদ্যের সৌধ নির্মাণে তাঁদের শক্তি ও প্রতিভার প্রয়োগ করেন। এবং সেই সঙ্গে যুক্তিবাদের ঐতিহ্যটিও তাঁরা একই সঙ্গে গড়ে তোলেন।

এঁদের আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে গদ্য বলতে বিশেষ কিছু ছিল না। গোটা মধ্যযুগ জুড়ে বাংলা ভাষায় কাব্যের একাধিপত্য লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য সব দেশের মধ্যযুগের সাহিত্যেরই এটা বৈশিষ্ট্য, বাংলা ভাষাকে এ ক্ষেত্রে একক দৃষ্টান্ত মনে করার কোন হেতু নেই। মধ্যযুগের কাব্যের জগৎ একান্তভাবে ধর্মাশ্রিত, ফলে ওই কালে অনুভবের যত চর্চা হয়েছে, ভাবাবেগের যত চর্চা হয়েছে, যুক্তির চর্চা সেই তুলনায় তার সিকির-সিকিও হয়নি। বৈষ্ণব লিরিক কবিতায় শুধুই গভীর ভাবাবেগের লীলা, শাক্ত কবিতায় কেবলই ভক্তির গদগদ আতিশয্য। কৃত্তিবাস-কাশীরাম দাসের কাহিনী কাব্যদ্বয়ে এবং মঙ্গল-কাব্যগুলিতে অবশ্য কিছুটা বহির্মুখ দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় কিন্তু সেগুলিরও মূলকথা মানবতা নয়, দৈবী মহিমার প্রকাশ। সুতরাং সেগুলিতেও যুক্তির সংস্কার উপেক্ষিত।

বরণীয় পথিকৃৎ স্থানীয় পূর্বোক্ত গদ্য লেখকদের প্রধান কৃতিত্ব এখানে যে তাঁরা বাংলা ভাষাকে কাব্যকল্পনার জগৎ থেকে কিয়ৎ পরিমাণে অন্ততঃ মুক্ত করে যুক্তির সরণীতে এনে স্থাপন করব।রচেষ্টায় সফলকাম হলেন। এ যাবৎ বাংলা

ভাষার দেহ অতিমাত্রায় নমনীয়-কমনীয় পেলব সুষমাযুক্ত ছিল। আত্যন্তিক কাব্যচর্চার প্রভাবে এবং উল্লেখ করবার মত গদ্য রচনার নজীর না থাকার কারণে বাংলা ভাষার অবয়বে লালিত্য-মাধুর্য কান্তি-লাবণ্যশ্রী যত স্ফূর্তিমতী হয়ে প্রকাশ পেয়েছে, তার অঙ্গ-সংস্থানে ঋজুতা বা দার্ঢ্যের ততটা জায়গা হয়নি। সহৃদয় হৃদয় সংবেদ্য স্নিগ্ধ মধুর ভাবানুভূতিই এতকাল আমাদের প্রায় সবটা মন কেড়ে নিয়েছে, চিন্তার দিকে আমাদের মন তেমন আকৃষ্ট হতে পারেনি। অনুভবের ও কাল্পনিকতার চর্চাটাই যে সাহিত্যের একমাত্র অনুশীলনযোগ্য বিষয় নয়, মননের চর্চাও সমান জরুরী— এই বোধটাই ইংরেজ আসার আগে পর্যন্ত এদেশীয় সাহিত্যে কমবেশী উপেক্ষিত ছিল। সুতরাং এর অবধারিত ফল যেটা হবার তা-ই হয়েছিল— গদ্য সাহিত্যের মোটে জন্মই হতে পারেনি মধ্যযুগে। ইংরেজ এদেশে কায়েম হয়ে বসবার আগে বাংলা ভাষায় গদ্যের নমুনা বলতে ছিল কিছু আইন আদালতের দলিল দস্তাবেজ, দান-খয়রাতের নিদর্শনস্বরূপ কিছু পাট্টা বা কবলুতি-নামা, শাসকদের নামাঙ্কিত কিছু শিলালেখ ও শীলমোহর, আর কিছু সাদামাটা অমার্জিত ভাষায় লেখা চিঠিপত্র, ইত্যাদি।

বাংলার পূর্বনামীয় প্রথম যুগের গদ্য লেখকগণ গদ্যের চর্চার মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার এতকালের প্রচলিত আত্যন্তিক কাব্যিকতার সংস্কারটিকে ভাঙলেন। তাঁরা বাংলা ভাষাদেহের আগাগোড়া কোমল অঙ্গ সংস্থানের মধ্যে একটা মেরুদণ্ডের সংযোজনা করলেন। মানুষ যে শুধু তরল খাদ্যেই জীবন ধারণ করে না, তাকে নিরেট খাদ্যও গ্রহণ করতে হয় বাঁচবার জন্য তার কার্যকর নিদর্শন রূপে সুপেয় পদ্যের পাশে পাশে সারবান গদ্যেরও একটা সুবৃহৎ ভাণ্ডার গড়ে তুললেন বাংলা সাহিত্যের আঙিনায়। এখন থেকে অনুভাবন, বোধন, কল্পনা— কেবল এইগুলিই পাঠকের সংবেদের বিষয় হয়ে থাকলো না, মননও তাঁর সমান চর্চাযোগ্য বিষয় হলো। বাংলা ভাষায় চিন্তাশীলতার অনুশীলনীর আরম্ভ হলো। ইংরাজীতে একটি কথা আছে— literature of power (সৃজনধর্মী সাহিত্য) বনাম literature of knowledge (জ্ঞানধর্মী সাহিত্য)। বাংলায় সৃজনীমূলক সাহিত্যের অভাব ছিল না, বরং কিছু বাড়তিই ছিল এই খাতে বরাবর। কিন্তু জ্ঞানবাদী সাহিত্যের কোন ঐতিহ্য ছিল না। বাংলা গদ্যের প্রবর্তনায় এই ঐতিহ্যেরই সৃষ্টি হলো বাংলা ভাষায়। সুন্দর একটি অনুভববেদ্য বিষয়ের মত, সুন্দর একটি কল্পনার মত চিন্তাও যে মানুষের মনকে সমান আকর্ষণ করতে পারে

এবং তার অভিনিবেশকে সমান ধরে রাখতে পারে তার কার্যকর উদাহরণ স্থাপিত হলো। হৃদয়ের ক্ষুধার মত জ্ঞানের ক্ষুধাও যে মানুষের একটি মৌল ক্ষুধা বাংলা সাহিত্যের অনুষঙ্গে তার উপযুক্ত আবহ তৈরী হতে আরম্ভ হলো।

এবং এইভাবেই বাংলা ভাষায় যুক্তিবাদের ঐতিহ্য গড়ে উঠলো। চিন্তাচর্চার ঐতিহ্য আর যুক্তিচর্চার ঐতিহ্য অভিন্ন বললেও চলে। চিন্তাকে মজবুত, ধারালো, প্রতীতিযোগ্য আকারে খাড়া করে তুলতে হলে তাকে যুক্তিনির্ভর করে গড়ে তুলতেই হবে, এর আর চারা নেই। যেখানেই চিন্তা, সেখানেই যুক্তি। যেখানেই যুক্তি, সেখানেই চিন্তা। চিন্তা আর যুক্তি অচ্ছেদ্য শৃঙ্খলে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত। ফলে গদ্য সাহিত্যের বিকাশ মানে একই সঙ্গে যুক্তিবাদেরও বিকাশ।

বাংলা গদ্যের বিবর্তনের ইতিহাসের ছকটি সামনে রেখে এবার তার অগ্রগতির পথের কিছু দিক্‌চিহ্নের সন্ধান লওয়া যেতে পারে।

বাংলা আদি পর্বের গদ্যলেখকদের মধ্যে সবচেয়ে যাঁরা বিশিষ্ট, যেমন রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, ভূদেব প্রমুখ, সকলেই মুখ্যত যুক্তিবাদী লেখক। এঁদের রচনায় কান্তি কম,— গদ্যভাষা বলতে গেলে তাঁরা নিজেরাই নিজের হাতে সৃষ্টি করেছেন, ফলে তাঁদের রচনাকে সৌন্দর্য সৌষ্ঠবে মণ্ডিত করবার অবসর বড় একটা তাঁরা পাননি, বাংলা গদ্যের বহিরঙ্গ কাঠামো তৈরীর কাজেই তাঁদের সময় ও উদ্যম ব্যয়িত হয়েছে বেশী। ভাষার চারুতা বিধানে তাঁরা তাদৃশ মনোযোগ আরোপ করতে পারেননি। নিষ্ফলা জমি আবাদযোগ্য করে তোলার কাজেই যাঁদের হাত দিতে হয় সেই সব পথিকৃৎ কৃষকদের ভূমির পারিপাট্য ও মনোহারিত্ব সাধনে অধিক সময়ক্ষেপ করতে গেলে চলে না, তাতে তাঁদের মূল কাজ বিঘ্নিত হয়। এঁদের সম্পর্কেও সেই একই কথা বলা চলে।

এঁদের মধ্যে আবার রামমোহনের গদ্যে শ্রীছাঁদ একটু লক্ষণীয়ভাবেই কম। কি বেদান্ত ধর্মের প্রতিষ্ঠায় কি ক্রীশ্চিয়ান মিশনারীদের সঙ্গে বাক্‌যুদ্ধ পরিচালনায় কি সামাজিক কুপ্রথাগুলির উপর আক্রমণ সংহত করবার অভিযানে রামমোহন যে গদ্যের ব্যবহার করেছিলেন তার প্রকৃতি প্রতিপাদনমূলক (discursive), বক্তব্যপ্রধান, বিতর্ক সঙ্কুল। যেহেতু প্রায়শঃ তাঁকে প্রতিপক্ষের সঙ্গে তর্কযুদ্ধ চালাতে হয়েছে সেই কারণে বক্তব্য প্রতিষ্ঠায় যুক্তিকেই তাঁর প্রধান

হাতিয়ার করতে হয়েছে, এমনকি ধর্মীয় প্রসঙ্গেও অনুভব বেক্তা অপেক্ষা যুক্তির উপরেই তিনি বেশী নির্ভর করেছেন। তাঁর বেশীর ভাগ প্রবন্ধই পুস্তিকা (tract অথবা pamphlet) জাতীয়। প্রবন্ধ অপেক্ষা সন্দর্ভ বললেই সেগুলির সঠিকতর পরিচয় দেওয়া হয়।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মূলতঃ ধর্মবিষয়ক গদ্যের লেখক। তবে তাঁর ধর্মচিন্তা যুক্তিবিবর্জিত নয়। যুক্তির সঙ্গে কিছু পরিমাণ লাবণ্যও এসে মিশেছে তাঁর গদ্যের চালের ভিতর। বিশেষ করে তাঁর আত্মচরিত যুক্তি ও কান্তির সমাহারের এক সুন্দর দৃষ্টান্ত। বাংলা গদ্যের অগ্রগতির ইতিহাসে এই পুস্তকখানি নানা কারণে একটি স্মরণীয় রচনার গৌরব দাবি করতে পারে। তাঁর ব্রাহ্মধর্ম বই-খানাও প্রাঞ্জল গদ্যের এক চমৎকার নিদর্শন।

বিদ্যাসাগর আদি যুগের আরেক জন প্রথম শ্রেণীর যুক্তিপন্থী গদ্যলেখক। যদিও তাঁর অধিকাংশ রচনা অনুবাদ বা ভাবানুবাদ এবং কিছু রচনা বাদানুবাদ মূলক— মৌলিকতার দাবি তিনি নিশ্চয় করতে পারেন না— তাহলেও তিনিই প্রথম বাঙালী গদ্যলেখক যাঁর ভাষার চালে সচেতন পরিমিতি জ্ঞানের সন্ধান মেলে। তিনি একান্তভাবেই যুক্তিপন্থী লেখক। তবে কান্তি বিবর্জিত নন। বরং বাক্যের বিন্যাসে অন্বয়ের নিয়ম শৃঙ্খলা অনুসরণে ও যতির ব্যবহারে তিনি যে অব্যভিচারী শৃঙ্খলা প্রীতির পরিচয় দিয়েছেন তাতে তাঁর অন্তরস্থ সৌন্দর্যানুরাগ ফুটে উঠেছে তাঁর প্রতিটি রচনার মধ্য দিয়ে। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'মনীষী স্মরণে' বইতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গদ্য শৈলীর বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে তার 'কমা' 'দাঁড়ি' প্রভৃতি যতিচিহ্নের ব্যবহারকে বাংলা ভাষার অগ্রগতি বিধানে যুগান্তকারী বৈপ্লবিক পদক্ষেপ বলে বর্ণনা করেছেন। বিদ্যাসাগর যে অন্তরে অন্তরে ছিলেন শৃঙ্খলা ও সুমিতির পক্ষপাতী তাঁর এই বৈপ্লবিক প্রকরণাদি প্রয়োগের মধ্যে তারই অসংশয় সাক্ষ্য মেলে। আর এ কথা কে না জানে যে, যেখানেই শৃঙ্খলা পারিপাট্য পরিমিতি সৌষ্ঠবজ্ঞান, সেখানেই সৌন্দর্য বোধ কোন না কোন আকারে বাসা বেঁধে আছে।

বিদ্যাসাগরই প্রথম বাংলা গদ্য লেখক যাঁর রচনাশৈলীতে যুক্তিজ্ঞানের সঙ্গে চারুতার একটি সুষ্ঠু সমন্বয় সাধিত হয়েছিল। 'বর্ণ পরিচয়' থেকে আরম্ভ করে 'কথামালা' 'বেতালপঞ্চবিংশতি', 'ভ্রান্তিবিলাস', 'সীতার বনবাস', 'শকুন্তলা' প্রভৃতি প্রতিটি বইতে এ কথার প্রমাণ মিলবে।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় একজন আচার্য পদবাচ্য অভিভাবক স্থানীয় লেখক যাঁর মনোভঙ্গী রক্ষণশীলতার দ্বারা কমবেশী প্রভাবান্বিত হলেও গদ্য রচনায় তিনি কিন্তু বিশেষ পরিচ্ছন্ন মনের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর 'সামাজিক নিবন্ধ', 'পারিবারিক নিবন্ধ' প্রভৃতি গ্রন্থের গদ্য আশ্চর্য প্রাঞ্জল ও যুক্তির ক্রমে বিন্যস্ত। বিদ্যাসাগর ছাড়া এমন প্রাঞ্জল গদ্য খুব কম জনাই লিখতে পেরেছেন আদি যুগের গদ্য লেখকদের মধ্যে। তবে এ কথা স্বীকার্য, রামমোহনের মত তাঁর লেখায়ও কান্তি কম, লাবণ্য কম। তবে কান্তির অভাব তিনি পূরণ করেছেন প্রাঞ্জলতা তথা সুখপাঠ্যতার দ্বারা। রামমোহনের লেখায় শেষোক্ত গুণটি আরোপ করা চলে না।

এঁদের মধ্যে সবশেষে যাঁর কথা বলছি— অক্ষয়কুমার দত্ত— তিনি কিন্তু যুক্তিনিষ্ঠার ক্ষেত্রে সর্বাগ্রগণ্য। প্রথম যুগের বাঙ্গালী গদ্য লেখকদের মধ্যে তাঁর তুল্য যুক্তিঅন্ত-প্রাণ লেখক দ্বিতীয় জন্মান নি। তিনি ছিলেন দেবেন্দ্রনাথের ভাবশিষ্য এবং ব্রাহ্ম আন্দোলনের একজন নেতা। তাঁর রচনা সৌকর্যে মুগ্ধ হয়ে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর উপর আদি ব্রাহ্ম সমাজের মুখপাত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদনার ভারার্পণ করেছিলেন। কিন্তু ওই যুক্তিজ্ঞানের প্রশ্নেই গুরুর সঙ্গে শিষ্যের মতভেদ ঘটেছিল এবং উভয়ের মধ্যে কার্যতঃ বিচ্ছেদ ঘটে। দেবেন্দ্রনাথ যেখানে প্রজ্ঞা উদ্ভাসিত হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করতে উন্মুখ ছিলেন, অক্ষয়কুমার সেই স্থলে যুক্তি দিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মদের 'আত্মীয় সভার' অধিবেশনে একবার ভোটের দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাস্তিত্ব সাব্যস্তকরণে যত্নবান হয়েছিলেন, যার জন্য দেবেন্দ্রনাথের কাছ থেকে তাঁকে তিরস্কার সইতে হয়েছিল। এইখানেই শেষ নয়, তিনি প্রার্থনার অসারতা প্রমাণের জন্য বিশেষ একটি সমীকরণ (equation) মূলক যুক্তি অবরোহণী উদ্ভাবন করেছিলেন, যে-সমীকরণটি সুবিদিত। জনশ্রুতি প্রচলিত যে, কলকাতায় তাঁর সময়ে চূড়ামণি বা অর্ধোদয় বা ওই জাতীয় কোন 'পুণ্য' যোগস্নান কালে যখন শহরের অধিকাংশ লোক গঙ্গাভিমুখে ধাবিত হতো, তখন তিনি জেনে শুনে একটি সচেতন প্রয়াসের অঙ্গ হিসাবে গঙ্গার উল্টো দিকে মুখ করে চলতেন।

কিন্তু এসব তো হলো কিংবদন্তী শ্রেণীর কাহিনী। নিরেট রচনা কর্মের ক্ষেত্রে অক্ষয়কুমার 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার', 'চারুপাঠ',

'ভূগোল', 'পদার্থবিদ্যা', 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' দুই খণ্ড প্রভৃতি বই তাঁর অকাট্য যুক্তিনিষ্ঠার সাক্ষ্য দেবে। অক্ষয়কুমারের ভাষার গঠন প্রণালী, যুক্তিক্রম, শব্দ প্রকরণ ইত্যাদির বিচার করে বাংলায় ডক্টর নবেন্দু সেন একখানি বই লিখেছেন। যাকে বলে ভাষার 'মর্ফোলজি' (আকৃতি বিজ্ঞান) তার উপর বাংলায় এই বোধকরি প্রথম বই। বইখানি অনুসন্ধিৎসুদের নেড়ে চেড়ে দেখতে অনুরোধ করি।

বাংলার প্রথম যুগের গদ্য লেখকদের উপর যুক্তিজ্ঞানের এতটা প্রভাব পড়েছিল কী সূত্রে এবং কোন পথ ধরে? এ বিষয়ে আমার দুটি অনুমান। অনুমান দুটি কতটা গ্রাহ্য হবে জানি না, তবে তাদের গুণাগুণ নিরপেক্ষ ভাবেই সে দুটি এখানে উপস্থিত করছি, পাঠক বিচার করে দেখবেন।

প্রথম কথা, উল্লেখিত গদ্য লেখকদের কারও কারও সমসাময়িক এবং কারও কারও অগ্র স্থানীয় ডিরোজিও ও তাঁর 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর শিষ্য সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভংগী মনে হয় এঁদের উপরে বেশ কিছু পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করে থাকবে। ডিরোজিয়ানদের মন পাশ্চাত্ত্য যুক্তি জ্ঞানের সংস্কার দ্বারা বিশেষভাবে কর্ষিত ছিল। তাঁদের কুসংস্কার বিমুখতা, অলৌকিকের প্রতি অবিশ্বাস, অথরিটি অর্থাৎ শাস্ত্র বাক্যকে সন্দেহের চোখে দেখা, প্রমাণ ব্যতিরেকে কোন কিছুকেই সত্য বলে স্বীকার করতে দ্বিধা, বিশুদ্ধ জ্ঞানের তৃষ্ণা— এসব অভ্যাসই তাঁরা পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের (যথা দেকার্তে, লক, হিউম, বেন, স্পিনোজা, কাণ্ট প্রমুখ) রচনাবলী পাঠে আয়ত্ত করেছিলেন। বিগত শতকের বিশের দশকের হিন্দু কলেজের আবহাওয়া এবং তিরিশের দশকের জ্ঞানোপার্জিকা সভার আলোচনার বাতাবরণ নিঃসন্দেহে বাংলার প্রথম যুগের গদ্য লেখকদের মানসিক গঠনকে প্রত্যক্ষে না হলেও পরোক্ষে প্রভাবিত করেছিল বলে অনুমান হয়। রামমোহনের কথা আলাদা। তিনি তো ডিরোজিওরও আগেকার মানুষ, কিন্তু অন্যান্যেরা নিশ্চিত ডিরোজিয়ানদের প্রভাবের বলয়ের মধ্যে ধরা দিয়েছিলেন— সাক্ষাৎ অনুপ্রেরণার সূত্রে না হলেও তৎকালের আকাশে বাতাসে সঞ্চরমাণ যুক্তিজ্ঞানমূলক ভাবপ্রবাহের প্রভাব বশতঃ নিশ্চয়ই। যুগধর্মকে অস্বীকার করবার সাধ্য কারও নেই।

ডিরোজিয়ানদের মধ্যে বিশেষ কেউ বাংলা ভাষায় লেখনী চালনা করেননি। তাঁদের সমস্ত রচনা, ভাষণাদি ইংরেজীতে (মধুসূদন এঁদের দৃষ্টান্ত প্রভাবেই

ইংরেজীতে কাব্য রচনার প্রেরণা পেয়েছিলেন বলে মনে হয়)। ব্যতিক্রম শুধু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার। তবু যে তাঁদের প্রভাব বাংলা ভাষার লেখকদের উপর পড়েছিল তার কারণ তাঁদের চিন্তা-দর্শের শক্তি। তাঁদের যুক্তিজ্ঞানের সংস্কার ও ইহমুখীনতা জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে নিঃসন্দেহে বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের উপর প্রভাব ফেলেছিল। ডিরোজিয়ানদের চিন্তার যে অংশ খুবই র‍্যাডিকাল, তার প্রভাব সবচেয়ে বেশী পড়েছিল অক্ষয়কুমারের উপর। অক্ষয় দত্তের মত র‍্যাডিকাল ভাবের ভাবুক লেখক উনিশ শতকের বাংলায় আর একজনও জন্মাননি।

দ্বিতীয় অনুমান সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের ইংরেজী গদ্য সাহিত্যের প্রভাব। সতেরো শতকের শেষাশেষি এবং আঠারো শতকে ইংরেজী ভাষায় অনেক শক্তিশালী গদ্যলেখকের আবির্ভাব হয়েছিল, যাঁদের মধ্যে কতিপয় দিক্‌পাল হলেন ড্রাইডেন, বানিয়ান, সুইফট, পেপিস, অ্যাডিসন, স্টীল, ডিফো, স্যামুয়েল জনসন, গোল্ডস্মিথ, বসওয়েল, গিবন, হিউম, বার্ক, অ্যাডাম স্মিথ প্রমুখ। বস্তুতঃ গদ্যলেখকদের এক সারিবদ্ধ মিছিল বলা যায়। এঁদের মধ্যে সকলেই যে প্রগতিশীল ভাবধারার বাহক ছিলেন তা নয়, দৃষ্টান্তস্বরূপ ডঃ জনসন, বসওয়েল প্রমুখকে ভাবের ক্ষেত্রে রক্ষণশীল মনে না করে উপায় নেই; কিন্তু তা হলেও সকলেরই গদ্যের চাল ছিল মূলতঃ যুক্তিপন্থী। যে জন্য গোটা আঠারো শতক কালব্যাপী ইংরেজী সাহিত্যের যুগটিকে 'এজ অব রীজন' নামে অভিহিত করা হয়েছে। অর্থাৎ যুক্তিজ্ঞানই এই যুগের বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষণরূপে চিহ্নিত হয়েছে ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসকারদের দ্বারা।

ইংরেজী সাহিত্যের সতেরো ও আঠারো শতকের যুক্তিচর্চার ঐতিহ্য নিঃসন্দেহে উনিশ শতকের বাংলা গদ্য লেখকদের সামনে অন্যতর পুরোবর্তী প্রভাবরূপে কাজ করেছে বলে বোধহয়। আঠারো শতকের ইংরেজী 'এজ অব রীজন'-এর মত উনিশ শতকের আদি পর্বের বাংলা গদ্য লেখকেরাও বাংলা-ভাষায় এক ধরনের 'এজ অব রীজন'-এর প্রবর্তন করেছিলেন বলে মনে করবার কারণ আছে। তবে সে প্রভাব স্থায়ী হয়েছিল কিনা সেটা স্বতন্ত্র কথা। যথা-স্থানে প্রসঙ্গটি নিয়ে আরও আলোচনা করা যাবে।

এ পর্যন্ত আমি বঙ্কিমচন্দ্রের নাম একবারও উল্লেখ করিনি। ইচ্ছা করেই

করিনি। কালক্রমের হিসাব ঠিক রাখবার জন্য করিনি। যে সব গল্প লেখকের নাম করেছি, ধক্কিমের জন্ম তাঁদের পর। বক্কিমচন্দ্র আমাদের সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ যুক্তিবাদী লেখক। অক্ষয়কুমারকে বলেছি বাংলার সবসেরা র‍্যাডিকাল লেখক, বক্কিমকে বলতে চাই ব,ংলার সবসেরা র‍্যাশনালিস্ট লেখক। তিনি দুটি সূত্র থেকে তাঁর এই দুর্মর র‍্যাশনালিজম বা যুক্তিবাদের প্রেরণা সংগ্রহ করেছিলেন— এক, বাংলার পুরাতন নব্যন্যায়ীদের ক্ষুরধার ন্যায়ানুমোদিত চিন্তা-প্রণালীর উদাহরণ থেকে ; দুই, পাশ্চাত্যের মিল বেন্থাম হার্বার্ট স্পেন্সার প্রভৃতির উপযোগবাদী দর্শন থেকে এবং ফরাসী দার্শনিক অগাস্টাস কোঁত-এর প্রত্যক্ষবাদী দর্শন থেকে। কোঁত এর দর্শন থেকে বক্কিমচন্দ্র এবং বিদ্যাসাগর-শিষ্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ('দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ বচয়িতা) এবং তাঁর জ্যেষ্ঠাগ্রজ রামকমল নাস্তিকতার শিক্ষা পেয়েছিলেন। বক্কিম পবে অবশ্য নাস্তিকতা পরিহার করে এবং শেষ বয়সে উৎকট হিন্দুয়ানির প্রবক্তা হয়ে ওঠেন। কিন্তু এটা ভুললে চলবে না যে, কি সংস্কারমুক্ত মননেব আদর্শ প্রচারে কি 'নবহিন্দুত্বে'ব প্রচারক রূপে প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা পালনকালে তাঁব বক্তব্য প্রকাশের রীতিতে যুক্তিবাদ থেকে তিনি কখনই বিচ্যুতি হননি। অর্থাৎ পরিণত বয়ঃকালীন তাঁর প্রচারিত মতবাদ ভুল হোক শুদ্ধ হোক, তিনি ওই মতবাদেব পরিপোষণ ও প্রচ রে তাঁর চিরাভ্যস্ত যুক্তিকেই তাঁর চিন্তাপবিবেশনেব মুখ্য আয়ুধরূপে ব্যবহার কবে-ছিলেন। 'শ্রীকৃষ্ণচবিত্র' গ্রন্থে মহাভাবতের কৃষ্ণকে আদর্শ চরিত্র রূপে দাঁড কবাতে গিয়ে তিনি একই প্রণালীর অবলম্বন করেন— হিন্দুসমাজের বৃন্দাবনের কৃষ্ণকে নিয়ে ভাবালুতার আতিশয্য ও কুসংস্কারপ্রীতিকে তিনি মোটেই আমল দেননি। অর্থাৎ ভাগবতেব কৃষ্ণ থেকে গীতাকার কৃষ্ণকে বিযুক্ত করে নিয়ে শেষোক্ত জনকে নবজাগ্রত বুর্জোয়া হিন্দু সমাজের কাছে আদর্শ পুরুষ রূপে দাঁড করাতে চেয়েছিলেন। হিন্দু সমাজ অবশ্য বক্কিমেব বাতলানো দাওয়াই গ্রহণ করেননি, আজও ভক্তিগদগদ ভাবের প্রবলতায় পৌরাণিক কৃষ্ণকেই তাঁরা আঁকড়ে ধরে আছেন। আলৌকিকের সংস্কারে আচ্ছন্ন বিশ্বাসপ্রবণ মনকে যুক্তির রাস্তায় আনা কি সহজ কথা ?

একটা জিনিস বিশেষ খেয়াল রাখা দবকার। বক্কিমচন্দ্র যখন উপন্যাস রচনা করেন তখন তিনি অসামান্য সৌন্দর্যস্রষ্টা, কবি, মানব চরিত্রের মর্মজ্ঞ ; আর যখন তিনি প্রবন্ধ রচনা করেন, তখন তিনি ক্ষুরধার যুক্তির পথের পথিক।

তাঁর উপন্যাসের গদ্যে আর প্রবন্ধের গদ্যে মিল নেই। শেষোক্ত ক্ষেত্রে তিনি একান্তভাবেই যুক্তির আশ্রয়ী লেখক। এমনকি 'কমলাকান্তের দপ্তর,' 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত', 'লোকরহস্য' প্রভৃতি আত্মভাবী গোত্রের রম্যরচনাগুলিতেও তাঁর এই যুক্তির চাল সদা উপস্থিত। 'বিবিধ প্রবন্ধে'র গদ্য এবং উত্তরকালে বাতিল 'সাম্য' গ্রন্থের রচনারীতি অসাধারণ যুক্তি-শৃঙ্খলায় বিন্যস্ত ও মনস্বিতায় পূর্ণ। ভাষাও অত্যন্ত সহজবোধ্য, প্রাঞ্জল, ধ্বনির ঘনঘটা বর্জিত। পাণ্ডিত্যের সঙ্গে প্রকাশভঙ্গীর সাবলীলতার এমন মণিকাঞ্চনসংযোগ সহসা চোখে পড়ে না। দুঃখ এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর এই দুর্ধর্ষ মনীষা ও যুক্তিনিষ্ঠা শেষ বয়সে প্রতিক্রিয়ার সেবায় নিয়োজিত করেছিলেন। ইউরোপীয় যুক্তিবিদ্যার প্রভাব ছাপিয়ে শেষের বছরগুলিতে কৌলিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার ফলেই এই বিমর্ষ ঘটনা ঘটেছিল বলে সন্দেহ হয়। তাতে করে বাংলা সাহিত্যের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে সন্দেহ নেই।

বঙ্কিমচন্দ্র শুধু নিজেই প্রবন্ধ সাহিত্যের আশ্রয়ে যুক্তিচর্চা করেননি, তাঁর সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকাকে ঘিরে এক শক্তিশালী শিষ্যমণ্ডলীর মাধ্যমে সমাজে যুক্তির আদর্শ প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন। স্বয়ং প্রেরণা দিয়ে ও নিজে হাতে শিখিয়ে-পড়িয়ে তিনি যে সকল লেখককে তৈরী করে তুলেছিলেন তাঁদের প্রায় সকলেই র‍্যাশনালিস্ট গোত্রের লেখনী চর্চাকারী সাহিত্যিক, এঁদের মধ্যে কেউ কেউ পরবর্তী জীবনে সবিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। যেমন, রমেশচন্দ্র দত্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামদাস সেন, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, লালমোহন বিদ্যানিধি, পূর্ণচন্দ্র বসু, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রমুখ। তাঁরা যে জাতীয় গদ্যের চর্চা করতেন তার ভিতর আলংকারিক বাক্যবিন্যাস শব্দশোভা ধ্বনির আড়ম্বর ইত্যাদি বাহুল্য আভরণের স্থান মোটে ছিলই না বলতে গেলে। উপমা উৎপ্রেক্ষা রূপক, ইত্যাদির ব্যবহারও বিশেষ সীমিত ছিল। যুক্তিই ছিল তাঁদের গদ্যের প্রাণ, যুক্তিই ছিল তাঁদের প্রধান অবলম্বন। এঁদের গদ্যের নমুনা পেতে হলে পুরাতন 'বঙ্গদর্শন'-এর ফাইল খুলতে হবে, অথবা অপেক্ষাকৃত হাতের কাছে যে বইটি আছে ('বঙ্গদর্শন নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ,' ডঃ রবীন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত) তার পাতা নেড়েচেড়ে দেখতে হবে। তাহলেই যা বলতে চাওয়া হচ্ছে তার যথার্থ যাচাই করার সুযোগ হবে।

'বঙ্গদর্শন'-এর পর থেকেই বাংলা সাহিত্যে যুক্তিবাদের ঐতিহ্য ক্রমশঃ ক্ষীয়মাণ হয়ে আসতে থাকলো। এর সাহিত্যগত কারণ ছাড়াও বস্তুগত কারণও বোধহয় কিছু কিছু ছিল। 'এজ অব রীজন' আস্তে আস্তে অস্তমিত হয়ে এলো, দেখা দিল তার জায়গায় গদ্যসাহিত্যে আত্মভাবী প্রবণতার আধিক্য। তথ্যের ও যুক্তির তন্নিষ্ঠ চর্চা অপেক্ষা বড় হয়ে উঠলো প্রবন্ধে ব্যক্তিভাবনার দর্শন। রম্যরচনার ঢল নামলো। কী বলতে হবে তার চেয়ে কেমন করে বলতে হবে সেইটাই হয়ে উঠলো আদৃত কথা। অর্থাৎ কনটেন্ট অপেক্ষা ফর্মই প্রধান বিচার্য বিষয় হয়ে দাঁড়ালো। যেখানে আধেয় অপেক্ষা আধার প্রাধান্য পায়, বক্তব্য অপেক্ষা বলার কায়দাটা অধিক সমাদরের বস্তু হয়ে ওঠে, সেখানে যুক্তিচর্চা মার খাবে, তাতে আর আশ্চর্যের কী আছে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ অসামান্য এক প্রবন্ধলেখক। তবে তাঁর প্রবন্ধের জাত আলাদা। বিষয়বস্তু আলাদা। যুক্তি অপেক্ষা সৌন্দর্য তাঁর অধিকতর অম্বিষ্ট। প্রতিটি রবীন্দ্র-প্রবন্ধ এক-একটি স্বতন্ত্র সৃষ্টি। সৃষ্টির মহিমায় সেগুলিকে কাব্যের কোঠায় ফেললেও ভুল হয় না। উপমায় উৎপ্রেক্ষায় রূপক অলঙ্কারের প্রয়োগে যে-কোন রবীন্দ্র-প্রবন্ধ প্রথম থেকে শেষ অবধি যেন রসে ভরপুর হয়ে আছে। সেগুলির সৃজনীমাধুর্য রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করতে হয়। তারিয়ে তারিয়ে তাদের রচনানৈপুণ্যের স্বাদ চাখতে হয়। প্রবন্ধ বা সমালোচনা যখন স্বয়ং সৃষ্টির পর্যায়ে উন্নীত হয়ে ওঠে তখন আর তা জ্ঞানবাদী সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত থাকে না, তা সৃজনী সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের বেশীরভাগ প্রবন্ধকেই শেষের শ্রেণীতে ফেলা চলে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ, 'প্রাচীন সাহিত্য', 'আধুনিক সাহিত্য', 'পঞ্চভূত', 'বিচিত্র প্রবন্ধ', 'শিক্ষা', 'শান্তিনিকেতন গ্রন্থমালা', 'মানুষের ধর্ম', 'সাহিত্যের পথে' 'ছন্দ', 'বাংলা ভাষা পরিচয়' প্রভৃতি গ্রন্থগুলির অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ সমূহের উল্লেখ করা যেতে পারে। 'কাব্যের উপেক্ষিতা', 'শকুন্তলা', 'মেঘদূত', 'ছেলেভুলানো ছড়া', 'শিক্ষার হেরফের' 'রাজসিংহ', 'পঞ্চভূত'-এর অন্তর্গত যে কোন প্রবন্ধ— এসব রচনার কি কোন তুলনা আছে? কিন্তু সাহিত্য-প্রবন্ধ হিসাবে সেগুলি পরম-আস্বাদ্য হলেও যুক্তিক্রমের দিক দিয়ে সেগুলির মধ্যে ফাঁক আছে। উপমা বস্তুটি অতিশয় মনোরম। কিন্তু তা কখনও যুক্তিবিন্যাসের স্থলাভিষিক্ত হওয়া উচিত নয়। বরং উপমার আতিশয্য বস্তুটিকে কিঞ্চিৎ সন্দেহের চোখে দেখলেই

বোধহয় ঠিক দেখা হয়। কারণ উপমা প্রায়শঃ যুক্তিকে পাশ কাটিয়ে কথার চাতুরীতে মনকে ভোলাবার চেষ্টা করে। উপমা অন্তরকে মুগ্ধ করে কিন্তু মনে প্রতীতি আনে না। বক্তব্যের গ্রাহ্যতা অপেক্ষা বক্তব্যের সৌন্দর্য বিধানেই যেহেতু তার নজর বেশী ব্যস্ত থাকে সেই কারণে তাতে যুক্তি চাপা পড়ে। এই দৃষ্টিতে দেখলে প্রবন্ধ সাহিত্যে উপমার অতিরেক প্রবন্ধের শক্তিমত্তার পরিচায়ক নয়, দুর্বলতার দ্যোতক।

অবশ্য কবির 'কালান্তর'-এর প্রবন্ধগুলিকে এই বিবৃতির আওতায় আনা উচিত নয়। সেগুলির যুক্তি অখণ্ডনীয়; বক্তব্য অতিশয় সারবান। সম্ভবতঃ কবির রাষ্ট্র ও সমাজ চিন্তার বেষ্টনীর মধ্যেই উপমা-উৎপ্রেক্ষা সবচেয়ে কম প্রবেশ করেছে, তাই সেসবের প্রবন্ধধর্মিতা বেশী অক্ষুণ্ণ থেকেছে।

রবীন্দ্রনাথ এক সর্বাতিশায়ী ব্যক্তিত্বের অধীশ্বর লেখক, যতদিন বেঁচে ছিলেন কলোসাসের মত বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্র পরিব্যাপ্ত করেছিলেন। তিনি যেদিকে আমাদের চিন্তা ও কল্পনার দিক নির্দেশ করেছেন, সেদিকেই আমাদের মনের গতি প্রধাবিত হয়েছে। তিনি আমাদের রুচি পছন্দ প্রবণতার নিয়ামক হয়েছেন। সুতরাং আশ্চর্য নয়, তিনি যে দিকে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের মোড় ঘুরিয়েছেন, সেই পথেই বাংলা প্রবন্ধের মোড় ঘুরেছে। রবীন্দ্রোত্তর যুগের বাংলা প্রবন্ধে যুক্তির জোর কমে গেছে, বাচনকুশলতা বাচ্য অপেক্ষা অধিক আদরণীয় বস্তু হয়ে উঠেছে। ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে, যার ইঙ্গিত আমি প্রবন্ধের গোড়াতেই করেছি, কিন্তু ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তে মূল নিয়মের ব্যত্যয় হয় না বরং নিয়ম আরও জোরালো হয়।

আজকের বাংলা গদ্য যত না যুক্তির খাতে তার চেয়ে অনেক গুণ বেশী রম্যতার খাতে প্রবাহিত। 'এজ অব রীজন' এই কালে কথার কথা হয়েই রইলো।

সমাজ পরিবর্তনে সাহিত্যের ভূমিকা

সাহিত্যের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তন সম্ভব কিনা এই নিয়ে সাহিত্যশাস্ত্রীদের মধ্যে মতভেদ আছে। যাঁরা সাহিত্যকে শুধুমাত্র আনন্দের লীলা বলে মনে করেন এবং রসই তার প্রাণ বলে নির্দেশ করেন, তাঁদের চোখে সাহিত্য আর সমাজের সম্পর্ক আবশ্যিক বা অচ্ছেদ্য নয়। কবি তাঁর কাব্য সৃষ্টি করবেন আপন প্রাণের দুর্নিবার আত্মপ্রকাশের তাগিদে, ছন্দে ও ভাষায় নতুন কিছু একটা নির্মাণ করে তোলার আনন্দ এবং ওই আনন্দকে অপরের প্রাণে সঞ্চারিত করবার আকূতি— এই তাঁর সৃষ্টিকার্যের মূলে। কবির এই সৃষ্টিলীলা থেকে যদি সমাজ উপকৃত হয় তো ভালো, ওই লাভটাকে উপরি পাওনা হিসেবে গণ্য করতে হবে ; উপকৃত না হলেও ক্ষতি নেই তার কারণ স্রষ্টা তাঁর আপন সৃষ্টির আনন্দেই ভরপুর, তাঁর সৃষ্টির পরিণামে সমাজের ভালো হলো কি মন্দ হলো তা-ই নিয়ে তাঁর মাথাব্যথা নেই। দেখতে হবে যা রচনা করা হয়েছে তা যথার্থ সৃষ্টির লক্ষণে ভূষিত হয়েছে কিনা, আমাদের প্রাচীন আলংকারিকদের পরিভাষা অনুযায়ী 'রস' হয়ে উঠেছে কিনা ; এই মানদণ্ডের পরীক্ষায় যদি কোনো রচনা উতরে যায় তবে আর কিছু দেখবার প্রয়োজন নেই। রসোত্তীর্ণ হওয়াটাই যে-কোনো সাহিত্য সৃষ্টির পক্ষে আদত কথা।

স্পষ্টতই এই দৃষ্টিভঙ্গী নন্দনবাদী, ব্যক্তিকেন্দ্রিক, রসতত্ত্বাশ্রয়ী। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে সৃষ্টিকে লীলার পর্যায়ে তোলা হয়েছে এবং ওই লীলার মধ্যে একটা রহস্যের বোধ আমদানী করা হয়েছে। কবি যেন উপলক্ষ্য বা নিমিত্ত মাত্র, তাঁকে দিয়ে তাঁর বিধাতা যে খেলা খেলাচ্ছেন তিনি তাই খেলছেন এই রকমের একটা দৈবানুগ্রহবাদের ধারণা এর ভিতর অনুস্যূত রয়েছে। সাহিত্যসৃষ্টি একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য প্রণোদিত সচেতন কর্ম— এই ধারণা অপেক্ষা এই দৃষ্টিভঙ্গীতে অচেতন বা অর্ধসজ্ঞান নিয়তির ধারণাটাই প্রবল।

দেখা যায় আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত আলংকারিকেরা কম বেশী সাহিত্যের এই লীলাবাদী বা নিয়তিবাদী আদর্শের অনুবর্তী ছিলেন। রস তাঁদের মন কেড়ে নিয়েছে, তাঁদের বিচারে সমাজহিত সাহিত্য বা কাব্যসৃষ্টির গৌণ ফল মাত্র, বা আদৌ কোনো ফল নয়। সমাজের ভালো করবার মনোভাব নিয়ে কেউ

কাব্য সৃষ্টি করেন না, করা উচিত নয় ; কাব্যটি যথার্থ সৃষ্টিলক্ষণাক্রান্ত হয়েছে কিনা সেইটাই আসল বিচার্য। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রীদের সাধনার ধারা বেয়ে এই কালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ মনে হয় সাহিত্যের এই রসবাদী লীলাবাদী আদর্শকে সবচেয়ে বেশী সমর্থন দান করেছেন। কবি তাঁর সাহিত্য সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলীতে এই ধারণাটিকে নানাভাবে বিস্তার করেছেন। দু'একটি প্রতি-নিধিত্বমূলক উদ্ধৃতি দিলেই এ বিষয়ে কবির চিন্তাধারার আদর্শ বোঝা যাবে। কবি লিখেছেন— "আনন্দ দেওয়া ছাড়া সাহিত্যের আর কোনো উদ্দেশ্য আছে বলে জানিনে।" অন্যত্র লিখেছেন— "আনন্দ যে রূপ ধরেছে এই তো হল রস। বিশ্বে এমন কোনো বস্তু নেই যার মধ্যে রস স্পর্শ নেই। আর সাহিত্যের এই রস অপ্রয়োজনীয় অহেতুক। রস পদার্থবস্তুর অতীত এমন একটি ঐক্যবোধ যা আমাদের অন্তরে মিলিত হতে বিলম্ব করে না।"

রসবাদী সাহিত্যের এই আদর্শ স্পষ্টতই রোমান্টিক সংস্কারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠরূপে যুক্ত। রোমান্টিক কাব্যসাহিত্যের সৌন্দর্যবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও কম-বেশী অস্বচ্ছ প্রকাশভঙ্গী স্বতই রোমান্টিক সংস্কারকে রস ও লীলার সংস্কারের সগোত্র করে তুলেছে। এ কথা যে কথার কথা নয় তা বাংলা কাব্য সাহিত্যের ঐতিহ্যের দিকে এক নজর তাকালেই বোঝা যায়। পুরাতন বৈষ্ণব কাব্যকারদের সুসমৃদ্ধ দৃষ্টান্ত বাদই দিলাম, একালের পরিধিতে এসেও দেখতে পাই বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে হালের রবীন্দ্রানুসারী কবি মাত্র অল্প-বিস্তর রোমান্টিক এবং সেই কারণে রসবাদীও বটেন। আত্মমগ্নতা ও ব্যক্তিসাক্ষিকতা এঁদের রচনার দুটি প্রধান লক্ষণ। অপর পক্ষে মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি মঙ্গল-কাব্যকারগণ, এবং ইংরেজ অভ্যুদয়ের পরবর্তী ঈশ্বর গুপ্ত, রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীন সেন প্রমুখ ধ্রুপদী ধারার কবিগণ পূর্বোক্ত রোমান্টিক সংস্কারের বিপরীত কোটির স্রষ্টা। তাঁরা ঠিক সমাজহিতের জন্য তাঁদের লেখনী ধারণ না করলেও এ বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই যে, তাঁদের দৃষ্টি রোমান্টিক কবিকুলের মতো আত্মমগ্ন নয় বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয় বরং বেশ কিছু পরিমাণে বহিমুখ ও সমাজসচেতন। মরমীবাদ কিংবা অতীন্দ্রিয়তার ধারণা এঁদের কাব্যসৃষ্টিকে অকারণে অস্বচ্ছ করে তোলেনি, উল্টো লক্ষণগুলিই বরং এঁদের কাব্যে সমধিক বলবৎ দেখতে পাই— যেমন, বস্তুনিষ্ঠা, ইহমুখীনতা, ইতিহাস চেতনা ইত্যাদি। তদুপরি এঁদের কাব্যের প্রকাশভঙ্গী দৃষ্টিগ্রাহ্যরূপে কুয়াসাবর্জিত, সুঠাম, পরিচ্ছন্ন।

সাহিত্যের অনুষঙ্গে প্রকাশভঙ্গীর এই পরিচ্ছন্ন রূপের যথেষ্ট মূল্য আছে। এবং আধুনিক বাংলা কাব্যে এই পরিচ্ছন্ন রূপের যতো বেশী চর্চা হয় ততোই মঙ্গল। কাব্যের রস বা লীলাবাদী ধারণা অনেক সময় ওই দুটি নামের আবরণে স্বেচ্ছাচারের অনুকূলে ছাড়পত্র সংগ্রহের চেষ্টা মাত্র। শক্তিমানদের পক্ষে যে জিনিস শোভা পায়, অক্ষম অনুকারকদের বেলায় বলাই বাহুল্য, সে জিনিস শোভা পাওয়া উচিত নয়। রবীন্দ্রনাথ রসবাদী ছিলেন, লীলাবাদী ছিলেন, রোমান্টিক ছিলেন— এই যুক্তিতে যে কোনো রূপ অমিতাচারকে ওই তিনটি নামের তকমা এঁটে সৎসৃষ্টি বলে চালাবার চেষ্টা প্রতিরুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। রসসৃষ্টির অজুহাতে নৈরাজ্য সৃষ্টির অধিকার কারও নেই।

ধ্রুপদী কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তকে রোমান্টিক কবি বলে অভিহিত করবার একটা প্রবণতা আমাদের সমালোচকদের মধ্যে খুব প্রবল। মধুসূদন ভালো বাংলা জানতেন এটা বাংলা সাহিত্যের একটা দুর্মর কুসংস্কার কিনা জানি না, তবে এই যে মধুসূদনকে সব ছাড়িয়ে রোমান্টিক বলে অভিহিত করবার চেষ্টা, এটাকে বাংলা সাহিত্যের দুর্মর কুসংস্কারগুলির অন্যতম রূপে গণ্য করা যেতে পারে। মধুসূদনের মেঘনাদ বধ কাব্যের স্থানবিশেষ কিংবা ব্রজাঙ্গনা কাব্য রোমান্টিক বলে মনে হতে পারে কিন্তু মধুসূদনের কাব্যের সেটি প্রধান গুণ নয়। মধুসূদনের প্রধান গুণ তাঁর ওজস্বিতা, তাঁর কল্পনার পরিচ্ছন্নতা ও স্পষ্টতা, তাঁর অ-মরমীসুলভ বহির্মুখীনতা ও বস্তুতান্ত্রিকতা। পণ্ডিচেরী-খ্যাত প্রয়াত নলিনীকান্ত গুপ্ত তাঁর 'সাহিত্যিকা' বইতে মধুসূদনের প্রতিভাকে দার্ঢ্য ও বীর্যমণ্ডিত রোমক প্রতিভার স্বগোত্র বলেছেন। এইটেই মধুসূদনের খাঁটি বিশ্লেষণ। ধ্রুপদী কবিদের কেউই মরমী কিংবা অতীন্দ্রিয় কবি নন— এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাঁদের কাব্য মৃত্তিকার সঙ্গে সংলগ্ন, চারপাশের মানুষের সঙ্গে সহানুভূতির যোগে যুক্ত। অতিরিক্ত অন্তর্নিবেশের অভ্যাস মানুষকে আত্মকেন্দ্রিক আর পরিপার্শ্ব-অচেতন করে তোলে। ধ্রুপদী কবিরা আত্মকেন্দ্রিকতার অভিশাপ থেকে মুক্ত।

এতক্ষণ যে সব কথা বলা হল তার থেকে এই আলোচকের প্রবণতা কোন দিকে তার একটা আন্দাজ নিশ্চয়ই পাওয়া গেছে। আমার বক্তব্য হল, যে সব সাহিত্যিক বা কবি রোমান্টিকতার অভ্যাস অর্থাৎ আত্মমগ্নতার অভ্যাস থেকে কম বা বেশী পরিমাণে মুক্ত, বহির্মুখী চেতনাসম্পন্ন, সাহিত্যে রস বা লীলার

ধারণার দ্বারা চালিত নন, পরন্তু সাহিত্যের উদ্দেশ্যমূলক সচেতন চেষ্টায় বিশ্বাসবান, দেশ ও সমাজ তাঁদের কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করে। দেশ ও সমাজ তাঁদের কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করে এইজন্য যে, দেশবাসী মনে করে তাঁদের সৃষ্টিপ্রকরণের দ্বারা বাঞ্ছিত পথে সমাজের পরিবর্তন সম্ভব। সাহিত্য মৃণালভুকদের শিথিল আরাম-বিলাসের বিহারক্ষেত্র নয়, নির্বিচার আমোদ-প্রমোদের উপচার যোগানো তার কাজ নয়; সমাজ-পরিবর্তনের সূক্ষ্ম কিন্তু ফলপ্রদ উপায় রূপে সাহিত্যের ব্যবহার হলে তবেই তার যথাযোগ্য সার্থকতার ভূমিকা রচিত হয়। বস্তুতঃ সাহিত্যের এই ভূমিকাই প্রত্যাশিত এবং এই ভূমিকা পালনের তার নিঃসংশয় যোগ্যতা আছে। মানুষের মনকে জাগ্রত করার, অনুপ্রাণিত করার এবং পরিবর্তিত করার পক্ষে সাহিত্যের চেয়ে বড়ো হাতিয়ার আর কিছু নেই। এবং এই জাগ্রত, উদ্বুদ্ধ আর পরিবর্তিত করার কাজটি সেই সাহিত্যের মাধ্যমেই সবচেয়ে সুষ্ঠুভাবে নিষ্পন্ন হওয়া সম্ভব, যে সাহিত্য আত্মকেন্দ্রিক নয়, লীলাবাদী নয়, অব্যাহতিবাদী নয়; পরন্তু সমাজ-সচেতন এবং চিত্তের বহির্মুখী টানে মাটি ও মানুষের সঙ্গে গভীর আত্মীয়তার যোগে যুক্ত। সমাজহিতের লক্ষ্য বাদ দিয়ে সাহিত্যের নিছক আত্মপরায়ণ হওয়ার কোনো অর্থ হয় না।

আমাদের সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন সাহিত্য ও সমাজের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের ধারণার শ্রেষ্ঠ উদ্গাতা। তিনিই প্রথম তাঁর প্রসিদ্ধ "লেখকদের প্রতি নিবেদন" শীর্ষক নির্দেশনামায় সুস্পষ্টরূপে ঘোষণা করেন যে, যে-রচনার দ্বারা দেশ বা সমাজের হিত হবে না, তেমন রচনা থেকে লেখকের প্রতিনিবৃত্ত থাকা উচিত। এমন জোরের সঙ্গে সাহিত্যের লীলাবাদী ধারণার বিরুদ্ধে আঘাত বঙ্কিমচন্দ্রের আগে কেউ করেননি, পরেও কেউ করেছেন বলে মনে হয় না। বলা যেতে পারে বিশ্বাসের এই ক্ষেত্রে অন্ততঃ বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ দুই বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে আছেন। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যসৃষ্টিকে অহেতুক আনন্দের লীলা বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, "বিশুদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে উদ্দেশ্য বলিয়া যাহা হাতে ঠেকে তাহা আনুষঙ্গিক। এবং তাহা ক্ষণস্থায়ী, যাহার উদ্দেশ্য আছে তাহার অন্য নাম— সাহিত্যের উদ্দেশ্য নাই।" বলা অনাবশ্যক বঙ্কিমের পূর্বোদ্ধৃত মত এই মতের সম্পূর্ণ প্রতিকূল। বঙ্কিমচন্দ্রের তীক্ষ্ণ সমাজচেতন দৃষ্টিতে সাহিত্যের উদ্দেশ্যহীনতা আর সাহিত্যের নিরর্থকতা একই কথার রকমফের মাত্র। বঙ্কিমচন্দ্র

সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সংস্কৃত আলংকারিকদের মতামতের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি তাঁদের রসবাদী আদর্শ গ্রহণ করেননি। বরং ইউরোপীয় হিতবাদী আর প্রত্যক্ষবাদ কর্ষিত তাঁর মন সাহিত্য আর সমাজের পরস্পর-নির্ভরতার ধারণাটিকেই আঁকড়ে ধরেছিল। উপযোগবাদ ও প্রত্যক্ষবাদ বিদেশী মতাদর্শ বলে তিনি তাদের বর্জন করার কোনো কারণ খুঁজে পাননি, কেননা সত্যের কোনো জাত-গোত্র নেই। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রখর মনস্বিতার দ্বারা বুঝেছিলেন, সংস্কৃত আলংকারিকদেব রসবাদী তথা লীলাবাদী আদর্শ বর্তমান যুগে অচল। যে যুগে সমাজের গতি ছিল মন্থর আর জীবনযাত্রা ছিল কম-বেশী সহজ, সেকালের পক্ষে সংস্কৃত আলংকারিকদের লীলাবাদের বেশ কিছুটা সার্থকতা ছিল, কিন্তু সেই যুগ অনেক কাল হারিয়ে গেছে। এখন নতুন কালের প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন শিল্পদর্শনের উদ্ভাবন করতে হবে। আমাদের সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র সেই আকাঙ্ক্ষিত কাজটি করে গেছেন ; তিনি সমাজকে সাহিত্যের সঙ্গে এক সঙ্গে বেঁধে দিয়ে গেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র যে কতো বড়ো সাহসী চিন্তানেতা ছিলেন তা তাঁর এই পেছুটানবর্জিত চিন্তার স্বাতন্ত্র্য থেকেই অনুমান করা যায়।

অনেকে বঙ্কিম-সাহিত্যকে didactic, নীতিমূলক, উদ্দেশ্যচালিত ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে তার অপকর্ষ ঘটাতে চান। যেন বঙ্কিম সাহিত্যের মাধ্যমে সমাজ-হিতের আদর্শ প্রচার করে একটা মহা অপরাধের কাজ করে গেছেন। এ সবই ধরতাই বুলির উদ্‌গিরণ এবং সাহিত্যের বস্তা-পচা পুরনো মতের অনুবৃত্তি মাত্র। এ সব অভিযোগের ভিতর লীলাবাদের সেই চিরাভ্যস্ত একঘেয়ে সুর আবিষ্কার করা কঠিন নয়। বঙ্কিমচন্দ্র যদি তাঁর উপন্যাসাদিতে নীতিবাদ প্রচার করেই থাকেন তাতে আমরা বিশেষ কিছু দোষ দেখি না, কেননা বঙ্কিম একই কালে একজন শ্রেষ্ঠ পর্যায়ের সৌন্দর্যস্রষ্টা। সব্যসাচীর ন্যায় তিনি সৌন্দর্য ও সমাজকল্যাণ যুগপৎ পরিবেশন করেছেন। তিনি সৌন্দর্য বিতরণেই তৃপ্ত থাকেননি, কোন্ পথে দেশ ও সমাজের হিত হতে পারে তারও গতি নির্দেশ করেছেন। বঙ্কিমকে কবি-সমালোচক মোহিতলাল বলেছেন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত বক্তৃতা দ্রষ্টব্য।) যদিও আমরা জানি বঙ্কিমচন্দ্র জীবনে সামান্যই কবিতা লিখেছেন। যথার্থ কবির দৃষ্টিতে সুন্দর ও শিব একই সঙ্গে প্রতিভাত হয়। মোহিতলাল সেই

অর্থেই বাংলার শ্রেষ্ঠ গদ্যশিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিরূপে অভিনন্দিত করেছেন।

মোহিতলালের নিজস্ব সাহিত্যাদর্শ ছিল মিশ্র। মনে হয় তিনি বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যবর্তী কোনো এক মতকে অবলম্বন করেছিলেন সাহিত্যের বেলায়। কখনও তাঁর রচনায় লীলাবাদী মতের প্রকাশ দেখতে পাই, কখনও পাই সমাজহিতের ধারণার। মোহিতলাল যখন কাব্যসমালোচনায় নিযুক্ত তখন তাঁকে রসের প্রবক্তা বলেই মনে হয়; আবার যখন এই মৌলিকগুণসম্পন্ন নির্ভীক সমালোচক বাংলা ও বাঙালী সমাজের স্বরূপলক্ষণ নির্ণয় ও ভবিষ্যৎ রূপ নির্দেশ করতে বসেন, তখন আর তাঁর রসবাদী সত্তাকে পাই না, পাই তাঁর সমাজসচেতন হিতবাদী রূপটিকে। এই ক্ষেত্রে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সার্থক উত্তর-সাধক। মোহিতলালের সকল সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হওয়ার উপায় নেই, তাঁর কোনো কোনো বিচার যে গোঁড়ামি ও মতান্ধতাপ্রসূত সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই; কিন্তু সাহিত্য যে শিশুর হাতের ঝুমঝুমি খেলনা-বাঁশী নয়, তা শক্তিমানের করধৃত এক শক্তিধর অস্ত্র— এ কথা তাঁর মতো প্রত্যয়সিদ্ধ বলিষ্ঠ কণ্ঠে আর কে বলতে পেরেছেন?

মোহিতলাল বিভক্ত ব্যক্তিত্বের শিকার ছিলেন বলে আমার ধারণা। তাঁর কবিসত্তায় আর সমালোচক সত্তায় মিশ খায়নি। কবিত্বের ক্ষেত্রে তিনি রসবাদী, সমালোচনার ক্ষেত্রে সমাজবাদী।

এইবার আমার আলোচনার মূল প্রতিবাদ্যে আসি। বর্তমানের পচা-গলা কলুষক্লিন্ন সমাজ-কাঠামোর আমূল রূপান্তর যদি আমাদের কাম্য হয় এবং তার জায়গায় সুন্দর এক সমসমাজ যদি আমরা গড়ে তুলতে চাই, তাহলে সাহিত্য ও শিল্প-সংস্কৃতিকেই সেই সমাজ পরিবর্তনের প্রধান হাতিয়ার রূপে আমাদের প্রয়োগ করতে হবে। রাজনীতি নয় সমাজসেবার তাৎক্ষণিক উপকারের জোড়াতোড়া নয়, গতানুগতিক শিক্ষার ধারায় বিদ্যাদানের চেষ্টা নয়; সমাজের একেবারে গোড়া ধরে টান দিতে হবে এবং তা করতে গেলে সাহিত্যকেই সে কাজের মূল অবলম্বন করতে হবে। পূর্বেই বলেছি ঘুম পাড়ানো মনকে জাগিয়ে তোলা এবং জাগ্রত মনকে সক্রিয় করে তোলা সাহিত্যের লক্ষ্য। একের অনুভব, চিন্তা ও কল্পনাকে সহস্রের মধ্যে সার্থকভাবে সঞ্চারিত করতে পারাটা ওই চৈতন্য সম্পাদন আর প্রাণের উজ্জীবনের প্রক্রিয়া। সাহিত্য এই মহৎ লক্ষ্য

সাধনে নিয়োজিত হোক। তা যেন আর শুধুই ব্যক্তিকেন্দ্রিক সৌন্দর্যচর্চা আর আনন্দসন্ধানে ব্যস্ত না থাকে, তার সঙ্গে কল্যাণের ধারণা যেন যুক্ত হয়, শিব যেন সুন্দরের পাশাপাশি হাত-ধরাধরি করে চলে। আত্মগত শিল্পসাধনার আয়তনের উপর আরও একটি তল যোগ হোক— তাতে সমূহের স্থান-সংকুলান হওয়া চাই। ব্যষ্টি ও সমষ্টি— এই দুইয়ে মিলে সাহিত্যের বৃত্ত সুবলয়িত আর পূর্ণাঙ্গ হোক।

এইটে যদি বাস্তবিক আমাদের আন্তরিক কামনা হয় তা হলে সবিনয়ে বলব, সাহিত্যের তথাকথিত আনন্দবাদী লীলাবাদী রসবাদী ধারণার মোহ আমাদের বিসর্জন দিতে হবে এবং তার বদলে অভিষেক করে আনতে হবে সমাজ-সচেতন উদ্দেশ্যমূলক শিল্পসৃষ্টির আদর্শকে। 'আর্ট ফর আর্টস সেক', 'আর্ট ফর মাই সেক' জাতীয় কলাকৈবল্যবাদী দর্শনের আয়ু ফুরিয়ে এসেছে; তার জায়গায় নতুন শিল্পদর্শন জন্ম নিক— 'আর্ট ফর হিউম্যানিটিস সেক'। মানবকল্যাণে শিল্প উৎসর্গীকৃত হোক।

এবং এই বক্তব্যের সূত্র ধরে আরও একটি কথা যা স্বতই এসে পড়ে তা হল: বাংলা সাহিত্যের বিষয় নির্বাচনসংক্রান্ত দৃষ্টিকোণ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হওয়া দরকার। এ যাবৎ আমাদের লেখকেরা তথাকথিত সুকুমার বা রম্য সাহিত্যের উপরেই বেশী পক্ষপাত দেখিয়ে এসেছেন। কবিতা উপন্যাস গল্প নাটক ভ্রমণ কাহিনী জাতীয় রচনাসম্ভারের আধিক্যে বাংলা সাহিত্য ছয়লাপ বললেও চলে। অথচ সেই তুলনায় দর্শন বিজ্ঞান অর্থনীতি ইতিহাস রাষ্ট্রবিজ্ঞান নৃতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনার একান্তই অভাব। এ সকল বিষয়ে সম্বৎসরে যে বই বেরয় তার সংখ্যা খুবই নগণ্য। এদিকে গল্পোপন্যাস কাব্য-নাট্যের প্রয়োজনাতিরিক্ত ছড়াছড়ি। যেন সৃষ্টিশীলতা শুধু এগুলিরই একচেটিয়া, সাহিত্যের অন্য শাখায় সৃষ্টিশীলতা থাকতে পারে না।

বাংলা সাহিত্যকে যদি সাবালক হতে হয়, পূর্ণায়তন সাহিত্যের মর্যাদা পেতে হয়, তা হলে তার পক্ষে এই আত্যন্তিকমাত্রিক রম্যসাহিত্য নির্ভরতা কাটিয়ে উঠতে হবে। মানুষ তো শুধু কল্পনাতেই বাঁচে না, তার পায়ের তলায় শক্ত মাটির আশ্রয়ও চাই। তরল খাদ্য আর নিরেট খাদ্য দুই রকমের খাদ্যই মানুষের দেহপুষ্টির জন্য আবশ্যক। কল্পনাশ্রিত সাহিত্য আর জ্ঞানবাদী সাহিত্য দুই-ই আমাদের সমপরিমাণে চাই। একটির স্বল্পতার পিঠে অপরটির আধিক্য ঘটলে

অগ্রগতির ছন্দে তাল কেটে যেতে বাধ্য। বাংলা সাহিত্য এ যাবৎ শুধু কল্পনার পাখায় ভর করে শূন্যে ভেসে বেড়িয়েছে, মাটিতে তার পা পড়েনি। আর মাটিতে পা পড়েনি বলে আশেপাশের মানুষের প্রতি তার তেমন করে চোখও পড়েনি। আকাশবিহার যথেষ্ট হয়েছে, আত্মলীন শূন্যচারিতার অভ্যাস ঘুচিয়ে এবারে বহু মানুষের কোলাহল মুখরিত সচল জীবনপ্রবাহ মথিত মর্ত্ত্য সংসারের প্রাঙ্গণে প্রত্যাবর্তনের পালা। এই প্রত্যাবর্তনের মধ্যে সমাজ ও সাহিত্যের মেলবন্ধন নিষ্পন্ন হোক।

শিল্প সাহিত্যের সামাজিক ফলাফল

শিল্প ও সাহিত্যের সামাজিক ফলাফল বলতে বোঝায় পাঠকমনের উপর শিল্পসৃষ্টির সম্ভাবিত প্রতিক্রিয়া এবং পাঠকের মাধ্যমে সেই প্রতিক্রিয়া সমাজের ভিতর ছড়িয়ে পড়া। এই প্রতিক্রিয়া ভালও হতে পারে আবার মন্দও হতে পারে। ভাল হলে সমাজের উপর সুফল দর্শায়, মন্দ হলে কুফল। শিল্পী বা সাহিত্যিক যখন কোন একটা বস্তু সৃষ্টি করেন তখন সেটা আর তাঁর ব্যক্তিগত স্তরে সীমাবদ্ধ থাকে না, তা হয়ে ওঠে গোটা সমাজের সম্পদ। ব্যক্তিগত সম্পত্তি তখন সমষ্টিগত সম্পত্তিতে পর্যবসিত হয়। কিন্তু সমষ্টিগত সম্পত্তিটি ভাল ফল দেবে কি মন্দ ফল দেবে তা কিন্তু নির্ভর করে যিনি ওই সম্পত্তি সৃষ্টি করেছেন তাঁর ব্যক্তিত্বের বিশেষ ধাঁচ-ধরনের উপর। তিনি কী জাতীয় মানুষ, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী কী রকম, তিনি সদুদ্দেশ্যযুক্ত কিনা, তিনি মানব-কল্যাণ বোধে উদ্বুদ্ধ কিনা, তিনি রক্ষণশীল অথবা প্রগতিশীল— এ সমস্ত বিবিধ বিষয় হিসাবের মধ্যে গণনা করা দরকার। তবেই বোঝা যেতে পারে তাঁর সৃষ্ট শিল্পবস্তু সমাজের উপর সুফল অথবা কুফল দর্শাবে। প্রথমে পাঠকগণের উপর সুফল অথবা কুফল দর্শায়, তারপর ওই সুফল অথবা কুফল বিস্তৃততর ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হয়, অর্থাৎ সমাজদেহে বিস্তৃত হয়।

শিল্পসৃষ্টির ভাল বা মন্দ করবার ক্ষমতা অপরিসীম এ একটা পরীক্ষিত অভিজ্ঞতা। বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাস থেকে এর ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে। শিল্পের জগতেও এ কথার সত্যতার নজীর বড় কম নয়। টলস্টয় তাঁর 'হোয়াট ইজ আর্ট' বইতে যে বস্তুকে শিল্পের 'ইনফেকশন' বা সংক্রমণ-ক্ষমতা বলেছেন তা আর্টের এই ভাল বা মন্দ করবার ক্ষমতা। এই মানদণ্ডে ফরাসী সাহিত্যের একাধিক সুবিদিত গল্প-উপন্যাস-কবিতা-নাটক, জার্মান সংগীত, বিশেষ করে বীটোভেনের কতিপয় প্রসিদ্ধ সোনাটা, শেক্‌সপীয়রের কোন কোন প্রসিদ্ধ নাট্য সৃষ্টি সংক্রমণ-ক্ষমতার দিক দিয়ে মানুষের হিত অপেক্ষা অহিত বেশী সাধন করেছে বলে টলস্টয়ের ধারণা। অবশ্য টলস্টয়ের মতামত একান্তভাবেই তাঁর নিজস্ব, সে মত স্বীকার করা বা না করা যাঁর যাঁর ব্যক্তিগত রুচি-পছন্দের উপর নির্ভর করে। তবে এটা যে একটা বিশিষ্ট শৈল্পিক দৃষ্টিকোণ এবং তার একটা

অনন্যতা রয়েছে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ করা চলে না। ইনফেকশন বা সংক্রমণের ক্ষমতা কীভাবে মানুষের মনের উপর কাজ করে, সাহিত্যের জগৎ থেকে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

কয়েকটি উদাহরণ

জার্মান সাহিত্যের ইতিহাসের ছাত্রমাত্রেই জানেন যে গ্যেটের স্রষ্টা জীবনের দুটি ভাগ। জীবনের প্রথম ভাগে তিনি ইউরোপ খণ্ডের রোমান্টিক আন্দোলনের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং ওই প্রভাবের ফলে কতিপয় কাব্য নাটক ও উপন্যাস রচনা করে জার্মান পাঠক সমাজকে উপহার দিয়েছিলেন। কিন্তু জার্মান জাতির উপর এই সব রচনার প্রভাব শুভকর হয়নি। জার্মান তরুণ মানুষের উপর এই রোমান্টিক আন্দোলনের ক্ষতিকর প্রভাব তিনি পরে উপলব্ধি করতে পারেন এবং সেই উপলব্ধিরই ফলশ্রুতি হিসেবে পরিণত জীবনে রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিহার করে ক্লাসিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেন। গ্যেটের বিশ্ববিশ্রুত কাব্যনাট্য 'ফাউস্ট' তাঁর ক্লাসিক পর্যায়ের শিল্পসৃষ্টিগুলির অন্যতম। এর অন্তর্নিহিত ভাবধারা জার্মান জাতীয় চরিত্রের মানোন্নয়নে ও উচ্চ আদর্শের উদ্বর্তনে প্রভূত সহায়তা করেছিল।

রোমান্টিক পর্বে গ্যেটে 'তরুণ বার্থারের দুঃখ' নামে একটি প্রবল ভাবাবেগময় অনুভব-উদ্বেল উপন্যাস রচনা করেছিলেন। জার্মান তরুণ সম্প্রদায়ের উপর এই উপন্যাসের প্রভাব মোটেই সুখকর হয়নি। এই উপন্যাসের ঘটনাবৃত্ত এবং চরিত্রসৃষ্টি পাঠকমনের উপর এমন একটা গভীর হতাশার ভাব জাগিয়ে তুলেছিল যে, বহুসংখ্যক তরুণ এই উপন্যাস পড়ে নৈরাশ্যের পীড়ায় আক্রান্ত হয় ও বেঁচে থাকার সার্থকতা সম্বন্ধেই সন্দিহান হয়ে ওঠে। তাদের অনেকে এতটাই মরিয়া হয়ে ওঠে যে, শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করে জীবনের জ্বালা জুড়োয়। বার্থারের দৃষ্টান্তে তারা আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্ম-নিমজ্জনে। শিল্পসৃষ্টি তার ভাবাবেগের উত্তেজনা পাঠকমনে সংক্রামিত করে কীভাবে পাঠককে বিপথে চালিত করে গ্যেটের 'তরুণ বার্থারের দুঃখ' বইটি তার একটি মোক্ষম দৃষ্টান্ত।

আমাদের সাহিত্যে ঠিক এর তুলনীয় দৃষ্টান্ত না হলেও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর পরিসরে কাছাকাছি দৃষ্টান্ত রয়েছে। প্রেমে ব্যর্থ হলেই জীবনের উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলতে হবে এবং নেশাভাঙ ও আরও দু একটি মারাত্মক ব্যসনে লিপ্ত হয়ে

জীবনকে উড়িয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে হবে এমন কোন কথা নেই। অথচ দেখা যায় শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' উপন্যাস প্রকাশিত হবার পর এমন একটা সময় গেছে যখন একাধিক যুবক শুধুমাত্র এই বইটি পড়ার ফলে বিপথগামী হবার তাগিদ অনুভব করেছে এবং সত্যিসত্যি বিপথগামী হয়েছে। উপন্যাসের তরুণ নায়ক দেবদাস ভালবাসার পাত্রী প্রতিবেশী-কন্যা পার্বতীকে না পেয়ে ব্যর্থতায় হতাশায় মদ ধরলো ও বাঁচবার উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলি দিয়ে কলকাতার পতিতালয়ে রাত কাটিয়ে দিতে লাগলো। শরৎচন্দ্র বাস্তব জীবনের উদাহরণ থেকেই হয়তো এই দৃষ্টান্ত গ্রহণ করেছিলেন এবং বাস্তব জীবনে এমনতর ঘটনা সর্বদা না হলেও মাঝে মাঝে ঘটে সে কথাও মিছে নয়। শরৎচন্দ্রের উদ্দেশ্যও ছিল সদভিপ্রায় যুক্ত। তার প্রমাণ দেবদাস উপন্যাসের উপসংহার অংশের সবশেষের এই কথা কয়টি "তোমরা যে-কেহ এ কাহিনী পড়িবে, হয়ত আমাদেরই মত দুঃখ পাইবে। তবু যদি কখনও দেবদাসের মত এমন হতভাগ্য, অসংযমী পাপিষ্ঠের সহিত পরিচয় ঘটে, তাহার জন্য একটু প্রার্থনা করিও। প্রার্থনা করিও, আর যাহাই হোক, যেন তাহার মত এমন করিয়া কাহারও মৃত্যু না ঘটে।"

এই অংশের সহানুভূতির আন্তরিকতায় সংশয় প্রকাশের কোন কারণই থাকতে পারে না। সমগ্র উপন্যাসটি পাঠ করলে দেবদাসের বিড়ম্বিত জীবনের এই শোচনীয় পরিণামে চক্ষু আপনা থেকেই সমবেদনায় আর্দ্র হয়ে ওঠে। বিশেষতঃ তরুণ মনের উপর এর প্রভাব গভীরভাবে অঙ্কিত না হয়েই যায় না। কিন্তু দেখা যায় অনেক সময় লেখকের সদভিপ্রায়কে মান্য না করে পাঠকের মন ভিন্ন পথে প্রধাবিত হয়। লেখকের অনভিপ্রেত বস্তু পাঠকের একাংশের অভিপ্রেত বস্তু হয়ে ওঠে। দেবদাস উপন্যাস পাঠের প্রতিক্রিয়ায় বিশ ও তিরিশ দশকের বাঙালী যুবসম্প্রদায়ের একাংশ রোমান্টিক হতাশা রোগের শিকার হন এবং ভুল করে ভেবে বসেন কোনও কাঙ্ক্ষিতা তরুণীর মন না পেলেই কুক্রিয়া-সক্তির পথে জীবনকে উড়িয়ে-পুড়িয়ে খাক করে দেবার অধিকার জন্মায়। এই চিন্তাবিভ্রম যে কত যুবকের সর্বনাশ ঘটিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

আমি টলস্টয়ের কথা বলেছি। টলস্টয়েরই সমসাময়িক আর একজন প্রসিদ্ধ-রুশ সাহিত্যিক ডস্টয়েভ্স্কি। ডস্টয়েভ্স্কি একজন উঁচুদরের আর্টিস্ট। তাঁর শিল্পদৃষ্টি অন্তর্ভেদী এবং মানুষের দ্বৈত সত্তার জটিলতার অতলশায়ী গহনে দৃষ্টি সঞ্চালিত করে প্রকৃত মানুষটিকে উন্মোচিত করার কৃতিত্বে তাঁর জুড়ি লেখক রুশ

সাহিত্যে কেন, বিশ্ব সাহিত্যেও কজন আছেন সন্দেহ। মানুষের নির্জ্ঞান মনের চিত্রণে তিনি এমনকি টলস্টয়কেও ছাড়িয়ে গেছেন। কিন্তু তাঁর শিল্পের এক প্রধান ত্রুটী এই যে, তিনি তাঁর উপন্যাসাদিতে দুঃখকে মহিমান্বিত করে আঁকবার চেষ্টা করেছেন এবং দুঃখের মধ্য দিয়ে মানুষ ঈশ্বরের আরও কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছায় এই ক্ষতিকর তত্ত্বের প্রচার করেছেন। অর্থাৎ দুঃখকে তিনি idolize ও idealize করেছেন। দুঃখ দূর করবার জন্য তাঁর চেষ্টা নয়, বরং দুঃখকে তিনি মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের অপরিহার্য সর্ত মনে করেন এবং দুঃখ যাতে সমাজ জীবনে টিকে থাকে তার পক্ষে ওকালতি করেন। যে ডস্টয়েভ্স্কি বিদ্রোহ দিয়ে জীবন শুরু করেছিলেন, ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে, তিনি জীবনের পরিণত প্রান্তে এসে জারতন্ত্রের সমর্থক হয়ে উঠেছিলেন এবং নিকৃষ্টতম প্রতিক্রিয়াশীলতার দুর্গ রুশ অর্থোডক্স্ চার্চের খিদ্‌মদ্‌গারি করতে শুরু করে দিয়েছিলেন।

কিন্তু পূর্বেই বলেছি ডস্টয়েভ্স্কি এক অসাধারণ শক্তিশালী লেখক। তাঁর এই লেখনীর শক্তি দ্বারা তিনি তাঁর সময়ে বহু রুশ পাঠকের মনকে প্রভাবিত করেছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুর পরেও ওই প্রভাব স্তিমিত হয়নি। দুঃখকে আঁকড়ে ধরে থেকে জীবনের সদর্থক গঠনমূলক দিক্‌টাকে ভুলে থাকতে রোমাণ্টিক প্রবণতাবিশিষ্ট ভাবালু তরুণদের একটা স্বাভাবিক ঝোঁক থাকে। ডস্টয়েভ্স্কি তাঁর লেখায় এই ঝোঁককে খুবই কাজে লাগিয়েছিলেন। খুব সম্ভব এ বিষয়টি বিবেচনা করেই সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ একটা সময়ে ডস্টয়েভ্স্কির রচনাবলীর প্রচার নিষিদ্ধ করেছিলেন। আজ আর অবশ্য তাঁর লেখার উপর এই নিষেধ নেই কিন্তু ডস্টয়েভ্স্কি সাহিত্যের প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র সম্পর্কে সতর্ক থাকবার প্রয়োজন কোন সময়েই ফুরবার নয় যদিও এ কথা একশো বার মানব যে, ডস্টয়েভ্স্কির মত অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন প্রখর শিল্পগুণযুক্ত লেখক কোটিতে গোটিক হয়েছেন। তাঁর শিল্পের শক্তিমত্তার মধ্যেই তাঁর শিল্পের অনিষ্টকারিতা বেশী লুকিয়ে রয়েছে।

এ বিষয়ে স্টালিনের উক্তি স্মরণীয়। তিনি ডস্টয়েভ্স্কি সম্বন্ধে কী বলেছেন সেটা প্রণিধান করা যাক। "A great writer and a great reactionary. We are not publishing him because he is a bad influence on youth. But a great writer." অর্থাৎ (ডস্টয়েভ্স্কি) একজন বড় লেখক

ও একজন প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়াশীল লেখক। আমরা তাঁর লেখা ছাপছি না কারণ যুবসম্প্রদায়ের উপর তাঁর প্রভাব ক্ষতিকর। কিন্তু তা সত্ত্বেও একজন বড় লেখক। বড় লেখক হলেই যে তাঁর প্রভাব সব সময় সমাজের পক্ষে হিতকর হয় না স্টালিনের এই উদ্ধৃতির মধ্য দিয়ে আমরা তার কার্যকর প্রমাণ পাচ্ছি।

চীনের সাহিত্য

এবার চীনের সাহিত্যের দিকে এক নজর দৃষ্টি ফেরানো যাক। আজ থেকে দুশো বছর আগে চীনদেশে 'লাল প্রাসাদের স্বপ্ন' নামে একটি উপন্যাস লেখা হয়েছিল। খুবই বৃহৎ উপন্যাস ও তাৎপর্যপূর্ণ উপন্যাস। চীনের সর্বস্তরের সমালোচক বুদ্ধিজীবী শিল্পী সাহিত্যিক ঐতিহাসিক শিক্ষাবিদ্ সকলেরই অভিমত এই যে, এই উপন্যাসটি চৈনিক সামন্ততান্ত্রিক সমাজের দর্পণ স্বরূপ। এতে চীনের আঠারো শতকের শোষণভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার গোটা একটা চিত্র পাওয়া যায়। যেন বইটি অষ্টাদশ শতাব্দীর চীনের অবস্থা-ব্যবস্থার আলেখ্য সমন্বিত অষ্টাদশখণ্ডী এক মহাভারত। মহাভারতের মতই তার আকার-প্রকার। বইটির ভাল দিক নিশ্চয়ই কিছু আছে, তবে ভালকে ছাপিয়ে মন্দের প্রাধান্য এত বেশী যে, সমাজ-মনের উপর এই উপন্যাসটির সম্ভাব্য কুফল বিবেচনা করে চীনের সমাজ নেতারা এক সময় রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন।

চীনের সমাজনেতাদের উদ্বেগ স্বাভাবিক, কারণ দেখা যায় বইটি প্রকাশের গত দুশো বছর কালের ভিতর বিভিন্ন প্রদেশের অসংখ্য তরুণ-তরুণী বইটির কুশী-লবের ধারা-ধরন নকল করতে গিয়ে নিজ জীবনে চরম বিপর্যয় ডেকে আনে। দেখা যায় বইটির দ্বারা প্রভাবিত অগণিত সংখ্যক তরুণ-তরুণী যুবক-যুবতীদের মধ্যে একটা অংশ স্বেচ্ছা-অনশনে প্রাণত্যাগ করে, আরেকটা অংশ উপন্যাসের লিন চরিত্রের আদর্শে ইচ্ছাপূর্বক কৃশাকৃতি ধারণ করে অর্থাৎ জেনেশুনে রোগাটে চেহারা ধরে; তৃতীয় আর এক ভাগ উপন্যাসের জিন জুকান চরিত্রের অনুকরণে যেন-তেন-প্রকারেণ ধনী হওয়ার রাস্তা বেছে নেয়। এ সবই উপন্যাসটির সামাজিক কু-ফলের দিক— শিল্পসৃষ্টি কীভাবে মানুষের মনকে প্রভাবিত করে তার পরিচয়বাহী।

এ তো গেল বিগত কালের কথা। সাম্প্রতিক কালের রচনার দিকে চোখ ফেরালে দেখা যায় সেখানেও চিত্র কিছু অন্যরকম নয়। 'বালিকাকে বাঁচাও' নামে একটি নয়া নাটক চীনে প্রদর্শিত হচ্ছে যার বিষয়বস্তু উত্তম অথচ যার

ফলাফলে অনেক অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়াও দেখা দিয়েছে বলে 'পিকিং রিভিয়্যু' পত্রিকা জানিয়েছে। নাটকটিতে দেখানো হয়েছে কেমন করে একজন শিক্ষক তাঁর বিপথগামিনী ছাত্রীকে মস্তানী ভাবাপন্ন ছোকরাদের কুপ্রভাব থেকে উদ্ধার করে সৎ পথে নিয়ে এলেন এবং তাকে সুস্থ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করলেন। সোভিয়েত রাশিয়ার প্রসিদ্ধ সিনেমা-ছবি 'রোড টু লাইফ'-এর মতই এই নাটকের উপজীব্য বিষয় গঠনমূলক, রচনাত্মক। সকলেই এক বাক্যে নাটক-টির উদ্দেশ্যের সততার প্রশংসা এবং একে একটি অনিন্দনীয় মঞ্চ-উপস্থাপনা বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু কার্যতঃ দেখা যায় এই নাটকের প্রদর্শনী থেকেও অনভিপ্রেত ফল ফলেছে। নাটকে মস্তানদের চরিত্র এমন জীবন্ত ও স্বাভাবিক করে দেখানো হয়েছে যে, কিছু অল্পবয়সী দর্শক তার দৃষ্টান্ত প্রভাবে অনুবিদ্ধ হয়ে সেইটাই নকল করতে লেগে গেছে। মস্তানদের হাঁটা-চলার ভঙ্গী, পোশাক-আশাকের রকম সকম, কথাবার্তার ধাঁচ-ধরন 'অনুকরণ' করতে গেলে যেন আর তারা কিছু চায় না এমনি তাদের ভাবভঙ্গী, সংলাপের ছাঁচ। নাটকের মূল উদ্দেশ্যকে পরাহত করে অবান্তর প্রসঙ্গের প্রভাব তরুণ মনের উপর জায়গা জুড়ে বসার এ একটি বিসদৃশ উদাহরণ।

এ রকম উদাহরণ আরও আছে। চীনের শিল্পজগতেই আছে। 'উড়ন্ত চাক্কু হুয়া' নামে কিছুকাল আগে নয়াচীনে একটি সিনেমা ছবি দেখানো হয়েছিল। বিপ্লবপূর্ব চীনের এক নামকরা কসরৎ দেখানেওয়ালার জীবনকে চিত্রিত করা হয়েছে এই ছবিটির কাহিনীবৃত্তের মধ্যে। ছবিটি পর্দায়িত হওয়ার পর থেকে দেখা গেল কিশোর বয়সী ছেলেছোকরার দল কসরতওয়ালার জীবনভঙ্গী নকল করে ছুরি-ছোরা খেলায় মেতে উঠেছে, তদ্দ্বারা সমাজে একটি অনর্থকর পরিবেশের সৃষ্টি করে তুলেছে। পনেরো-ষোল-সতেরো বছরের কিশোর ছেলে চাকু চালিয়ে সহপাঠীর জীবনাবসান ঘটাচ্ছে কিংবা কথায় কথায় পথে-ঘাটে মারামারি বাধিয়ে তুলছে এমন বিষময় দৃষ্টান্তেরও অভাব হলো না। চিত্রনির্মাতার উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দিয়ে কীভাবে ছবির বিষয় অনভিপ্রেত দিকে দর্শকের মনকে চালিত করে এই ছবিটি থেকে তার একটি দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে।

অন্যান্য দৃষ্টান্ত

মার্কিন দেশের ছায়াছবিতে আর টেলিভিশনে এবং আমাদের দেশের হিন্দী

ছবির জগতে যে সব কাণ্ড-কারখানা চলে তার ফল তরুণ মনের উপর কীরকম বিষময় ফল প্রসব করে তার তথ্য সকলেই বিদিত আছেন। মার্কিন ছবিতে ইয়াংকি জীবন রীতির প্রতিফলন স্বরূপ যে সব 'সেক্স' ও 'ভায়োলেন্সের' বাড়াবাড়ির দৃশ্য দেখানো হয় তার ফলে সমাজের উপর সেগুলির কুপ্রভাব সহজেই ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। মার্কিন সমাজের উদ্দাম ভোগতান্ত্রিকতা ও অনিয়ন্ত্রিত হিংসাচারের মূলে এই সব ছায়া-ছবির দৃষ্টান্ত যে একটা প্রধান উদ্দীপক কারণ রূপে বর্তমান সে সম্পর্কে সে দেশের সমাজতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা সকলেই একমত। পুঁজিবাদী অবক্ষয়েরই বহিঃপ্রকাশ যে এই সব বিকারের লক্ষণ সে সম্বন্ধেও তাঁদের দ্বিমত নেই। মার্কিন টি·ভির পর্দায় খুনখারাবির দৃশ্য এমন ধীর গতিতে (স্লো-মোশান সিকোয়েন্সে) খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখানো হয় যে তাই থেকেই ভাবী খুনে-অপরাধী খুনের কলা-কৌশল শিখে নিতে পারে, বিদ্যাটি আয়ত্ত করতে তার কোন অসুবিধা হয় না। বিচারালয়ে বিচারের জন্য আনীত খুনী স্কুলের ছেলেকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় সে এত অল্প বয়সে ওই খুনের ক্রিয়া-পদ্ধতি শিখলো কোথা থেকে, বিচারককে সে জানায় টি-ভির হত্যাদৃশ্যই তার এতদ্বিষয়ক শিক্ষার উৎস! হিংসাচারের বেলায় যেমন তেমনি যৌন আতিশয্যের বেলায়ও মার্কিন চলচ্চিত্র আর দূরদর্শনই হলো ওই সংক্রামক কুপ্রভাব বিস্তারের একটা প্রধান সূত্র।

আমাদের দেশের বেশীরভাগ নিম্নমানের হিন্দী ছবিকে কমবেশী একই দোষে দোষী করা চলে। তরুণ সমাজের একাংশের ভিতর পোশাকের উৎকটতা, যৌন স্বেচ্ছাচার, কথায় কথায় গুলী-পিস্তল চালাবার রোখ, অকারণ উচ্ছৃঙ্খলতার নেশা প্রভৃতি যে সব মারাত্মক প্রবণতা ইদানীং ক্রমবর্ধমান মাত্রায় লক্ষ্য করা যাচ্ছে তার হেতু খুঁজতে গেলে বেরিয়ে পড়বে হিন্দী ছবির যোগসূত্র। আজ শুধু হিন্দী ছবি একাই নয়, তার সঙ্গে দোসর হিসাবে এসে হাত মিলিয়েছে দক্ষিণ-ভারতীয় ছবি, বিশেষ করে তামিল ছবি। হিন্দী আর দক্ষিণ ভারতীয় ছবিতে মিলে মূল্য-বোধের বিকার সাধনের ক্ষেত্রে এক চরম বিপর্যয়কর কাণ্ড বাধিয়ে তুলেছে এ লক্ষণ অতি স্পষ্ট। এই ক্ষতিকর প্রভাব রোধে আশু কোন কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বিত না হলে সমাজ মনে অনিষ্ট-সম্ভাবনা মারাত্মক আকারে ছড়িয়ে পড়তেই থাকবে, তাকে আর দমন করা যাবে না।

সমাজমনের উপর অপকৃষ্ট রুচি-বিশিষ্ট সিনেমা-টেলিভিশন-রেডিও ও লাখ লাখ সংখ্যায় বিক্রি-হওয়া বাজারী পত্রিকাগুলির কু-প্রভাবের ব্যাপকতা দৃষ্টে

পাশ্চাত্যের সমাজহিতকামী মনীষীবৃন্দ খুবই উদ্বিগ্ন। আইনস্টাইন, কার্ল চাপেক, আলেক্সি ক্যারল প্রমুখ বিজ্ঞান জগতের প্রথম শ্রেণীর সাধকেরা মনে করেন আধুনিক কালে রুচির নিম্নাভিমুখীকরণে তথা সংস্কৃতির মানের অবনায়নে সর্বাপেক্ষা অনিষ্টকর ভূমিকা সিনেমার ও বাজারী সংবাদপত্রের। তাঁদের সময়ে টেলিভিশনের আবিষ্কার হয়নি, হলেও তার তেমন প্রচার হয়নি ; নয়তো তাঁরা পূর্বোক্ত দুটি উৎপাতের সঙ্গে এই উৎপাতটিকেও জুড়ে দিতেন। এগুলি সত্যই উৎপাত বিশেষ, কারণ মানবীয় মূল্যবোধের বিকৃতি সাধনে ও সমাজে প্রচলিত শিষ্ট ধারণাগুলির উৎপাটনায় এই সব তথাকথিত সাংস্কৃতিক বাহনগুলির দৌরাত্ম্য-কর ভূমিকার কোন তুলনা হয় না। এগুলি যে পরিমাণে গণ-প্রচারের বাহন সেই অনুপাতেই গণরুচির হন্তারক। রুচিকে টেনে নামাতে নামাতে কোথায় নামিয়ে আনা যেতে পারে মার্কিন সিনেমা টেলিভিশন ও 'হলুদ' সংবাদপত্রগুলি তার প্রকৃষ্ট নমুনা।

সদর্থক ভূমিকা

কিন্তু শিল্প-সাহিত্য তো শুধু কুফলই দর্শায় না, সমাজমনের উপর তাদের সুফলের পরিমাণও বিরাট। তা যদি না হতো তো শিল্প-সাহিত্যের চর্চা করারই কোন প্রয়োজন দেখা দিত না। যুগে যুগে মানুষ শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির অনুশীলন দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছে। তার মন উন্নত হয়েছে, মহত্তের ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছে, কীভাবে জীবনপথে চলতে হবে শিল্প-সাহিত্য থেকে তার সংকেত ও নিশানা লাভ করে প্রভূত উপকৃত হয়েছে। শিল্পের অনুধাবন ও সাহিত্যের পঠন-পাঠনায় তার রুচির স্তর উর্ধ্বায়িত হয়েছে, চিন্তার শক্তি জন্মেছে, তার ভিতর সৌন্দর্যের বোধ উদ্রিক্ত হয়েছে। মহৎ কাজের প্রেরণাও মানুষ এই দুই সূত্র থেকে পেয়েছে। শিক্ষা তো অবশ্যই লাভ করেছে, কিন্তু শিক্ষার চেয়েও বড় যে জিনিস, যা কিনা শিক্ষার নির্যাস স্বরূপ, কালচার, তারও সূত্র এই দুই বস্তু। মানুষ কতভাবে যে শিল্প-সাহিত্যের কাছে ঋণী তা বলে বোঝানো যায় না।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ, আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা রামায়ণ-মহাভারতের উল্লেখ করতে পারি। ভারতীয় মনের উপর এই দুই মহাকাব্যের অপরিমেয় প্রভাবের তল খুঁজে পাওয়া যায় না। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই দুই মহাকাব্যকে

"শাশ্বত ভারত-ইতিহাস" রূপে অভিহিত করেছেন। বিশেষ করে রামায়ণের মহিমা কীর্তনে তিনি অবারিত। তেমনি ইউরোপ খণ্ডে গ্রীক মহাকাব্যদ্বয় ইলিয়াড ও ওডিসির প্রভাব। অন্যান্য ছোট-বড় মহাকাব্যগুলির প্রভাব তো আছেই। প্রাচীনযুগের সীমা অতিক্রম করে আধুনিক কালের পরিধিতে প্রবেশ করলে আমরা পাই পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ডের অনুষঙ্গে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, র‍্যাফেল, মিকালেঞ্জেলো, রেমব্রাণ্ট, টিশিয়ান ভেলাসকোয়ে প্রমুখ অমর চিত্রকর প্রতিভা; দান্তে, পেত্রার্কা, শেক্সপীয়র, মিল্টন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী, কীটস, ব্রাউনিং, গ্যেটে, শীলার, পুশকিন, লার্মাণ্টভ, লা ফন্টেন প্রমুখ কবিকুল; সার্ভেন্টিস গোগল, টলস্টয়, টুর্গেনিভ, শেখভ, গর্কি, ভিক্টর হুগো, ব্যলজক, ফ্লবেয়ার, মপাসাঁ, জোলা, আনাতোল ফ্রান্স, রোমাঁ রোলাঁ, টমাস মান, হার্মান হেস, ডিকেন্স, থ্যাকারে, গলসোয়ার্দি, টমাস হার্ডি, এইচ জি ওয়েলস প্রমুখ কথাসাহিত্যিকবৃন্দ; শেক্সপীয়্যর, মার্লো, মলেয়ার, রেসিন, বিয়র্নসন, ইবসেন, বার্নার্ড শ প্রমুখ নাট্যকারকুল; মাতিশ, পিকাসো, ভ্যান গগ, গোগাঁ, দেলা ক্রয় প্রমুখ আধুনিক চিত্রকরযূথ। এঁদের প্রভাব সম্মিলিতভাবে ও আলাদা আলাদাভাবে মানবমনের উপর— দর্শক ও পাঠকমনের উপর কী হিতকর প্রভাবই না বিস্তার করে এসেছে এযাবৎ। আমাদের সংস্কৃতির অনুষঙ্গে এলে চোখে পড়ে আধুনিক সাহিত্য ও শিল্পে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, কাজী নজরুল, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মানিক, সুকান্ত, অবনীন্দ্র, নন্দলাল, গগনেন্দ্র, যামিনী রায়, রামকিঙ্কর বেইজ প্রমুখের সারিবদ্ধ মিছিল। জাতীয় মনের উপর এঁদের শিল্পসৃষ্টির সুফলের কি কোন তুলনা আছে? বাঙালী জাতি কতভাবে কত দিক দিয়ে যে এঁদের সৃজনী প্রতিভার কাছে ঋণী তার পরিমাপ করা যায় না।

এখানে বিশেষ করে একটি বইয়ের নামোল্লেখ করব, বাংলায় বিপ্লবী ঐতিহ্যের সৃষ্টিতে যার অবদান সর্বদাই কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণীয়। এই বইখানি হলো শরৎচন্দ্রের পথের দাবী। তিরিশের দশকের বাঙালী বিপ্লবী তরুণ-তরুণীরা এই উপন্যাসের মূলচরিত্র সব্যসাচীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আন্তর্জাতিক বিপ্লবের স্বপ্নকে অন্তরে অন্তরে লালন করেছেন, তাকে সাধ্যমত রূপ দেবারও চেষ্টা করেছেন তাঁদের কোন-কোন গোষ্ঠী। হিন্দু ধর্মবিশ্বাসীদের কাছে যেমন গীতা, মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের কাছে যেমন কোরান, ক্রীশ্চিয়ান ভক্তদের কাছে

বাইবেল ; স্বাধীনতা আন্দোলনের একটা পর্বে বাঙালী বিপ্লবী যুবক-যুবতীদের কাছে তেমনি ছিল পথের দাবী বইয়ের আবেদন। সন্ত্রাসবাদ আজ আর কোন পথ নয়, বিশেষ, ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদ তো নয়ই। কিন্তু পথের দাবী উপন্যাস শুধু সন্ত্রাসবাদেরই চিত্রণ নয়, তার একটা আন্তর্জাতিক পটভূমিকা আছে বিশ্ব-সাংগ্রামিকতার প্রতীকতা আছে। জাতীয় মুক্তি এর মূল অন্বিষ্ট হলেও পরোক্ষে আছে বিশ্বমুক্তির অন্বেষা। সেই দিক দিয়ে বইখানির বিশেষ মূল্য রয়েছে। সব্যসাচী চরিত্রটি এই বৃহৎ ভাবের ব্যঞ্জনায় একটি আলাদা আয়তন পেয়েছে।

অপসংস্কৃতির সমস্যা

আর প্রবন্ধ দীর্ঘ করব না। শুধু একটি কথা। পথের দাবীরই সমসাময়িক কালে কল্লোল, কালিকলম, প্রগতি প্রত্রিকার আবির্ভাব। এই সব নয়া পত্র-পত্রিকার আওতাভুক্ত তরুণ লেখকের দল কিন্তু শরৎচন্দ্রের পরিপোষিত জাতীয় মুক্তির আদর্শকে নিজেদের ধ্যেয় আদর্শ বলে গ্রহণ করেননি। বরং জাতীয়তার বৃত্ত থেকে সরে গিয়ে বিজাতীয় যৌনমুক্তি ও আনুষঙ্গিক আরও দু-একটি অসার আদর্শকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তাঁদের লেখনীতে শ্রদ্ধেয় মূল্যবোধগুলি বেঁকে-চুরে তুমড়ে গিয়েছিল। এই বিপর্যস্ত মূল্যবোধেরই একটি অবাঞ্ছিত ফসল হলো অপসংস্কৃতি। অপসংস্কৃতির ঘোলাজলের বন্যাকপাট উন্মুক্ত করে সেদিন কল্লোলের লেখকেরা যে-ভুল করেছিলেন, সেই ভুলের মাশুল আজও আমাদের গুণে চলতে হচ্ছে। সাম্প্রতিক বাংলার পাঠকমনের উপর অপসংস্কৃতির কুপ্রভাব বর্তিয়েছে সবিশেষ। সমাজমনকে কলুষিত করার ক্ষেত্রে অপসংস্কৃতির যে অবিসম্বাদী ক্ষতিকর ভূমিকা, সেই ভূমিকাকে সম্পূর্ণ দমিত, নির্জিত, পরাস্ত না করা পর্যন্ত সুস্থ সংস্কৃতির অভিযান চালিয়ে যেতেই হবে। এর আর অন্যথা নেই।

লিখিয়ে ও পড়িয়ে

লেখাপড়ার যাঁরা চর্চা করেন তাঁদের দুটি স্পষ্ট-চিহ্নিত ভাগে ভাগ করা যায়: লিখিয়ে এবং পড়িয়ে। শব্দসাম্যমিলের খাতিরে 'পড়িয়ে' কথাটি ব্যবহার করলুম, কিন্তু বাংলা ভাষায় 'পড়ুয়া' কথাটারই সমধিক চল। তবে 'পড়িয়ে' বা 'পড়ুয়া' যে শব্দেরই ব্যবহার হোক-না কেন, প্রশংসাসূচক হয়েও ওই দুটি শব্দের ধ্বনির মধ্যে কোথায় যেন একটা প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ রয়েছে।

অপরপক্ষে 'লিখিয়ে' কথাটার মধ্যেও একটা সূক্ষ্ম তাচ্ছিল্যার্থ নিহিত রয়েছে বলে মনে হয়। 'লিখিয়ে' কথাটার ঠিক ঠিক ইংরেজী প্রতিশব্দ যদি প্রয়োগ করতে হয় তো 'স্ক্রাইব' বা 'কুইল-ড্রাইভার' কথা দুটির শরণাপন্ন হতে হয়। বলা বাহুল্য, ও দুটির কোনটিই যথেষ্ট সম্ভ্রমার্থে ব্যবহৃত শব্দ নয়। 'লেখক' বলতে মনে যে ভাব জেগে ওঠে, 'লিখিয়ে' বললে মনে ঠিক সেই ভাব জাগে না। 'লেখক' একটি সম্ভ্রমপূর্ণ শব্দ, 'লিখিয়ে' সেরূপ নয়। লেখা যাঁদের পেশা বা অভ্যাস, লিখে অর্থাৎ কলম চালিয়ে যাঁরা জীবিকা নির্বাহ করেন, তাঁদের লক্ষ্য করেই যেন 'লিখিয়ে' কথাটার সচরাচর ব্যবহার। তবে প্রবন্ধের শিরোনামায় 'লিখিয়ে' ও 'পড়িয়ে' বা 'পড়ুয়া' এই দুটি শব্দের নির্বাচন করলুম কেন? নির্বাচন করেছি এইজন্য যে, ওই দুই শ্রেণীর মানুষেরই মানসিকতা যে একপেশে, দৃষ্টিভঙ্গী খণ্ডিত, অভ্যাস ত্রুটিযুক্ত— সেটির প্রতিপাদন এই প্রবন্ধের মুখ্য বিচার্য। কিন্তু যেহেতু ত্রুটি-বিচ্যুতির আলোচনা গঠনাত্মক নয়, বিনাশাত্মক, সেই কারণে কী হলে একজন লেখাপড়ার চর্চাকারী ব্যক্তি সত্যি সত্যি একজন আদর্শ বিদ্বান বলে সমাজে পরিচিত হতে পারেন সেটি নিরূপণ করাও আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হবে। অর্থাৎ বিদ্বান কে, পণ্ডিত কাকে বলে, এটিও এই রচনার নির্ণেয়।

প্রথমে 'লিখিয়ে'-র কথা বলি।

লেখাপড়ার চর্চাকারীদের মধ্যে এক শ্রেণীর ব্যক্তি আছেন যাঁরা লিখতে ভালোবাসেন এবং অনবরত লিখেই চলেছেন। গোড়ায় হয়তো তাঁদের 'লেখক'-রূপে প্রতিষ্ঠা অর্জনের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা ছিল, সেজন্যে প্রযত্নেরও অভাব ছিল না; কিন্তু অবস্থার চক্রে এবং ভাগ্যের ফেরে ইদানীং তাঁদের 'লেখক' হবার আকাঙ্ক্ষা ঘুচে গেছে; জীবিকা নির্বাহের তাগিদেই হোক আর অঢেল অর্থ

রোজগারের ধান্দাতেই হোক, তাঁরা বিরামবিহীন ভাবে দিনরাত লিখেই চলেছেন। তাঁদের জীবনে অবসর বলে কিছু নেই, যেটুকু অবসর আছে সেটুকু লিখিত রচনাদির বিলি-ব্যবস্থা করতেই কেটে যায়। লোকে যখন বিশ্রামসুখ ভোগ করছেন, এঁরা তখন পাণ্ডুলিপি বগলে করে প্রকাশকের দুয়ারে হুমড়ি খেয়ে পড়ছেন কিংবা লেখার তাড়া হাতে নিয়ে সম্পাদকের দপ্তরে ছুটছেন। কাগজের পাতায় অক্ষর সারিবদ্ধভাবে সাজিয়ে লেখা তৈরী করা এবং লেখা সম্পূর্ণ হলে সে লেখার গতি করার জন্য প্রকাশক বা সম্পাদকের দ্বারস্থ হওয়া— লিখিয়ের সময় এ দুটি কাজের মধ্যেই মূলতঃ বিভক্ত। ওই প্রায়-নিশ্ছিদ্র, ঠাস-বুনন কাজের ফাঁক-ফোকর দিয়ে কখনও অন্য চিন্তা গলতে পারে কিনা তাতে সন্দেহ আছে।

অথচ আমরা জানি, লেখক হতে হলে যথেষ্ট পরিমাণে পড়াশুনো করতে হয়। অধ্যয়ন-চিন্তন-মনন-অনুভাবনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কোন ভাব যখন মনে বিশেষভাবে দানা বেঁধে ওঠে এবং প্রকাশের জন্য আকুলি-বিকুলি করতে থাকে, তখনই শুধু তাকে খাতার পাতায় লিপিবদ্ধ করার প্রশ্ন ওঠে, তার আগে নয়। একটা ভাব বা কল্পনা বা আইডিয়া মনে যথেষ্ট পরিমাণে আলোড়ন তুললে ও আকার লাভ করলে তবেই তার— আলংকারিকেরা যাকে বলেছেন externalization, শৈল্পিক বহিঃপ্রকাশ— এর কথা আসে। কিন্তু বক্তব্য মনের মধ্যে তেমনভাবে দানা বাঁধলো না অথচ লেখবার অভ্যাসের খাতিরে হোক, বক্তব্য আধা-খেঁচড়া বা অপরিপক্ক হোক— তাকেই ভাষা দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলুম. এটা প্রকৃত লেখকের ধর্ম নয়, কলম চালিয়ের কর্ম।

লিখিয়ে বলতে যাঁদের বোঝায় তাঁদের বেশীর ভাগই এই শ্রেণীর— অভ্যাসের বশে লেখক, পেশার তাগিদে লেখক, অর্থোপার্জনের প্ররোচনায় লেখক। এ-জাতীয় লেখক লিখন রূপ পবিত্র কার্যের বলতে গেলে অবমাননাই করেন।

লেখা জিনিসটা বড়ো সহজ ব্যাপার নয়। পূর্বেই বলেছি ভাব অন্তরে সুগ্রথিত না হলে তাকে লেখায় রূপ দিতে যাওয়া কোন কাজের কথা নয়। বক্তব্য কিছুই নেই অথচ লেখবার খাতিরেই লেখা— এ রকম রচনার কী মূল্য? কিংবা কল্পনা দুর্বল বা অগ্রথিত, তাকে সৃষ্টিমূলক রচনার আকার দিতে যাওয়ারই বা কী সার্থকতা?

রচনা দুই প্রকার: বক্তব্যপ্রধান রচনা, সৃষ্টিধর্মী রচনা। প্রথমটির ভিত্তি

জ্ঞান, দ্বিতীয়টির ভিত্তি কল্পনা। একটি চায় ভাবসৃষ্টি করতে, অন্যটি চায় রূপ-সৃষ্টি করতে। কিন্তু যিনি যে ধরনের রচনারই চর্চা করুন-না কেন, তাঁর কাজের পিছনে প্রভূত পরিমাণে অবসরের ভূমিকা না থাকলে সে রচনা সার্থক হয় না। অবসর অর্থে হাত-পা ছড়িয়ে বিশ্রাম নয়, গা এলিয়ে দিয়ে চিন্তাশূন্যতার প্রশ্রয় দেওয়া নয়, অবসর অর্থে এখানে বুঝতে হবে অধ্যয়ন মনন নিদিধ্যাসনের অনুশীলনের অবকাশ। অবসরের মুহূর্তগুলিকে অনেক পড়ে, অনেক ভেবে, অনেক কল্পনা ও অনুভূতির অভ্যাস দিয়ে ভরিয়ে তুলতে পারলে, তবেই লিখনকর্মের যথার্থ প্রাগ্‌ভূমিকাটি প্রস্তুত করে তোলা যায়। পড়তে হবে অজস্র, ভাবতে হবে প্রচুর, লিখতে হবে একরত্তি— এই অনুপাত অনুযায়ী যদি আমরা চলবার চেষ্টা করি তা হলেই শুধু লেখায় প্রকৃত শক্তিমত্তার সঞ্চার করা সম্ভব। পড়লুম না, ভাবলুম না, অনুভব করলুম না অথচ অভ্যাসমোতাবেক দিনরাত ঘসঘস করে কলম চালিয়ে গেলুম এ রকম হলে আর লেখা লেখা থাকে না, তা ছাপাখানার কম্পোজিটরের টাইপ সাজানোর মতো কালির আঁচড়ে অক্ষর সাজানোর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়— যান্ত্রিক ব্যাপার, অভ্যাসগত ব্যাপার।

এইজন্য দেখা যায়, বড় বড় লেখকেরা ভাবেন বেশী, পড়েন বেশী, লেখেন কম। এই জাতীয় বিশ্রুত-কীর্তি লেখকদের মধ্যে কাউকে কাউকে রীতিমতো অলস বলা যায়— লেখার পরিমাণকে যদি শ্রমশীলতার একমাত্র মানদণ্ডরূপে বিচার করা যায় সেই বিচারের নিরিখে। কিন্তু লেখার পরিমাণ কম হলেই ভাবনার পরিমাণ কম হয় না, পড়ার পরিমাণ কম হয় না। বরং ওই দুইয়ের মধ্যে প্রায়ই বিপরীত অনুপাতের সম্পর্ক বিরাজ করতে দেখা যায়। অনেক পড়া ও চিন্তা-ভাবনার পর দৃষ্টিগ্রাহ্য মাত্রায় স্বল্প পরিমাণ লেখা রচনার সার্থকতার একটা প্রধান নিশানা। অবশ্য সব সময়েই যে এ নিয়ম খাটে তা নয়, তবে মোটামুটি ভাবে এ নিয়ম সত্য। সত্য এই কারণে যে, উপযুক্ত পরিমাণ প্রস্তুতি ব্যতিরেকে কোন কাজই সার্থকতা-মণ্ডিত হয় না— তা লেখার কাজই হোক আর অন্য যে-কাজই হোক। অভ্যাসই যে-লেখার একমাত্র যৌক্তিকতার উৎস, যার পিছনে প্রাণের বা মনের গভীরতর কোন অভীপ্সা নেই, যা যথেষ্ট-পরিমাণ তথ্য, তত্ত্ব বা চিন্তাশীলতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তা আয়তনের দিক দিয়ে যতই ভূরিপরিমাণ হোক-না কেন, প্রকৃতিতে তা কৃত্রিমতাযুক্ত হতে বাধ্য। এ-জাতীয় তাগিদবিহীন রচনায় যান্ত্রিকতার দোষ এড়ানো সম্ভব নয়।

শোনা যায় রবার্ট লুই ষ্টিভেনসন উদ্দেশ্যহীনভাবে একা একা ঘুরে বেড়াতে খুব ভালোবাসতেন। তাঁর আত্মকথনমূলক একটি রচনায় বলেছেন, তিনি বেড়াবার সময় সঙ্গী পছন্দ করেন না, সঙ্গে আর কেউ থাকলে তাঁর চিন্তার তন্ময়তা আর আলস্যের আবেশ ব্যাহত হয় বলে তিনি একা বেড়াতেই অধিক আরাম পান। এই বেড়ানোর ঝোঁক আর একা বেড়াবার ইচ্ছা আর কিছু নয়, মনকে সার্থক সাহিত্যসৃষ্টির পক্ষে অত্যাবশ্যক চিন্তা-কল্পনার উপকরণে ভরিয়ে তোলার আয়োজন মাত্র। একা বেড়াবার অবসরে, আলস্যমন্থর মুহূর্তগুলিতে মনের ভিতর ভাব-কল্পনার যে রোমন্থন চলে, পরে লেখার টেবিলে এসে খাতার পাতায় তাকেই ওগড়াবার এটি ভূমিকা।

হ্যাজলিট, ডি-কুইন্সি প্রমুখ বিশিষ্ট ইংরেজ প্রাবন্ধিকদের লেখায়ও আমরা লেখকের পক্ষে এ-জাতীয় ভ্রমণবিলাস আর অবসর বিনোদনের ভূমিকার গুরুত্ব লক্ষ্য করি। চার্লস ল্যাম্বের স্বীয় রচনার বাচনিক আমরা জানতে পারি, ল্যাম্ব অবসরক্ষণে লণ্ডনের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন, উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, পুরাতন লণ্ডন শহরের আবহের সৌগন্ধ্য বুক ভরে গ্রহণ করবার চেষ্টা। ঘুরতে ঘুরতে যদি প্রাচীন দিনের এক-চিলতে বাতাস নিঃশ্বাসে উঠে আসে, সেটাই একটা মস্ত লাভ।

আমাদের প্রাণপ্রিয় শরৎচন্দ্র ঘোরতর আলস্যবিলাসী লেখক ছিলেন। নেশাসক্ত ব্যক্তি যেমন মৌজ করে নেশার মৌতাত জমান, তিনিও তেমনি যথেষ্ট মৌজ করে আলস্য ভোগ করতেন। ছিলিমের পর ছিলিম তামাক পুড়ত, হাতে গড়গড়ার নল নিয়ে আরাম-কেদারায় অর্ধ-শয়ান অবস্থায় আপাত-নিষ্ক্রিয় ভাবে বসে রয়েছেন তো রয়েছেনই, লিখবার নাম নেই, তার জন্য তাড়াহুড়োরও কোন লক্ষণ নেই। দর্শনার্থীদের সঙ্গে একটানা আলাপ-আলোচনায় নিরত, যেন আলাপ-আলোচনাটাই জীবনের একমাত্র মুখ্য কৃত্য, সংসারে আর-কোন কর্তব্য নেই। বাইরে থেকে দেখলে শরৎচন্দ্রকে কুঁড়ের হদ্দ লেখক বললেও বোধ হয় অত্যুক্তি করা হত না। লেখার জন্য প্রয়োজনীয় আড়মোড় ভাঙতে তাঁর অনেক সময় লাগত, লেখার টেবিলে বসতে ছিল ঘোরতর অনিচ্ছা, সম্পাদককে লেখা দেবার তারিখ দিয়ে সেই তারিখ বেমালুম ভুলে যেতেন অথবা মনে থাকলেও তারিখ পাল্টাতেন। অপরাজেয় কথাসাহিত্যিক রূপে জীবনের যে-পর্বে তিনি বাংলাদেশের হৃদয়মধ্যে আপনার সুপ্রতিষ্ঠিত আসন করে নিয়েছেন, সেই পর্বে

এসে তাঁর অন্তরে যেন আর লেখার জন্য বিশেষ মমতা অবশিষ্ট ছিল না। ওই সময়ে আপাত-আলস্যবিলাসে এমন আসক্ত হয়েছিলেন যে, লিখতে বসতে যাতে না হয় তার অনুকূলেই যেন সর্বদা যুক্তি খুঁজে বেড়াতেন। যুক্তি অর্থাৎ অছিলা —না লেখবার অছিলা।

শোনা যায় 'বিজলী'-সম্পাদক নলিনীকান্ত সরকার শরৎচন্দ্রের উপর্যুপরি প্রতিশ্রুতিভঙ্গে হতাশ, ক্ষুব্ধ আর ক্ষিপ্ত হয়ে, শেষ পর্যন্ত একপ্রকার মরিয়াভাবেই এক কৌশল অবলম্বন পূর্বক শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে লেখা আদায় করেছিলেন। তিনি কী করেছিলেন? না, শরৎচন্দ্রকে ঘরে বন্দী করে বাইরে থেকে দরজায় কুলুপ এঁটে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন লেখা যতক্ষণ না শেষ করছেন ততক্ষণ তিনি ছাড়া পাবেন না। এই কৌশলে কাজ হয়েছিল। কয়েক ঘণ্টা ঘরে আবদ্ধ থেকে লেখা শেষ করবার পর তবে শরৎচন্দ্র ঘর থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছিলেন। অবশ্য নলিনীকান্তের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের ছিল গভীর স্নেহ-প্রীতির সম্পর্ক, তাইতেই নলিনীকান্ত শরৎচন্দ্রের মতো এমন মানী ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তির সঙ্গে এমনতর চাতুর্য অবলম্বন করতে সাহসী হয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রকে আচ্ছা জব্দ করেছিলেন তিনি। তবে এই ফাঁদ-পাতার আয়োজনের ভিতর, বলাই বাহুল্য, ক্রূরতার কোন স্থান ছিল না। ফাঁদের যিনি শিকারী তিনি তাঁর শিকারের জন্য জানলা দিয়ে অবিরাম চা-সিগারেটের জোগান দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। আপসে ঝগড়ার মতো এ-ও এক ধরনের আপসমূলক ষড়যন্ত্র। ক্রমাগত কথার খেলাপে ক্ষুব্ধ নলিনীকান্তের আহত অভিমানপ্রসূত এই ফন্দী, ভক্তের প্রতি অপরিসীম স্নেহ-বাৎসল্যের টানে শরৎচন্দ্র একপ্রকার অপ্রতিবাদেই মেনে নিয়েছিলেন।

কিন্তু এই-যে বৃত্তান্ত, যা বেশ খানিকটা সবিস্তারেই বলা হল, এর ভিতরের কথাটা কী? শরৎচন্দ্র কি লিখনবিমুখ ছিলেন? কুঁড়ে ছিলেন? তবে বাংলা-দেশের নরনারীর মনোহরণকারী এত এত অনবদ্য গল্পোপন্যাস তিনি লিখলেন কী করে এবং কখন? আসলে শরৎচন্দ্রের ওই আলস্য লিখতে বসার আবশ্যিক প্রস্তুতিপর্বের একটি প্রাথমিক পর্যায় মাত্র। যতক্ষণ তিনি লোকজনের সঙ্গে গল্প-গাছা করে দৃশ্যতঃ উদ্দেশ্যহীনভাবে সময় কাটাতেন, ছিলিমের পর ছিলিম তামাক পোড়াতেন, কিংবা কাছেভিতে যখন মানুষ থাকত না, হাতে সিগারেট ধরে আলগোছে ঠায় বসে থাকতেন; সারা সময় জুড়ে তাঁর মনে মন্থন চলত সম্ভাবিত সৃষ্টিক্রিয়ার। এটা আমাদের অনুমান মাত্র নয়, শরৎচন্দ্রকে যাঁরা কাছে থেকে

দেখবার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরাই শরৎচন্দ্রের এই সৃষ্টিরহস্য অবগত ছিলেন। আর শরৎচন্দ্র বলে কথা কেন, শক্তিমান সৃষ্টিধর্মী লেখকমাত্রেরই তো এই মনো-ধর্ম। তাঁদের বেলায় আলস্য একটা ভঙ্গী, লোক-দেখানো আলস্যের অবসরে অন্তর গভীর সৃষ্টির আকৃতিতে পূরে রেখে তাঁরা তাঁদের সাহিত্যকর্মকে প্রকৃত সৃষ্টির লক্ষণাক্রান্ত করেছেন এবং এইভাবে অনেক কালজয়ী সাহিত্যের জন্ম দিয়েছেন।

অবিরাম লেখা, উধ্বর্শ্বাসে লেখা, অনর্গল লেখা— এই প্রায়-জ্বরতপ্ত উৎক্ষিপ্ত রচনাপ্রয়াসের পিছনে বিশ্রামের কোন পটভূমিকা নেই, নেই আলস্যের মধুর রোমন্থনের কোন সুস্থির ক্রিয়া। অধ্যয়ন-মনন-জল্পন-কল্পনের মন্থর কিন্তু অপরি-হার্য অধ্যায়টি এই শ্রেণীর ব্যস্ততাতাড়িত অস্থির রচনাক্রিয়ায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। ফলে এই জাতীয় রচনার ফসল প্রাচুর্যমণ্ডিত হলেও সারবান হয় না, তাতে বিস্তার থাকলেও গভীরতা আসে না, এবং···সবচেয়ে যেটা বিচ্যুতি, এরকম লেখা প্রায়ই কৃত্রিমতা দোষযুক্ত হয়, ক্লান্তিকর অভ্যাসের যান্ত্রিকতার ছাপ ওই লেখার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে মলিন করে দেয়। ফসলের অজস্রতাটাই বড় কথা নয়, তার প্রাণ-প্রদায়িণী শক্তিটাই আসল। প্রাচুর্যের পিছনে মনোহারিত্ব না থাকলে নিছক প্রাচুর্যের বিশেষ মূল্য নেই। সাহিত্য আনন্দের দান, অধ্যবসায়ের নয়।

কথিত আছে, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের ছক আগাগোড়া মনে মনে প্রস্তুত থাকত, আগেভাগে সমস্ত কাহিনীটা ছকে নিয়ে তবে তিনি লিখতে বসতেন। ফলে এমনও হয়েছে যে, কোন উপন্যাসে আত্মনিয়োগ করে প্রথম দু' অধ্যায় লেখার পর মাঝের অধ্যায়গুলি ডিঙিয়ে ত্রয়োদশ কি চতুর্দশ অধ্যায় আগে লিখেছেন। সর্বশেষ অধ্যায় আগে লিখে পূর্ববর্তী অধ্যায় পরে লিখেছেন কিনা সে কথা জানা নেই, তবে সমস্ত গল্পের রূপরেখাটি এমনভাবে তাঁর মনে গাঁথা থাকত যে, চেষ্টা করলে বোধহয় তা-ও তিনি পারতেন।

এতে কী প্রমাণ হয়? প্রমাণ হয় না কি যে, শরৎচন্দ্র মনের দিক দিয়ে অতিমাত্রায় সক্রিয় ছিলেন? এই-যে গোটা উপন্যাসের কাঠামো আগে ভেবে নিয়ে তারপর লেখায় হাত দেওয়া— এ কি মনের অলস্যের নিদর্শন? মোটেই নয় বরং সম্পূর্ণ তার উল্টো। এর দ্বারা এই কথারই সার্থকতার পরিচয় মেলে যে, বড় বড় লেখকদের বেলায় আলস্যবিলাস আর অবসরবিনোদন অবিস্মরণীয় সৃষ্টি-কর্মের গর্ভসূচনার অতিমন্থর কিন্তু অত্যাবশ্যক প্রারম্ভিক পর্ব মাত্র।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর গোটা জীবনে অবিশ্রান্ত লিখে গেছেন সত্যি কথা কিন্তু তাঁর ভাবকল্পনা এতই উচ্চস্তরের যে তাঁর কাছে লেখা জিনিসটা মোটেই অভ্যাসগত বা যান্ত্রিক ব্যাপার ছিল না, ছিল সৃষ্টির লীলা, ছিল অফুরন্ত আনন্দের উৎস। সংসারের উষর বাস্তবতা ও তজ্জনিত যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি লাভের একটি নিশ্চিত উপায় ছিল তাঁর সাহিত্যকর্ম— তা ছিল তাঁর মুক্তির প্রকরণ। যান্ত্রিক লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মূলেই পার্থক্য। অর্থকরী প্ররোচনা, অভ্যাসের যান্ত্রিক আনুগত্য, ক্রমাগত লিখে ও বই ছাপিয়ে লেখকরূপে নিজের অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা— এ সব রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অবান্তর প্রসঙ্গ ছিল। যে উচ্চ কবি-কল্পনা ও ঐকান্তিক সৃষ্টির আকূতিতে সর্বদা তিনি বিভোর হয়ে থাকতেন, তাঁর কাব্য ও সাহিত্য তারই নৈমিত্তিক ফসল মাত্র; কাব্যগ্রন্থ রচনার জন্যই তিনি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেননি। রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখেছেন, কবিতা না লিখে তিনি থাকতে পারেননি বলে। নিরন্তর সৃষ্টির লীলায় তিনি ভরপুর হয়ে ছিলেন, তাই তাঁর সৃষ্টির এত প্রাচুর্য, বৈচিত্র্য আর সৌন্দর্য-সুষমা।

কিন্তু এই আপাত-অন্তহীন, বিরতিছেদ-বিবর্জিত কাব্যসাধনার ফাঁকে ফাঁকে রবীন্দ্রনাথ পড়েছেন বিস্তর, তার চেয়েও ভেবেছেন বেশী, তার চেয়েও হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছেন অনেক, অনেক বেশী মাত্রায়। প্রকৃতিকে কী গভীর ও নিপুণ-ভাবে কবি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন তার সহস্রবিধ পরিচয় তাঁর রচনায় ছড়িয়ে আছে। মেঘ ও রৌদ্রের লুকোচুরি খেলার সূক্ষ্মতম লীলা, হাওয়ায় দোলা আর বৃক্ষের পত্রমর্মরের অব্যক্ত সংকেত, বর্ষার অবিশ্রাম ধারাপতনের প্রাণ-আনচান করা শব্দে সংবেদনশীল অন্তরে যে গূঢ়-গহন ভাবের অনুরণন জাগে, কবিতায় ও গানে তাকে আভাসিত করে তোলবার চেষ্টার মধ্য দিয়ে বোঝা যায় সৃষ্টিকর্মের বাইরে লোকচক্ষুর অগোচর কবির যে জীবন, তা অবসরের আনন্দে কী নিশ্ছিদ্রভাবে ভরা ছিল। অবসরকে যদি তিনি কাজে না-ই খাটাবেন তবে প্রকৃতির এই বিচিত্র নর্মলীলা এবং তার ঋতুবদলের নাট্যের এত অজস্র খুঁটি-নাটি তিনি পর্যবেক্ষণ করলেন কখন এবং কীভাবে? কবির অপরিসীম সৃষ্টি-চাঞ্চল্যে ভরা অবসর-মুহূর্তগুলিই তাঁর সক্রিয় কাব্যজীবনের অপরিহার্য ভূমিকা রচনা করেছিল।

কিন্তু এই নিয়মের ব্যতিক্রম-দৃষ্টান্তও অনেক আছে। সব লেখকের সৃষ্টির

প্রকরণ এক নয়। বিশেষ, বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে একাধিক জন আছেন যাঁদের ধারাধরন একেবারে উল্টো গোত্রের। ফরমায়েসের তাগিদ আর ব্যস্ততার অঙ্কুশ-তাড়না ছাড়া জীবনে এঁরা এক লাইনও লিখেছেন কিনা সন্দেহ। তাঁদের জীবনে অবসরের কোন ভূমিকা ছিল না, থাকলেও তাঁরা তার সদ্ব্যবহার করতে পারেননি। ক্রমাগত উর্ধ্বশ্বাসে নিরবচ্ছিন্ন যান্ত্রিকতায় অনবরত লিখে যাওয়াই ছিল তাঁদের সাহিত্যিক নিয়তি। অবশ্য তাই বলে তাঁদের সহিত্যকর্ম যান্ত্রিকতামণ্ডিত ছিল না, ছিল তা লেখকভেদে কমবেশী উচ্চস্তরের সৃষ্টির লক্ষণে ভূষিত।

এই শ্রেণীর লেখকদের মধ্যে আমরা আলেকজাণ্ডার ডুমা, ব্যলজাক আর ডস্টয়েভ্স্কির নাম করতে পারি। ডুমা লিখতেন জানিয়ে-শুনিয়েই অর্থ-রোজগারের ধান্দায়, ব্যলজাক লিখতেন পাওনাদারদের ঋণশোধের প্রাণান্তকর তাগিদে এবং কতক পরিমাণে রাজকীয় জাঁকজমকে থাকবার মোহবশতও বটে। আর ডস্টয়েভ্স্কি ক্রমাগত লিখে গেছেন তাঁর জুয়ার নেশার মাশুল গুণবার চাপে পড়ে। শোনা যায় জুয়ার টেবিলে যে প্রচণ্ড ঋণ হয়েছিল তা শোধ করবার তাগিদে ডস্টয়েভ্স্কি এক পত্রিকা-সম্পাদকের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন, পত্রিকার ফি সংখ্যায়, 'ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট' উপন্যাসটি কিস্তি-ওয়ারিভাবে লিখে দেবেন ব'লে। বিশ্বসাহিত্যের এক শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের জন্ম জুয়ার নেশার সূত্রে, ভাবতেও অবাক্ লাগে।

আপাতদৃষ্টিতে দেখলে, ওই তিন লেখকের বেলাতেই অত্যন্ত স্থূল প্ররোচনা তাঁদেরকে সাহিত্যসৃষ্টিতে প্রবৃত্ত করেছিল। কিন্তু এটা সৃষ্টিকর্মের বহিরঙ্গ-বিচার মাত্র, তার দ্বারা সৃষ্টিরহস্যের মূলে যাওয়া যায় না। লেখকের মনোজীবনকে বুঝতে তাঁর প্রাণমনের লীলার আরও গভীরে প্রবেশ করা দরকার। হতে পারে ব্যলজাক পাওনাদার ঠেকাবার জন্য লিখতেন বা ডস্টয়েভ্স্কি জুয়ার রসদ সংগ্রহের তাগিদে লিখতেন, কিন্তু তাঁদের লেখায় তো সেই বৈষয়িকতার ছাপ মোটেই দেখতে পাওয়া যায় না। সেখানে সৃষ্টির আনন্দ-উত্তেজনারই একাধিপত্য। ব্যলজাক সম্বন্ধে শোনা যায়, তিনি রচনাকে নিখুঁত আর সর্বাঙ্গসুন্দর করবার জন্যে কোন আয়াস-প্রয়াসই যথেষ্ট বলে মনে করতেন না। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত গভীর যত্নে তিনি তাঁর রচনার সংশোধন কার্য করতেন— যতক্ষণ না তাঁর মন অনুমোদন করত ততক্ষণ তিনি তাঁর লেখা ধরে রাখতেন, ছাপতে দিতেন না।

এরকম শোনা যায়, বইয়ের প্রকাশ বাবদে পাবলিশারের কাছ থেকে তাঁর যে টাকা প্রাপ্য হত তার চেয়ে বেশী টাকা তাঁকে গুণে দিতে হত ছাপাখানাকে ক্রমাগত পাণ্ডুলিপি-পরিবর্তন আর প্রুফ-সংশোধন বাবদে অতিরিক্ত খরচের খাতে। এটা নিশ্চয়ই বৈষয়িকতার প্রমাণ নয়— গভীর শিল্প-সচেতনতারই প্রমাণ।

আসলে পত্রিকা-সম্পাদকের ফরমায়েসই বলুন আর পাওনাদার কিংবা জুয়ার কর্জ শোধের তাগিদই বলুন, নিছক এই মানদণ্ডে বড় লেখকদের সৃষ্টিকর্মের বিচার করতে যাওয়ার মতো ভুল আর-কিছু হতে পারে না। এসব বাইরের অঙ্কুশ-তাড়না মাত্র, তাতে শক্তিমান লেখকের চলার বেগ আরও প্রাণবন্ত হয়, সচল হয়। ফরমায়েসের চাপে সেরা লেখার সৃষ্টি হয়েছে, বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে এমন নজীর ভূরি-ভূরি।

এবার পড়ুয়াদের প্রসঙ্গে আসা যাক। লেখাপড়ার চর্চাকারীদের মধ্যে এমন বহু লোক আছেন— তাঁদের সংখ্যা অগুনতি বললেও চলে— যাঁরা জীবনভোর শুধু পড়েই যান, কিন্তু পারতপক্ষে দোয়াতে কলম ডোবাতে চান না। এক কলম লিখতে হলেই প্রচণ্ড আলস্য এসে তাঁদের ভর করে। পড়তে তাঁদের প্রভূত আনন্দ, বস্তুতঃ এমন অনেক মানুষ দেখতে পাওয়া যায় যাঁরা-এক মুহূর্ত বই ছাড়া থাকতে পারেন না। কিন্তু যা-ই এইসব গ্রন্থকীটদের দু-ছত্র লিখতে বলা হল অমনি যেন এঁদের মাথায় বাজ পড়ে। নানা ছলছুতোয় লেখার দায় থেকে অব্যাহতি লাভ করে পুনরায় পড়ার কোটরে মুখ লুকোন।

ছলছুতোর মধ্যে একটি বহুবিদিত ছুতো হল, আগে পড়ে-শুনে তৈরী হওয়া যাক, তারপর রচনাকার্যে হাত দেওয়া যাবে। কিনা, লেখার কাজ অতিশয় দায়িত্বপূর্ণ, তার জন্য যে মানসিক প্রস্তুতি দরকার তা আগে অধিগত করে নিয়ে তারপর লেখায় হাত দিলে তবেই লেখার দায়িত্ব সুষ্টুভাবে পালন করা সম্ভব, নচেৎ নয়।

কিন্তু খতিয়ে দেখতে গেলে, এ আলস্যের কুমন্ত্রণা ভিন্ন আর কিছু নয়। কবে লিখে-পড়ে, গ্রন্থসমুদ্র মন্থন করে, নিজেকে সব দিক্ দিয়ে প্রস্তুত করে তুলব, তার পর রচনা-কর্মে আত্মনিয়োগ করব— এই করতে গেলে সারা জীবনে লেখা আর হয়েই উঠবে না। কথায় বলে, 'গাইতে গাইতে গায়েন, বাজাতে বাজাতে বায়েন।" পড়তে পড়তেই লিখতে হবে, পাঠক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লেখক-জীবনের ভিত্ গড়ে

তুলতে হবে। হয়তো প্রথম প্রথম লেখার মধ্যে অনেক অসম্পূর্ণতা থাকবে, অনেক ভুলভ্রান্তি থাকবে— কিন্তু লিখতে লিখতেই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তার শোধন হতে থাকবে। লেখার অনলস চেষ্টা করাই লেখক হওয়ার শ্রেষ্ঠ ছাড়পত্র। কবে পড়েশুনে বিদ্যায় বুদ্ধিতে সর্বতোমুখী নৈপুণ্যের অধিকারী হব তার পর লেখায় হাত দেব— এই করতে গেলে আয়ু ফুরিয়ে যাবে, অনেক জীবনের আয়ুতেও ওই চৌকস হওয়ার অবস্থায় পৌছুনো যাবে না।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আর্নল্ড জোসেফ টয়েনবী এই-জাতীয় লিখন-বিমুখ নিখুঁত বনবার বাতিকওয়ালা গ্রন্থকীটদের দিনরাত বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকার অভ্যাসকে প্রশংসা তো করেনই নি, বরং তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন। বইয়ের পাতায় মুখ-গুঁজে-পড়ে-থাকা লিখন-পরাঙ্মুখের দল এই বলে আত্মপক্ষ সমর্থন করবার চেষ্টা করেন যে, নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধির দীনতা সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে বিনয়ের বোধ আছে বলেই তাঁরা সহসা লেখায় হাত দিতে যান না। কিন্তু টয়েনবী এই যুক্তিকে মোটেই আমল দেননি। তাঁর মতে, এ নম্রতা তো নয়ই, বরং সম্পূর্ণ তার উল্টো। নম্রতার ছদ্মবেশে এর মধ্যে উগ্র রকমের অহংকার লুকিয়ে আছে। অহংকার, আর দায়িত্ব এড়াবার মনোবৃত্তি। কাজ-ফাঁকি-দেওয়া রূপ কর্মশৈথিল্য। "An excuse for suspending the hard labour of intellectual activity".

টয়েনবী তাঁর স্বীয় জীবনের ঘটনার উল্লেখ করে বলেছেন, নানা অভিজ্ঞতার প্রসাদে প্রথম যেদিন তাঁর উপলব্ধি হল যে, কাজই জীবনের সারাৎসার, সেটা তাঁর জীবনের এক সন্ধিলগ্ন। সেদিন থেকে পড়া নয়, লেখাতেই তিনি তাঁর সবচেয়ে বেশী মনোযোগ ও উদ্যম নিয়োগ করেছিলেন। তিনি এটা নিঃসংশয়েই উপলব্ধি করেছিলেন যে পড়ার কাজ যতই বাঞ্ছিত আর আদরণীয় হোক, লেখার কাজ তারও চেয়েও বহুগুণ বেশী কঠিন ও বহুগুণ বেশী সৃষ্টিলক্ষণাক্রান্ত। পড়ুয়া এই বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারেন যে, তাঁর কাজ বুদ্ধিবৃত্তি চালনার কাজ কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তির কাজ হলেও তার মধ্যে কোথায় যেন একটা আলস্যের প্রশ্রয় আছে। মুদ্রিত অক্ষর পংক্তির উপর দিয়ে দৃষ্টিসঞ্চালন করে যেতে গভীর অভিনিবেশের প্রয়োজন হয় না। লেখায় শেষোক্ত উদ্যমের প্রয়োজন পদে পদে। সুতরাং দুইয়ের ভিতর কোন তুলনাই চলতে পারে না।

ইংরেজীতে একটা কথাই আছে যে, 'Writing makes a man perfect',

লেখা মানুষের ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণ করে। কেন এই কথা বলা হয়? বলা হয় এইজন্য যে, লিখনচর্চার মধ্য দিয়ে ভাবনার জট খুলে যায়, অস্পষ্ট চিন্তা স্পষ্টীকৃত হয়, চিন্তাকে গুছিয়ে লিখবার শিল্প আয়ত্ত করবার চেষ্টা করতে করতে সেইসঙ্গে বলার শিল্পও অবলীলাক্রমে আয়ত্ত হয়ে যায় এবং বলার কৌশল অধিগত হবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিত্বের গোত্রবদল হতে শুরু করে। আমাদের চিন্তার মধ্যে যে কত অস্বচ্ছতা, কত অস্পষ্টতা লুকিয়ে থাকে তা কাগজের পৃষ্ঠায় চিন্তা লিপিবদ্ধ করবার চেষ্টার আগে পর্যন্ত আমরা টের পাই না। যা-ই লিখতে বসি তখন বুঝি, মনোগত ভাবনা-চিন্তাকে লেখায় প্রাঞ্জলভাবে পরিবেশন করা কী শক্ত ব্যাপার। লিখতে না বসা পর্যন্ত ভাবনার আড়মোড় সহজে ভাঙে না, তার কোণা ও ভাঁজগুলি মসৃণ হয় না— যতই কেন না আমরা এই অগ্রিম আত্মপ্রসাদকে প্রশ্রয় দিই যে, লেখবার উপকরণরূপে আমি মনে-মনে যা ভেবে রেখেছি তা সর্বাঙ্গ-সুন্দর, সর্বব্যাপক, সর্বত্রুটিমুক্ত। কিন্তু লিখতে গিয়েই দেখি ওই আত্মপ্রসাদের কোন ভিত্তি নেই, চিন্তার মধ্যে কত যে ত্রুটিবিচ্যুতি লুকিয়ে ছিল তার আর সীমা-সংখ্যা নেই। তাসের ঘরের মতোই তখন সে আত্মপ্রসাদের সৌধ ভেঙে পড়ে।

উচ্চ চিন্তা, উচ্চ ভাব নিরন্তর মনের ভিতর মন্থন করলে ব্যক্তিত্বের উপর তার ছাপ পড়ে, ব্যক্তিত্ব পরিশুদ্ধ হয়। চিন্তাকে বৈজ্ঞানিক আর শিল্পসম্মত পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করবার চেষ্টা করলে চিন্তার শ্লথতা ও আলস্য, যুক্তির অসংগতি, চিন্তার ধোঁয়াটেপনা ইত্যাদি শতবিধ দোষ দূর হয়। এই প্রক্রিয়ার অনুশীলন হতে হতে শেষ অবধি এমন একটা অবস্থা আসে যখন লেখকের ব্যক্তিত্বেরই গোত্রবল হয়ে যায়, যার কথা পূর্বেই বলেছি।

পড়ুয়াদেরও মধ্যে অনেকে আছেন যাঁরা পঠিত বই বা রচনার সম্পর্কে অব-লীলায়িত সমালোচনায় প্রলুব্ধ হন। সমালোচনার মাধ্যমে এমন একটা ভাব প্রকাশ করেন যেন তাঁদের ওই বই বা রচনা যদি লিখতে বলা হত তা হলে এর চেয়ে ঢের ঢের নিপুণভাবে তাঁরা সেটা লিখতে পারতেন। কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই এটা আত্মস্তোক ভিন্ন আর কিছু নয়। লিখতে বসলেই বুঝতে পারতেন কত ধানে কত চাল হয়। কোন-কিছু মনে ভাবা এক কথা আর তাকে কলমের মুখে প্রকাশ করা আর-এক কথা। সাহিত্যশিল্পে রূপকর্ম বা externalization-এর কাজকে যে এত গুরুত্ব দেওয়া হয় তা এই-জন্যই দেওয়া হয় যে, মনের আকাশে

অস্পষ্ট নীহারিকাপুঞ্জ রূপে ভাসমান ভাবনা-চিন্তার বিশেষ কোন দাম নেই যতক্ষণ না তাদের স্পষ্ট জ্যোতিঃদেহ রূপে সুগঠিত ও সুসংহত করা হচ্ছে। লেখায় এই বাঞ্ছিত কাজটি সাধিত হয়, তাই তার এত মূল্য।

অনবরত বই পড়া, না-খেয়ে দেয়ে কেবলই বইয়ের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে থাকা, বইয়ের পর বই ক্রমাগত শেষ করে যাওয়া— বুদ্ধিবৃত্তির চর্চার নামে এ আসলে এক ধরনের আলস্যের ব্যায়াম মাত্র। আলস্যের ব্যায়াম এ-কারণে বলছি যে, এতে পড়ুয়ার মন মুদ্রিত অক্ষর-পংক্তিসজ্জার উপর-উপর ছুঁয়ে যায় মাত্র, চিন্তা কোথাও সংহত হবার বা দানা বাঁধবার অবকাশ পায় না। পড়ার কাজ পরিশ্রমের কাজ বটে, কিন্তু যদি তার পিছনে সুস্পষ্ট কোন লক্ষ্যের দ্যোতনা না থাকে তা হলে সে পরিশ্রম লঘু পরিশ্রমের কোঠায় গিয়ে পড়ে— এমন পরিশ্রম যা করতে চিত্তের সমস্ত বৃত্তিকে সংহত করতে হয় না, যার জন্য তাবৎ উদ্যমকে একমুখী করবার প্রয়োজন হয় না। লেখাপড়া জানার প্রাথমিক বাধা উত্তীর্ণ এবং জ্ঞানের একটা স্বাভাবিক তৃষ্ণার অধিকারী হলে অনেকেই এই-জাতীয় পড়ুয়া-বৃত্তিতে, বিশেষ আয়াস স্বীকার না করেই অনেক দূর অগ্রসর হতে পারেন। আরাম-কেদারায় হেলান দিয়ে বসে বা বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে বইয়ের অক্ষরপংক্তির উপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে যাওয়া এমন কি কঠিন কাজ? এমনতর পড়ুয়াবৃত্তির দ্বারা প্রকৃত বিদ্বানের স্বরূপ নির্ণীত হয় না, হওয়া উচিতও নয়।

জ্ঞানী ব্যক্তিরা বই-পড়ার চেয়েও সুগ্রথিত চিন্তার অভ্যাসকে বেশী মূল্য দেন। আবার চিন্তার অভ্যাসের চেয়েও অনেক বেশী মূল্যবান হল চিন্তা লিপিবদ্ধ করবার অভ্যাস। কোন ব্যক্তি প্রকৃতই বিদ্বান কিনা তা বোঝবার উপায় তাঁর পঠিত গ্রন্থরাজির পরিমাণের নিরূপণ নয়, তিনি দেশবাসীকে সুগঠিত চিন্তার আকারে কতটা কী দিয়েছেন তার নির্ণয়। অনেক সময় এ রকমের এক-একটা 'মীথ' বা কিংবদন্তী বাজারে চালু হতে দেখা যায়, অমুক ব্যক্তি মস্ত বড়ো বিদ্যের জাহাজ, তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে গিয়ে দেখ বইয়ে বইয়ে আলমারী ঠাসা, দিনরাত তিনি বই পড়ায় নিবিষ্ট হয়ে আছেন তো আছেনই, মহাদেবের ধ্যান ভাঙানোর চাইতেও তাঁর পুস্তক-পাঠের ধ্যান ভাঙানো কঠিন। কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করা যায় তাঁর এই পর্বতপ্রমাণ পুস্তক-পাঠের সুফলরূপে তিনি দেশবাসীকে কী জিনিস উপহার দিয়েছেন, তা হলে দেখা যাবে যে ওই ক্ষেত্রে ফল শূন্য। এমনতর

অসার বিদ্যাবত্তা দিয়ে আমাদের কী লাভ, যে বিদ্যাবত্তা প্রায়োগিক পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ, সৃষ্টিশীল বৌদ্ধিক তৎপরতার চেষ্টারহিত? কার্যক্ষেত্রে অধীত বিদ্যার পরীক্ষা-নিরীক্ষাই যদি না হল তো তেমন বিদ্যার কী সার্থকতা? অথচ, বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এ-জাতীয় অপরীক্ষিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বিদ্বানের সংখ্যাই বেশী। তাঁদের চিন্তা কী, বক্তব্য কী, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী কী, দেশ তার কিছুই জানল না, শুধু মুখে মুখে প্রচার এমন বিদ্বান আর হয় না। নিছক পড়ুয়াবৃত্তি-সার এমন নিষ্ফল বিদ্বান দিয়ে আমাদের কাজ নেই। দূর থেকেই তাঁদের দণ্ডবৎ করি।

যে সকল মজ্জাগত গ্রন্থকীট সমস্ত বিদ্যা অধিগত করার পর বই লিখবেন বলে মনস্থির করে বসে আছেন, তাঁদের অহংকার অতি প্রচণ্ড। যেন চেষ্টা করলেই সমস্ত বিদ্যা এক জীবনে অধিগত করা যায়। এই সব সর্বাঙ্গসুন্দরতার বাতিকওয়ালা পড়ুয়াদের কে বোঝাবে যে, সকল প্রকারের বিদ্যা এক জীবনে কেন, বহু শত জীবনেও অধিগত করা যায় না? বরং জ্ঞানের পথে যত অগ্রসর হওয়া যায় তত এই বিনম্র বোধ বাড়তে থাকে যে, আমরা কত কম জানি এবং সারা জীবন চেষ্টা করলেও জ্ঞানের সামান্য অংশই মাত্র জানতে পারি। (নিউ-টনের জ্ঞানসমুদ্রের তীরে নুড়ি কুড়নোর উপমাটা এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক।) তবে কেন এই সর্ববিদ্যাকল্পদ্রুম হওয়ার অসম্ভব, অবিশ্বাস্য, হাস্যকর চেষ্টা? তার চেয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই কাজেও লিপ্ত হওয়ার উদ্যোগ করা উচিত নয় কি?— লেখার কাজ, বিদ্যাদানের কাজ, বক্তব্য ও ভাবপ্রচারের কাজ?

আসলে টয়েনবীর একথাই যথার্থ যে, সর্ববিদ্যাবিশারদ হওয়ার চেষ্টা, খতিয়ে দেখলে, দায়িত্ব এড়ানোর চেষ্টার নামান্তর। এ আলস্যের ছলনা, অহংকারের ছদ্মবেশ। লেখা যাঁরা ভালবাসেন, তাঁরা কখনই যেন এই কাজ-ফাঁকি দেওয়া বিদ্যার কুহকে না মজেন।

লিখিয়ে এবং পড়ুয়ার আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখাবার চেষ্টা করেছি নিছক লিখিয়ে হওয়াটা যেমন আদর্শ অবস্থা নয়, তেমনি নিছক পড়ুয়া হওয়াটা কোন কাজের কথা নয়। ওই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য হলে তবেই সেটা বাঞ্ছিত অবস্থা হয়ে উঠতে পারে। অর্থাৎ সার্থক লেখার ভূমিকা হিসাবে চাই অবসর ও আলস্যের অগোচর প্রস্তুতি, আবার সার্থক পড়ুয়া হতে হলে চাই অধ্যয়ননিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে রচনারও অনুশীলন। প্রথমের বেলায় শর্তাধীন আলস্য অভিনন্দনযোগ্য;

দ্বিতীয়ের বেলায় আলস্য ঝেড়ে ফেলে সৃষ্টিশীল কাজে লিপ্ত হওয়াটাই পন্থা। আমাদের এই মন্তব্য প্রথম দৃষ্টিতে আপাতবিরোধময় বলে মনে হতে পারে, কিন্তু লিখিয়ে এবং পড়ুয়ার কাজের প্রকৃতি বিচার করলেই আর এ মন্তব্য বিরোধাভাস-যুক্ত বলে মনে হবে না। মন্তব্যটিতে দুই কাজের ত্রুটি দূর করে দুইয়ের গুণ সমন্বিত করবার চেষ্টা করা হয়েছে।

লিখিয়ে এবং পড়িয়ে ছাড়া আর এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁরা লিখতেও চান না, পড়তেও চান না, তাঁরা সরস বাক্যালাপের দ্বারা মানুষের হৃদয়মন জয় করতে চান। এঁরা প্রায়শই হন সফল সংলাপকুশল, কথোপকথনশিল্পী, ইংরেজীতে যাকে বলে conversationalist বা table talker। বাক্যের সাহায্যে উত্তর-প্রত্যুত্তরদান ক্ষমতার এঁরা হন সিদ্ধশিল্পী—repartee ও retort-এ এঁদের জুড়ি খুঁজে পাওয়া যায় না। লেখা বা পড়া দুটিই আয়াসসাধ্য কাজ, তার ধারে কাছে এঁরা ঘেঁষেন না; পরিবর্তে সহজে চিত্তজয়ের যে পথটি এঁরা বেছে নিয়েছেন তাতেই সমগ্র উদ্যম কেন্দ্রীভূত করেন। এঁরা সস্তায় কিস্তিমাতের শিল্পী, আয়াস প্রয়াসে বিশ্বাস এঁদের কম। এঁদের মনে প্রায়শঃ যে ভাব বিরাজ করে ডক্টর জনসন তাঁর একটি লেখায় তাকে ব্যক্ত করেছেন এইভাবে—

Perhaps no kind of superiority is more flattering or alluring than that which is conferred by the powers of conversation, by extemporaneous sprightliness of fancy, copiousness of language and fertility of sentiment— অর্থাৎ সংলাপের শক্তি, স্বতঃস্ফূর্ত হৃষ্ট কল্পনা-কুশলতা, বাক্যের অজস্রতা আর ভাবাবেগের উর্বরতা— এগুলির দ্বারা যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা যায় আর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্বই বুঝি তার চেয়ে আত্মতুষ্টিকর বা লোভনীয় নয়। এই ভাবটিকে বিস্তার করে জনসন তার পরেই বলেছেন যে, প্রতিভা প্রয়োগের অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রশংসার বেশীর ভাগই থাকে অজানা ও অপ্রাপ্ত, প্রশংসা পাওয়া গেলেও তাকে চোখে দেখা যায় না বা ভোগ করা যায় না। যেমন লেখক যিনি, তিনি বিস্তৃত ক্ষেত্র জুড়ে তাঁর নাম বিস্তার করেন কিন্তু তাঁর এই নামের সুফল তিনি প্রত্যক্ষভাবে সামান্যই ভোগ করতে পান, নাম থেকে ফায়দা উঠানো তো আরও পরের কথা। তিনি এমন এক বিশাল রাজ্যের মালিক যে রাজ্যের প্রজাদের উপর তাঁর প্রভুত্ব নামমাত্র এবং যে রাজ্যের প্রজাদের রাজাকে শুল্ক দিতে হয় না। কিন্তু সংলাপকুশল বা ব্যঙ্গরসিক

যিনি, তাঁর কথা স্বতন্ত্র। তাঁর সবকিছুই হাতে হাতে নগদ বিদায়ের তুল্য আশু প্রাপ্তি— কোন কিছুই কালকের জন্য বা দূরের জন্য ফেলে রাখা নয়। তাঁর সকল কৃতিত্বের দীপ্তি তাঁরই উপর প্রতিফলিত, যে আনন্দ তিনি লোককে বিলান সে আনন্দের চতুর্গুণ তিনি নিজের দিকে আকর্ষণ করেন ; তিনি এই দেখে আত্মসন্তুষ্টি লাভ করেন যে তাঁর শক্তি লোকে অপ্রতিবাদে স্বীকার করে নিচ্ছে, তাঁর প্রতি বন্ধুত্বের আবেগ উচ্ছ্বাসে রূপান্তরিত হচ্ছে, মনোযোগ প্রশংসায় ফেটে পড়ছে।

একেই বলে ধার দিয়ে সুদে আসলে আদায়। জনসন এমন কথা বলতেই পারেন, কারণ তিনি স্বয়ং ছিলেন এক দুর্ধর্ষ সংলাপশিল্পী। তাঁর মুখনিঃসৃত বাক্য শোনবার জন্য সর্বদা লোক তাঁর চারপাশে ঘিরে থাকত। উত্তর-প্রত্যুত্তরের শিল্পের তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় শিল্পী। তা বলে এমন মনে করবার কারণ নেই যে, তিনি কেবল নগদ বিদায়ের নীতিতেই বিশ্বাস করতেন। যে ডক্টর জনসন আলাপ আলোচনার টেবিলে শ্রোতাকে বুদ্ধির জৌলুষে মাতিয়ে রাখতেন সেই ডক্টর জনসনই কঠিন পরিশ্রমে **A Dicti onary of the English Language** (১৭৫৫) ও দশ খণ্ড **Lives of the Poets** (১৭৭৯-৮১) লিখেছিলেন। এই অমিতশক্তিধর প্রচণ্ড পরিশ্রমী বিদ্বান লেখকের বেলায় সাবলীল কথোপকথনের দ্বারা আসর জমানো অবসরবিনোদন বা বিশ্রামেরই একটা রকমফের ছিল মাত্র, যা সার্থক লেখকমাত্রের পক্ষেই অপরিহার্য।

কলমচালিয়ে বনাম সাহিত্যিক

'সাহিত্য' কথাটা সম্বন্ধে সমাজে অনেক ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে। 'মানব-সমাজের সহিত সহিতত্ব' 'পরহৃদয়ের সহিত আত্মীয়তা' এসব সংস্কৃত অলঙ্কারোচিত অর্থে সাহিত্য কথাটা প্রযুক্ত হয় বটে কিন্তু কার্যতঃ অর্থটি আরও অনেক সংকুচিত করে দেখা হয়। আর সেই সংকুচিত অর্থ সাহিত্য বা সাহিত্যিকের পক্ষে যে খুব বেশী মর্যাদাসূচক এমন বলা চলে না।

'সহিতত্বের' ধারণা সাহিত্যের ক্ষেত্র থেকে অনেক দিন লোপ পেয়ে গেছে। আমরা যখন দিক্‌পাল সাহিত্যিকদের সাহিত্যকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করি মাত্র তখনি ঐ মহৎ ভাবদ্যোতক কথাটিকে আলোচনার ক্ষেত্রে টেনে আনি, অন্যান্য লেখকদের বেলায় ভিন্নতর এবং নিম্নতর মানদণ্ডের প্রয়োগ করা হয়। 'সাহিত্যিক' বলতে সচরাচর এমন এক মানুষকে বোঝায় যে-মানুষ লেখাপড়া ভালবাসে, কথা সাজিয়ে রচনা নির্মাণ করে আনন্দ পায়— তা সে গদ্যেই হোক আর পদ্যেই হোক— এবং রচনানির্মাণের একটা মোটামুটি আঙ্গিক যে অনুশীলনের দ্বারা আয়ত্ত করেছে। এই ধারণা সমাজে বহুলাংশে সক্রিয় বলে বিয়ের পদ্য লেখাতে সাহিত্যিকের ডাক পড়ে, যে-কোনরূপ গণ-দরখাস্তের বা সংবর্ধনা-অনুষ্ঠানের মানপত্রের মুসাবিদা করতেও প্রয়োজন হয় সাহিত্যিকের কলমের এবং খবরের কাগজের পাতা ভরাতেও দেখা যায় সাহিত্যিকের উপরে নির্ভরতাই সব চেয়ে বেশী। অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে তথাকথিত কলমচালিয়ে রূপেই সাহিত্যিকের যা-কিছু পরিচয় ও প্রতিষ্ঠা। অন্যান্য দশটা বৃত্তিজীবী মানুষ যেমন তাদের নিজ নিজ বৃত্তিতে অর্জিত অভিজ্ঞতা ও কর্মকুশলতা খাটিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে তেমনি সাহিত্যসেবীও তার কথা সাজাবার কৃতিত্বের দরুনই যেন মুখ্যতঃ জীবিকার্জনের অধিকারী।

এই দৃষ্টিতে দেখলে সাহিত্যিকের সঙ্গে করণিকের কাজের খুব বেশী তফাত থাকে না এবং যদি-বা থাকে তা নামমাত্র গণ্য করা যায়। আরও খানিকটা নিষ্করুণ হয়ে বলা যায়, এই দৃষ্টিতে 'কম্পোজার' আর 'কম্পোজিটর'-এর মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। প্রেসের কম্পোজিটরের কাজ হল সীসার অক্ষর গেঁথে গেঁথে গ্যালি ভরিয়ে তোলা; আর সাহিত্যিকের বেলায় কাজটা

দাঁড়ায় কথা গেঁথে গেঁথে রচনার মূর্তি তৈরি করা। যদি দুইয়ের কাজের স্বরূপের মধ্যে একটা মূলগত পার্থক্য গোড়াতেই স্বীকার করে না নেওয়া হয় এবং যদি কথা-গাঁথা কাজটার একটা গূঢ় তাৎপর্য কিছু না থাকে তাহলে বাস্তবিক এই দুই ধরনের কাজের মধ্যে বড় একটা তফাত করা যায় না। রচনা যে তার মূল্য পায় সে কথার পর কথা সাজিয়ে একটা রচনার কাঠামো দাঁড় করাবার কৃতিত্বের কারণে নয়, সে রচনার অন্তর্নিহিত বক্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গীর স্বাতন্ত্র্যের জন্য। অবশ্য কথা সাজাবার বিন্যাস প্রক্রিয়ারও একটা দাম আছে যার দ্বারা রচনার 'ফর্ম' বা বহিরঙ্গ উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয় কিন্তু সেটাই রচনার সব বা প্রধান বিষয় নয়, রচনার অন্তরঙ্গ দীপ্তি যা বিষয়মহিমায় প্রকট হয় সেইটেই হল আসল কথা।

সাহিত্যের বিষয়গৌরবকে আড়াল করে তার বক্তব্যকে বা দৃষ্টিভঙ্গীকে অপ্রাধান্য দিয়ে সাহিত্যের এই যে নিছক লিখনপটুত্বকে প্রাধান্য দেওয়া— এটা সাহিত্যিকের ভূমিকা ও ব্যক্তিত্বের যথার্থ উপলব্ধির পক্ষে সহায়ক নয় মোটেই। মর্যাদাসূচকও নয়। আমাদের দেশে সাহিত্যিকের মর্যাদা যে এখনও সমাজ কর্তৃক তুল্যরূপে স্বীকৃত হয়নি (মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রমুখ রথী-মহারথীদের কথা অবশ্য আলাদা।) তার একটা কারণ সাহিত্যিকের কর্মের এই খণ্ডিত, সংকীর্ণ মূল্যায়ন। বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে 'সহিতত্ব' প্রতিষ্ঠার যে উদার ধারণা 'সাহিত্য' কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থের মধ্যে নিহিত আছে তা অনেককাল আমাদের মন থেকে হারিয়ে আছে, এখন সাহিত্যকে লেখনী-চালনার একটি অধ্যবসায়ী ক্ষেত্র ছাড়া আর বিশেষ কিছুই মনে করা হয় না। 'সৃষ্টি'র প্রশ্ন এই প্রসঙ্গে তোলা কম বেশী নিরর্থক, কেন না সৃষ্টিধর্মিতার লক্ষণ দিয়ে সাহিত্যকে বোধ হয় আর আজকাল তেমন আন্তরিকভাবে বিচার করা হয় না; বিচার করা হয় রচনার পরিমাণস্ফীতি দিয়ে, বাহ্যিক আঙ্গিকগত কুশলতা দিয়ে, শব্দবিন্যাসের চাতুর্য দিয়ে, এক কথায় স্রেফ কথা সাজাবার নৈপুণ্যের মানদণ্ডে।

অবশ্য সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্বন্ধে এই মনোভাব গড়ে ওঠার জন্য সমাজ যত-না দায়ী তার চেয়ে বেশী দায়ী সাহিত্যিক স্বয়ং। সাহিত্যিক অর্থাৎ বর্তমান কালের লিখনরত সাহিত্যিক— বিগত কালের সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে এ কথা প্রযোজ্য নয়। তাঁরা আর যা-ই হোন-না কেন, পেশাদার কলমচালিয়ে ছিলেন না। যখন থেকে সমাজে নিছক কলম চালিয়ে রূপে সাহিত্যিকের পরিচয়

হতে থাকল তখন থেকেই সাহিত্য ও সাহিত্যিকের মানাপকর্ষের সূচনা।

'এটা সাহিত্যের গণতন্ত্রের যুগ' এ রকম বলা হয়ে থাকে। এখন অনেক অনেক লেখক, অনেক অনেক লেখার পরিমাণ। সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে লেখকের আবির্ভাব হওয়ায় সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের পরিধির অনেক বিস্তার হয়েছে। পূর্বে অভিজাত ও উচ্চমধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিনিধিদের মধ্যে থেকেই মুখ্যতঃ লেখকের অভ্যুদয় হত, এখন আর সে কথা বলা চলে না। এখন উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, এমন কি কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর ভিতর থেকেও লেখক বেরিয়ে আসছেন। সুতরাং এ যুগে সাহিত্যে যে গণতান্ত্রিকতার পর্বের সূচনা হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এবং বিষয়বস্তুতেও যে গণতান্ত্রিক প্রসঙ্গ ও গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণার উল্লেখ বেশী দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সে কথাও অস্বীকার করা চলে না।

এ সবই উৎসাহব্যঞ্জক লক্ষণ। কিন্তু এই গণতান্ত্রিকতা একটা মূল্যের বিনিময়ে আহরিত হয়েছে বলে সন্দেহ হয়। সাহিত্যে অভিজাত সম্প্রদায়ের সর্বাধিপত্য খারাপ জিনিস কিন্তু সাহিত্যের আভিজাত্য বস্তুটি খারাপ নয়। সাহিত্যের স্বধর্ম রক্ষায় এই আভিজাত্য প্রতিকূলতা তো করেই না বরং সবিশেষ সহায়তা করে। আমরা যে 'সহিতত্ত্বের' কথা বলছি ঐ 'সহিতত্ব' সাহিত্যের আভিজাত্যের ধারণার সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু এখন সাহিত্যে 'গণতান্ত্রিক' কলমচালিয়েরা দলে ভারী হওয়ায় সাহিত্য থেকে আভিজাত্য তথা 'সহিতত্বের' ধারণার বালাই ঘুচে গেছে। এখনকার পরিভাষা অনুযায়ী, যে ব্যক্তি সাহিত্যকে একটা পবিত্র ব্রত মনে করে জীবন ভোর দুরূহ সাধনায় নিরত থাকেন তিনিও 'সাহিত্যিক' নামে পরিচিত, আবার যে লেখক তিনটে যৌনগন্ধী তরল গল্প বা কবিতা লিখে সাপ্তাহিকের পাতায় নাম কিনেছেন তিনিও 'সাহিত্যিক'। সাহিত্যক্ষেত্রে উচ্চ-নীচের ভেদ নেই, সাহিত্যব্রতীর সঙ্গে সাহিত্য-লিখিয়েকে মাঝারিপনার এক সমভূমিতে এনে দাঁড় করিয়ে বড়-ছোটর মধ্যে পার্থক্যরেখা সব মুছে দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কলমচালিয়েরা সংখ্যা-গরিষ্ঠতার জোরে সত্যিকারের সারস্বতব্রতধারী সাহিত্যসেবীকে কোণঠাসা করবার উপক্রম করেছেন। সাহিত্যে গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতিষ্ঠায় অন্য দিক থেকে হয়তো কিছু কিছু লাভ হয়েছে, কিন্তু এই এক বিষময় ফল দেখতে পাচ্ছি যে, নূতন ব্যবস্থাধীনে মুড়ি-মিছরির বাজারদর এক হতে চলেছে। মুড়ি-মিছরির

এই ক্ষতিকর সমীকরণ সর্বপ্রযত্নে রোধ করা দরকার।

মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথকে আমরা কলমচালিয়ে রূপে গণ্য করবার কথা কল্পনাও করতে পারি না, যদিও প্রত্যেকেই তাঁরা লেখনীকেই মূল উপজীব্য করে সমাজ-সংসারে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। কিন্তু এখন সাহিত্য-ক্ষেত্রে এমনি আবহাওয়া যে, বড় থেকে ছোট সকলেই কলমচালিয়ে রূপে গণ্য এবং সেই ভাবেই তাঁদের সামাজিক মূল্য নির্ধারণ করা হয়। কলমচালিয়ের সামাজিক মূল্য খুব বেশী হতে পারে না, বলাই বাহুল্য।

যদিও আক্ষরিক লেখাপড়ার বিস্তৃতি এবং গ্রন্থপাঠের অভ্যাসের প্রসারের ফলে সাহিত্যিকের আর্থিক অবস্থা এখন পূর্বের চেয়ে ভাল কিন্তু যে অনুপাতে তাঁর আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে সেই অনুপাতে তাঁর সামাজিক মর্যাদার মান নেমে গেছে। এখন সাহিত্যিক বললে যে ব্যক্তির চিত্র মনশ্চক্ষে সচরাচর ভেসে ওঠে তিনি হয় সংবাদপত্রের ভাড়াকরা লেখক, নয়তো মন্ত্রিতোষণে ব্যস্ত কোন বৈষয়িকলাভপ্রত্যাশী পাটোয়ারী বুদ্ধিসম্পন্ন লিখনব্যবসায়ী। সাহিত্যকে নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্যরূপে জ্ঞান করে তার অতন্দ্র ধ্যান, মনন ও অনুশীলনের যে রেওয়াজ পূর্ব-পূর্ব যুগের লেখকদের মধ্যে সক্রিয় ছিল তার অবলোপ ঘটতে চলেছে। এখন সাহিত্যিকে আর রাজনীতিকে, সাহিত্যিকে আর ব্যবসায়বুদ্ধি-সার প্রকাশকে, সাহিত্যিকে আর স্থূলভাবসম্পন্ন সংবাদপত্র-মালিকে গলায় গলায় খাতির। যে লেখক যত বেশী রাজনীতির কর্তাব্যক্তিস্থানীয় হোঁৎকা পার্টি-ম্যানেজার কিংবা সাহিত্য-অচেতন মন্ত্রীর গুণগান করতে পারবে তার তত বেশী জয়জয়কার। কেননা যুগটাই হল সংবাদপত্রের আর সংবাদপত্র যে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ঐ শেষোক্ত শ্রেণীর লোকদেরই হাতে-ধরা হয়ে চলতে পছন্দ করে সে কথা কারও অবিদিত নেই। এখন সংবাদপত্রের সঙ্গে ভাব জমিয়ে যে লেখক চলতে না জানে তার কোন ভবিষ্যৎ নেই। লেখকদের মধ্যে যাঁরা হিসাবী বুদ্ধির অধিকারী— অধিকাংশই এই গোত্রের— তাঁরা এটা বিলক্ষণ জানেন বলেই আগু বাড়িয়ে সংবাদপত্রের সঙ্গে খাতির জমাতে ব্যস্ত। এঁরা আখের গুছোবেন না তো কে গুছোবে?

এই তো হল আমাদের লেখকদের চরিত্র। এ রকম অবস্থায় লেখকদের কলমচালিয়ে হওয়া ছাড়া আর কীই বা গতি! পূর্বেই বলেছি বর্তমান কালের সাহিত্যিক সম্প্রদায় এই হীনাবস্থার জন্য নিজেরাই সবচেয়ে বেশী দায়ী। তাঁরাই

তাঁদের অপমান করেন সকলের অপেক্ষা অধিক। তাঁরা দেবী সরস্বতীর উপাসনাকে কবেই শিকেই তুলে রেখেছেন, এখন শুধু অক্ষর সাজাবার ও পাতা ভরাবার খেলা। তাঁরা আজকাল সাহিত্যের স্বধর্মে স্থিত থাকবার পরিবর্তে প্রথমতম সুযোগেই রাজনীতিওয়ালা, খবরকাগজওয়ালা ও প্রকাশনব্যবসায়ীর কাছে আত্মসমর্পণ করেন।

মনে হয় বাংলা সাহিত্যের এই-যে অবস্থা তা একেবারে পূর্ব-নজিরবিবর্জিত নয়। ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সেখানে আঠারো শতক থেকেই 'স্ক্রাইব,' 'কুইল-ড্রাইভার' বা 'হ্যাক্-রাইটার'-এর ঐতিহ্যের প্রচলন হয়েছিল। অ্যাডিসন, ড্রাইডেন, ষ্টিল, সুইফ্ট, ডিফো প্রমুখ উত্তর-কালের খ্যাতনামা লেখকেরা তাঁদের সাহিত্যজীবনের আদি পর্যায়ে কোন-না-কোন অর্থে কোন-না-কোন ভাবে 'স্ক্রাইব' অর্থাৎ কলমচালিয়ে লেখক ছিলেন। সমাজে যখন যে প্রশ্ন লোকের মনোযোগের সামনে আসত ও আলোড়ন সৃষ্টি করত তাকে কেন্দ্র করেই তাঁদের কলম ছুটত। সে সব লেখার পেছনে একদিকে ছিল সংবাদ-বা সাময়িকপত্র-সম্পাদকদের ফরমায়েসের তাগিদ, অন্যদিকে জীবিকার তাড়না। অর্থাৎ 'হ্যাক-রাইটার'-এর সমস্ত লক্ষণ তাঁদের লেখায় পরিস্ফুট ছিল। মেকলের ইংলণ্ডের ইতিহাস পাঠে জানা যায়, ড্রাইডেনকে মধ্যমণিরূপে ঘিরে ট্যাভার্ন অর্থাৎ কফি কি পান শালায় লেখকদের আড্ডা বসত এবং সে-সব লেখকদের বেশীর ভাগই সংবাদ ও সাময়িকপত্রের ভাড়া-খাটিয়ে সাহিত্যযশোপ্রার্থী তরুণের দল। ড্রাইডেনের সম্পর্কে এই সব নবীন বা হবু লেখকদের এমনই ছিল বীরপূজার মনোভাব যে ড্রাইডেনের নস্যির কৌটো থেকে কেউ এক টিপ নস্যি পেলে আপনাকে ধন্য মনে করত। অথচ ড্রাইডেন তখন একজন নামী স্ক্রাইব মাত্র। তাঁর কবিখ্যাতি আরও পরে প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্য যে কজন লেখকের নাম করা হল তাঁরাও গোড়ায় স্ক্রাইব ভিন্ন আর-কিছু ছিলেন না। পরে অবশ্য অ্যাডিসন প্রাবন্ধিকরূপে, স্টীল ঔপন্যাসিকরূপে, সুইফ্‌ট ও ডিফো যথাক্রমে 'গালিভার্স ট্র্যাভলস' ও 'রবিনস ক্রুসো'-র লেখকরূপে বিস্তৃত খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের প্রাথমিক পরিচয় ফরমায়েসী অর্থাৎ ভাড়াটে লেখকরূপে। এই যেখানে ছিল রীতি-নিয়ম, সেখানে ঐ আবহাওয়াকে কাটিয়ে তারই কিছুকাল পরে অর্থাৎ উনিশ শতকের প্রারম্ভ ও মধ্যভাগে ইংরেজী সাহিত্যে 'রোম্যান্টিক রিভাইভ্যাল'-এর মতো অসাধারণ

সৃষ্টির ঐশ্বর্যমণ্ডিত অপূর্ব সংঘটন কী করে সম্ভব হয়েছিল তা এক রহস্যজনক ব্যাপার। কট্টর গদ্যের আবহ থেকে স্বপ্নময় কাব্যের জাদুদেশে উত্তরণের চাবি-কাঠির সন্ধান পেতে হলে মনে হয় ইংলণ্ডের তৎকালীন সমাজস্থিতির আরও গভীরে আমাদের মনোযোগ সঞ্চালন করতে হবে।

যাই হোক, আঠারো-শতকীয় ইংরেজী সাহিত্যের নজীর উত্থাপনের উদ্দেশ্য হচ্ছে বর্তমান বাংলা সাহিত্যের অবস্থার সঙ্গে তার প্রতিতুলনার যোগসূত্র স্থাপন। বর্তমান বাংলা সাহিত্যে এখন কলমচালিয়েদেরই আধিপত্য। এঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর না আছে বৈশিষ্ট্য না স্বাতন্ত্র্য, সাহস তো একেবারেই নেই। সমাজের বিভিন্ন কায়েমী স্বার্থের মন জুগিয়ে, কর্তৃপক্ষস্থানীয়দের ভজনা করে, সুপ্রতিষ্ঠিত সংস্থা-গুলির বিরুদ্ধে সমালোচনার কারণ থাকলেও মুখ বুজে থেকে এঁরা শুধু যার যার আখের গুছোতে ব্যস্ত। যে বলিষ্ঠতা, স্বাধীনতাপ্রীতি ও সত্যকথনস্পৃহা লেখককে স্বাতন্ত্র্য দান করে ও তাঁকে সত্যিকার লেখকে পরিণত করে তার বাষ্পও নেই এইসব নামতঃ না হলেও কার্যতঃ ভাড়াটে লেখকদের মধ্যে। যখন যে দল ক্ষমতার চূড়ায় আরূঢ় তখন তাকে ভক্তির নৈবেদ্য নিবেদনই এইসব লেখকদের রীতি। সৃষ্টিধর্মী লেখকই হোন আর সৃষ্টির লক্ষণচিহ্নহীন জ্ঞানবাদী লেখকই হোন, সমালোচনাপ্রবণতা ও অন্যায়-অসহিষ্ণুতা যে-কোন সৎ লেখকেরই একটি প্রধান কুললক্ষণ। জাত-লিখিয়ে মাত্রই তাঁদের বদ্ধমূল সমালোচনী বৃত্তির জন্য প্রচলিত অবস্থা-ব্যবস্থার সঙ্গে প্রায়শ নিজেদের মানিয়ে নিতে পারেন না। এই ধরনের অক্ষমতার মধ্যে যে আত্মিক যন্ত্রণা আছে তা তাঁদের ব্যক্তি হিসাবে কিছুটা অসামাজিক করলেও তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্যকে সমৃদ্ধতর করে। পরিতাপের বিষয়, এই জাতীয় আত্মিক যন্ত্রণার লেশও খুঁজে পাওয়া যায় না বর্তমানে দৃশ্যতঃ আত্মতৃপ্ত সামাজিক লেখকগোষ্ঠির মধ্যে। তিনটে রিরংসামূলক গল্প লিখে যেখানে কেউ 'সাহিত্যিক' এবং সম্বৎসরে দুটি কি চারটি বাজার চলতি দুরূহ আঙ্গিক ও দুর্বোধ্যতার ফ্যাসানের কবিতা লিখে 'কবি' আখ্যা পায় সেখানে এই আত্মতৃপ্ত মনোভাবের ছড়াছড়ি ছাড়া আর কী-ই বা আশা করা যায়?

ইংরেজী সাহিত্যে যেমন আঠারো শতকের যুক্তিপন্থী গদ্যযুগের উষর শুষ্কতার পরেই উনিশ শতকে কাব্যের বন্যাপ্লাবনের ঢল নেমেছিল, বাংলা সাহিত্যের বর্তমান কলমচালিয়ে যুগের আধিপত্যের শেষে সাহিত্যে সৃষ্টিঐশ্বর্য তথা সৃষ্টিপ্রাচুর্যের ফুলফলের শোভা দেখা দেবে কি না তা এখনি বলা মুশকিল।

সে রকম ভবিষ্যদ্বাণী করতে হলে সাহিত্যিক গণৎকারের দরকার। আমি গণৎকার নই, সুতরাং সেরূপ জল্পনা-কল্পনা এই আলোচনায় নিরর্থক।

বাংলা সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্যের সংস্কার তথা স্বাধীন চিন্তাবৃত্তিকে যে কিভাবে পিষে মারার চেষ্টা করা হয় তার দুটি মাত্র দৃষ্টান্ত এখানে আমি উল্লেখ করব। তার থেকেই পাঠক বুঝতে পারবেন আমি আমার প্রবন্ধে যে সব কথা বলতে চেয়েছি তা সত্যি কিনা।

বিখ্যাত ইংরেজী লেখক শ্রীযুক্ত নীরদ চৌধুরীর নাম সকলেরই জানা। The Autobiography of an Unknown Indian', 'Passage to England', The Continent of Circe', The Intellectuals of India' এই গ্রন্থচতুষ্টয়ের লেখক শ্রীচৌধুরী আজ সাহিত্যিকরূপে আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী। বেশ কয়েক বছর পূর্বে প্রকাশিত তাঁর 'The Continent of Circe' বইখানা ইংলণ্ডের বিশিষ্ট সাহিত্য-পুরস্কার 'ডাফ-কুপার প্রাইজ' লাভে ধন্য হয়েছে এ তথ্যও সম্ভবতঃ অনেকের অবিদিত নেই। নীরদ চৌধুরী একজন অসাধারণ স্বাতন্ত্র্যধর্মী লেখক। তাঁর সকল মতামতের সঙ্গে মতৈক্য হওয়া কঠিন—তাঁর স্বাধীন চিন্তা এমনই প্রত্যক্ষ, সরব এবং কখনও কখনও এমন ধারালো কোণবিশিষ্ট ও উগ্র যে তাঁর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পুরোপুরি খাপ খাইয়ে নেওয়া যে-কোন ব্যক্তির পক্ষেই একটু শক্ত। কিন্তু তিনি যে একজন বহু-অধীত বিচিত্রমুখী জিজ্ঞাসাযুক্ত প্রচণ্ড শক্তিশালী লেখক সে বিষয়ে মতদ্বৈধের কোন অবকাশ নেই। এই লেখকটিকে নিয়ে এখন বাংলার সাময়িকপত্র জগতে তোলপাড়ের অবধি নেই। কিন্তু আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে লেখা থেকে জীবিকার সংস্থান না হওয়ায় নিতান্ত দুঃখে তাঁকে কলকাতা ছাড়তে হয়েছিল। নীরদ চৌধুরী বরাবরই ইংরেজীর লেখক ছিলেন না, তিনি বাংলায়ও প্রচুর লিখেছেন এবং এক সময়ে 'শনিবারের চিঠি'-র সম্পাদক ছিলেন। কিন্তু তাঁর স্বাতন্ত্র্য ও প্রবল সমালোচক সত্তাই তাঁর কাল হয়েছিল। তিনি এক স্মৃতিচারণমূলক প্রবন্ধে খেদ করে লিখেছেন যে সেই সময়ে মাসে তিনি পঞ্চাশ টাকাও রোজগার করতে পারেননি এবং স্ত্রী পুত্র নিয়ে নিতান্ত বিপন্ন অবস্থায় জীবিকার সন্ধানে বাংলাদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। তিনি বাঙালী ও বাংলাদেশের উপর শোধ নেন বাংলা ছেড়ে ইংরাজীতে রচনাভ্যাস করে। এর পিছনে জীবিকার তাড়না বহুলাংশে সক্রিয় থাকলেও অভিমানজনিত ক্ষোভও যে ছিল না সে কথা জোর

করে বলবার উপায় নেই। বাংলা ভাষায় যখন তাঁর অন্ন মাপা হয়নি তখন কেনই বা না তিনি বিদেশী ভাষার শরণ নিয়ে তাঁর জীবিকা সংগ্রহের চেষ্টা করবেন, বিশেষ সেই বিদেশী ভাষায় যখন তাঁর যথেষ্ট দখল আছে— সম্ভবতঃ এই-জাতীয় চিন্তা তাঁর মনে সেই সময়ে উদ্দিত হয়ে এবং তাঁর সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে থাকবে।

আজ অবস্থার বদল হয়েছে। নীরদ চৌধুরী এখন সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক। শুধু তা-ই নয়, তাঁর লেখার এখন বাজারদরও যথেষ্ট। তাই পশ্চিমবঙ্গের বাংলা পত্র-পত্রিকাগুলি এখন কে কার আগে তাঁর লেখা সংগ্রহ করবে তার প্রতি-যোগিতায় ব্যস্ত। নোবেল প্রাইজ পাওয়ার আগে যে-সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান রবীন্দ্রনাথকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করত সেই সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অনেকেই যেমন রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ লাভের পর রাতারাতি তাঁর ভক্তমণ্ডলীতে পরিণত হয়েছিল, এও অনেকটা সেই-জাতীয় ব্যাপার। বিদেশীরা এখন যখন নীরদ চৌধুরীকে সম্মানদানে এগিয়ে এসেছেন, অমনি এইসব পত্র-পত্রিকার মালিকদের দিব্যদৃষ্টি খুলে গেছে আর তাঁকে নিয়ে ঝোলাঝুলি শুরু হয়েছে। এঁরাই যে একদা নীরদ চৌধুরীর লেখার স্বাধীনচিত্ততার জন্য তাঁকে একঘরে করবার ও উপোসী রাখবার ব্যবস্থা করেছিলেন সে তথ্য তাঁরা এখন বেমালুম বিস্মৃত হয়েছেন অথবা অসুবিধাজনক জ্ঞানে নীরবতার ঢাকার অন্তরালে চাপা দিয়েছেন। এই হল বাঙালীর চরিত্র !

কিন্তু নীরদ চৌধুরী বড় সহজ পাত্র নন। তিনি তাঁর প্রতি প্রদর্শিত পূর্বতন অবহেলা ও অপমানের মাশুল এখন সুদে-আসলে উশুল করে নিচ্ছেন। বেশ কয়েক বছর আগে তিনি কোন এক সাপ্তাহিকের পৃষ্ঠায় 'দুই রবীন্দ্রনাথ' নামে যে প্রবন্ধ লিখেছেন তা ঐ পত্রিকার গালে থাপ্পড় কষার সামিল কিন্তু ওই পত্রিকার যাঁরা পরিচালক তাঁদের অপমানবোধ এতই অসাড় যে তাঁদের গালে যে থাপ্পড় কষা হয়েছে সে চেতনাও তাঁদের নেই, উলটে ঐ প্রবন্ধের প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য বিজ্ঞপ্তিতে জাঁক করে বেড়াচ্ছেন। ব্যবসায়-বুদ্ধি মানুষকে এমনিই করে ফেলে !

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত ডক্টর অমূল্যচন্দ্র সেন-লিখিত 'ইতিহাসের শ্রীচৈতন্য' নামীয় গ্রন্থের বাবদে বেশ কিছুকাল আগে বাংলাদেশে যে সোরগোল উঠেছিল সেই ঘটনা। 'তৃণাদপি সুনীচ ও তরোরিব সহিষ্ণু' বলে যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের

খ্যাতি তাঁদের অন্তর্ভূত মানুষগুলির মধ্যে যে এত অবিনয় ও এত অসহিষ্ণুতা লুক্কায়িত ছিল তা কে জানত! ডক্টর সেনের বইয়ের কোন কোন সিদ্ধান্ত সম্পর্কে পাঠকের মতভেদ থাকতে পারে কিন্তু সেই মতভেদকে বিজ্ঞাপিত করবার এই কি রীতি? আর যাই হোক, ডক্টর সেন একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ও সু-পরিচিত ঐতিহাসিক। গ্রন্থে ব্যক্ত তাঁর কোন কোন অভিমত প্রচলিত মতের বিরোধী হতে পারে, তাই বলে তিনি তথ্য ও যুক্তি ওজন না করে সে সকল অভিমত ব্যক্ত করেছেন এমন অপবাদ তাঁর বিরুদ্ধে আনা চলে না। তিনি ঐতিহাসিক, ইতিহাসের নির্মোহ দৃষ্টির তিনি অনুশীলনকারী, ভক্তের আবেগ-পূর্ণ দৃষ্টি তাঁর কাছ থেকে আশা করাটাই অন্যায়। ইতিহাসের সত্যনিষ্ঠ বিচার-বিশ্লেষণে যদি শ্রীচৈতন্যের সম্পর্কে গত পাঁচশত বৎসরের সযত্নে গড়ে-তোলা কিছু-কিছু কিংবদন্তী ভেঙে যায় তো ভাঙুক, তাই বলে এই নিয়ে প্রতিবাদ আন্দোলনের উষ্মা ও হিংস্রতা জাগিয়ে তোলার কোন অর্থ হয় না। যা সর্বা-বস্থায় ধ্যেয় ও অনুসরণীয় তা সত্য, মানুষের মনগড়া ধারণা নয়।

কথা হচ্ছে ডক্টর সেন যে-নিরিখে শ্রীচৈতন্যের ব্যক্তিত্বের পরিমাপ করেছেন সেটা গ্রাহ্য কিনা। তাই নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা হোক, বিচার-বিতর্ক হোক, এবং তা থেকে প্রকৃত সত্যে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করা হোক। কিন্তু এ তো তা নয়, এ যে ভক্তের আঁতে ঘা লেগেছে বলে দলবদ্ধ ভাবে সোরগোল পাকিয়ে তোলা ও লেখককে জব্দ করবার নিতান্ত অনুচিত চেষ্টা করা। মামলা আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছিল, সুখের বিষয় তার নিষ্পত্তি হয়েছে। কিন্তু এই ব্যাপারে দুইটি দৈনিক পত্রিকাগোষ্ঠীর মালিকদের, তাঁদের বশংবদ কিছু সংখ্যক সাহিত্যিকের যে পরিচয় পাওয়া গেছে তা আদৌ উৎসাহব্যঞ্জক নয়। বুদ্ধির স্বাতন্ত্র্যের টুঁটি টিপে ধরবার যে সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টার প্রমাণ এ থেকে মিলল তা ফ্যাসিবাদী জুলুমতন্ত্রেরই একটি রকমফের মাত্র। বাংলা সাহিত্যের সুস্থ অগ্রগতি যাঁরা কামনা করেন এই ফ্যাসিবাদ রোখবার জন্য তাঁদের সর্বপ্রযত্নে চেষ্টিত হওয়া প্রয়োজন।

বাংলা সাহিত্য পাঠের সমস্যা

বাংলা সাহিত্যে নিত্য নতুন বই প্রকাশিত হচ্ছে। নানা ধরনের বই। নানা বিষয়ের বই। একমাত্র সংখ্যা বা পরিমাণের দিক দিয়ে বিচার করে দেখলেও বছরে এত বই বেরুচ্ছে যে, অতি বড় পড়ুয়ার পক্ষেও প্রকাশিত সকল বইয়ের খোঁজ-খবর রাখা শক্ত, পড়া তো আরও পরের কথা। বই কত রকমের আছে— উপন্যাস, গল্পসংগ্রহ, কবিতা, সংকলন, নাটক, ভ্রমণ কাহিনী, রম্যরচনা, সমালোচনা-গ্রন্থ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখার বই, ধর্মপুস্তক, পুরাতন প্রসিদ্ধ পুস্তকের পুনর্মুদ্রণ, কারিগরী বিদ্যার বই, ইত্যাদি।

সম্প্রতি এই তালিকায় যুক্ত হয়েছে আরও একটি নতুন প্রকৃতির বই, যার প্রাদুর্ভাব আগে ছিল না, যেটা সম্পূর্ণ হালের আমদানি বলা চলে— যথা 'আমি সুভাষ বলছি', 'আমি মুজিব বলছি', 'আমি চে-গুয়েভারা বলছি'— জাতীয় 'বলছি' পর্যায়ের বই। যাঁরা পাঠকের শ্রুতির উপর অধিকার দাবি করছেন তাঁরা সকলেই সর্বমান্য নেতা, তাঁদের নিয়ে আমাদের বিরোধ নেই, কিন্তু কথা হলো, কে কার আগে বলবেন তাই নিয়ে এত কাড়াকাড়ি পড়ে গেলে তো বড় মুশকিলের কথা— পাঠকের তাল সামলানো দায়। এত 'বলছি, বলছি' কেন, বইয়ের কি আর কোন নাম হতে পারে না ?

স্পষ্টতই বিষয়ভেদে পাঠকভেদ। সব বই সকলের জন্যে নয়। মূলতঃ প্রয়োজন ও রুচি অনুযায়ী পাঠক তাঁর বই বাছাই করেন। রকমারি বইয়ের পরিপ্রেক্ষিতে পাঠকের শ্রেণীভেদ করলে এই রকমের একটা ছবি দাঁড়ায়: উপন্যাস, গল্প, নাটক, রম্য-রচনা, ভ্রমণকাহিনী ইত্যাদি সাহিত্য পড়েন প্রধানাংশে নবীন প্রজন্মের প্রতিনিধিরা, তার মধ্যে ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে তরুণ বয়সের বিভিন্ন স্তরের পাঠক-পাঠিকারা রয়েছেন। করণিক সম্প্রদায়ও এই সাহিত্যের মুখ্য এক ভোক্তা। অবশ্য ঢাউস উপন্যাসের ক্ষেত্রটি এক বিশেষ ব্যতিক্রম। এর পৃষ্ঠপোষকতার পরিধি গল্প-নাটক ভ্রমণকাহিনী ইত্যাদির চেয়ে ঢের বেশী বিস্তৃত। তরুণ-তরুণীরা যেমন এই থান-ইট সদৃশ বইয়ের পিণ্ডগুলি গোগ্রাসে গেলেন, তেমনি মধ্যবয়সিনী গিন্নীবান্নী ধরনের পাঠিকাদের কাছেও এগুলির আকর্ষণ বড় কম নয়। প্রায়শঃ তাঁরা এগুলিকে মাধ্যাহ্নিক নিদ্রা

আকর্ষণের ওষুধ হিসাবে ব্যবহার করেন। তাই বলে বইগুলি যে অপঠিত থাকে এমন নয়। বরং যে-উপন্যাসের পৃষ্ঠাসংখ্যা যত বেশী সে-উপন্যাসের তত বেশী চাহিদা। পাড়ার লাইব্রেরী যোগান দিয়ে কূল পায় না। এমনতরো মোটা বইয়ের আর-এক শ্রেণীর খদ্দের হলেন অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধের দল। তাঁদের সময় সহজে কাটতে চায় না, রোজকার সন্ধ্যায় পার্কে বেড়িয়ে কিংবা হরি-সংকীর্তনের আসরে যোগ দিয়েও তাঁদের হাতে এত সময় বাড়তি থাকে যে সেই উদ্বৃত্ত সময় তাঁরা কর্তন করেন তাঁদের বয়সের পক্ষে বেমানান এইসব নতুন কালের নতুন বিষয়ের উপরে লেখা উপন্যাস-গল্পের বই পড়ে। অবশ্য নতুন কালের প্রসঙ্গ যে তাঁদের কৌতূহলে সুড়সুড়ি দেয় না এমন নয়।

সমালোচনা-গ্রন্থগুলি হলো মূলতঃ ছাত্রসেব্য পাঠ্য। প্রধানতঃ ছাত্রদের প্রয়োজন মনে রেখে সিলেবাস মিলিয়ে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা এইসব গ্রন্থ রচনা করেন। অর্থকরী প্রেরণাটাই সংরচনের মুখ্য উদ্দেশ্য, সমালোচনা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন গৌণ লক্ষ্য হলেও হতে পারে; যদিও সত্যের খাতিরে এ কথা বলতেই হবে যে, এ-জাতীয় বই লেখার পিছনে ব্যবসায়িক তাগিদটা প্রধান তাগিদ হলেও এইসব বইয়ের কোনো-কোনোটি নিছক সমালোচনা-সাহিত্যের নিদর্শন হিসেবেও চমৎকার উৎরে যায়। সংশ্লিষ্ট বইয়ের লেখকদের পক্ষে এটা মস্ত শ্লাঘার কথা।

আমাদের সাহিত্যে সমালোচনা-সাহিত্য বলতে অধ্যাপকীয় সমালোচনা সাহিত্যই সাধারণতঃ বুঝিয়ে থাকে। এটা ভালো কথা নয়। নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্যের আদর্শ বিশ্লেষণের প্রয়োজনবোধ থেকে সমালোচনা-সাহিত্য সৃষ্টির যে শ্রদ্ধেয় রেওয়াজ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, আচার্য প্রমথ চৌধুরী, আচার্য মোহিতলাল মজুমদার প্রমুখ সমালোচকেরা প্রবর্তন করে গিয়েছিলেন তার ধারা মিইয়ে এসেছে বা একেবারেই উঠে গেছে বলে সন্দেহ হয়। বিশুদ্ধ সাহিত্য সমালোচনার আবশ্যকতা আজকের সমাজে আর স্বীকৃত নয়। সমালোচনা লিখতে হলে হয় ছাত্রসেব্য বই লিখতে হবে, নয় বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর লেখকদের ঢাকের কাঠি হতে হবে। স্বাধীনচেতা নিরপেক্ষ সমালোচকেরা— যাঁরা বৃত্তিতে অধ্যাপকও নন কিংবা গোষ্ঠী-ঘেঁষাও নন— তাঁরা মনের দুঃখে সমালোচনা সাহিত্যচর্চার অভ্যাসই ছেড়ে দিয়েছেন।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই বাংলায় যে খুব বেশী প্রকাশিত হয় তা নয়। এ-জাতীয়

বইয়ের বিরলতা বাংলা সাহিত্যের এক প্রধান দুর্বলতা। কেবল গল্পোপন্যাস বা ভ্রমণকাহিনী শ্রেণীর রম্য বা হাল্কা জাতের বই-ই প্রকাশিত হয়ে চলেছে, সাহিত্যের ভারসাম্য রক্ষার জন্যে মননমূলক বইও যে যথেষ্ট সংখ্যায় প্রকাশিত হওয়া দরকার সেই প্রয়োজনীয়তার বোধটি তেমন করে অনুভূত হচ্ছে না। ফলে সাহিত্যের পাল্লা একদিকে এমন বিসদৃশ মাত্রায় ঝুঁকে রয়েছে যে, এই আত্যন্তিক একদেশপ্রবণতা সকলের পক্ষেই ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে— লেখক, প্রকাশক, পাঠক ও চূড়ান্ততঃ বৃহত্তর সমাজ। লেখকের ক্ষতি এই কারণে যে, লেখকের মনোযোগ কেবলমাত্র একই বিষয়ের উপর নিবদ্ধ থাকায় তাঁর মনের প্রসার ঘটতে পারছে না, মনগড়া কথা সাজিয়ে ইনিয়েবিনিয়ে গল্প বানানোকেই তিনি তাঁর জীবনের সার বলে জেনেছেন; প্রকাশকের ক্ষতি হচ্ছে কেননা, গল্পোপন্যাস জাতীয় তথাকথিত সৃষ্টিধর্মী বই প্রকাশ করা ছাড়াও যে প্রকাশকের অন্যবিধ কৃত্য আছে এবং সেই কৃত্য পালনের দ্বারাও যে তাঁর যথেষ্ট আয় হতে পারে— কখনও-কখনও গল্পোপন্যাসের খাতলব্ধ আয় থেকেও যে এতে বেশী আয় হতে পারে— এই চেতনাটাই এর ফলে তাঁর মধ্যে দানা বাঁধবার অবসর পাচ্ছে না; পাঠকের ক্ষতি হচ্ছে তার কারণ, পাঠক ক্রমাগত এক-জাতীয় বইয়ের দ্বারাই সেবিত হচ্ছেন, তাঁর মনের সামনে অন্য কোনো বিষয়ের দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে না আর তদনুপাতে তাঁর মানসিক বৃদ্ধিও পঙ্গু রয়ে যাচ্ছে; সর্বশেষে, বৃহত্তর সমাজের ক্ষতি এইজন্যে যে সমাজ তো পাঠকেরই সমষ্টি— পাঠক অনুন্নত থাকলে সমাজও অনুন্নত থাকবে এ তো জানা কথা।

যাই হোক, বাংলা ভাষায় যৎসামান্য যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই প্রকাশিত হয় তার ভোক্তা হলেন জিজ্ঞাসু পাঠক, বিদ্যাপ্রেমী পাঠক, সীরিয়াসধর্মী পাঠক। বয়সের বিচারে এঁদের অধিকাংশকেই বোধ হয় প্রবীণের কোঠায় ফেলা যায়। কেননা আমাদের সাহিত্য-জগতের অভিজ্ঞতা এই যে, জ্ঞানের প্রতি তৃষ্ণাটা একটু পরিপক্বতার অপেক্ষা রাখে— বয়সের ও বুদ্ধির। প্রথম বয়সে প্রায়ই মনের ঝোঁক থাকে জীবনের নানা বহিরঙ্গ অভিব্যক্তির দিকে— এই বয়সে গল্প-উপন্যাস-রম্য-রচনা প্রভৃতি সুকুমার সাহিত্যই মনকে বেশী টানে। কিন্তু বয়স একটু থিতিয়ে এলে কর্মজীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে মনোমধ্যে বহু প্রশ্ন ও চিন্তা উদ্রিক্ত হলে, তখন স্বতই জিজ্ঞাসার পরিধি হয় ব্যাপকতর আর সেই সূত্রে 'নন-ফিক্‌শন' অর্থাৎ গল্পোপন্যাস-ব্যতিরিক্ত বইয়ের জন্য দেখা দেয় আগ্রহ। অবশ্য

এই সূত্রটিকে একটি সর্বাবস্থার সূত্র মনে করলে ভুল করা হবে, কারণ এমন বহু পাঠক দেখা যায় যাঁদের ভিতর জ্ঞানের পিপাসা সহজাত এবং অল্প বয়স থেকেই তাঁরা নানা ধরনের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই পড়ায় আকৃষ্ট হন। অন্যপক্ষে এমন অনেক প্রবীণবয়সী পাঠকের সন্ধান পাওয়া যাবে যাঁদের হাল্কা ছাড়া আর কোনো ধরনের বই পড়তেই ভালো লাগে না, বয়স তাঁদের যতই পাকুক বয়সোচিত কোনো জ্ঞানতৃষ্ণাই তাঁদের ভিতর চোখে পড়ে না, সুতরাং এসব ক্ষেত্রে বংশগতি, আবেষ্টনী, শিক্ষা-দীক্ষা রুচি-প্রবণতা মানসিক ধাত ইত্যাদি প্রশ্ন না এসেই পারে না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বলব, সাধারণভাবে এ কথা সত্য যে, একটু বয়স হলে তবেই মানুষের চিন্তাশীলতা বাড়ে। আর চিন্তাশীলতার পথেই আসে বৌদ্ধিক বা মনন-মূলক বই পড়ার ঝোঁক এবং সেইসঙ্গে এও লক্ষণীয় যে, যে-পরিমাণে এই ঝোঁক বৃদ্ধি পায়, সেই পরিমাণেই গল্পোপন্যাস পড়ার ঝোঁক কমে যায়। ব্যতিক্রমী পাঠকের কথা আলাদা, তবে মননসাহিত্য আর কথাসাহিত্যের মধ্যে যে সচরাচর একটা 'ইনভার্স রেশিও'-র সম্পর্ক বিদ্যমান, এ কথা বোধহয় নির্দ্বিধায় বলা চলে।

সীরিয়াসধর্মী পাঠকেরা সাধারণতঃ ইংরেজী বইয়ের মাধ্যমে তাঁদের জ্ঞানের তৃষ্ণা পরিপূরণ করেন তার কারণ, ইংরেজী ভাষায় জ্ঞানের নানা বিষয়ে উচ্চ মানের অগুনতি বই রয়েছে, বাংলায় তার সহস্রাংশের একাংশও নেই। তবু মাতৃভাষায় যখন দর্শন, অর্থনীতি, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব বা অনুরূপ কোনো বিষয়ের বই প্রকাশিত হয় তখন সকলের পক্ষেই সেটা খুব আনন্দের কারণ হয়। বইয়ের মান যেমনই হোক, মাতৃভাষায় এ-জাতীয় বই যে প্রকাশিত হচ্ছে সেইটেই এমন একটি সংবাদ যা মাতৃভাষা প্রেমিকমাত্রকেই আহ্লাদিত করবার পক্ষে যথেষ্ট। আমাদের লেখক ও পাঠক বিদ্যাচর্চায় যদি আরও অবহিত হতেন তো বাংলা সাহিত্যের চেহারা এতদিনে অন্যরকম হতো। সমাজেরও এমন হতশ্রী চেহারা দাঁড়াতো না।

বাংলা ভাষায় কবিতার বই দেদার বেরচ্ছে। তবে তার সবই প্রায় আধুনিক কবিতার বই, প্রথাগত বা ঐতিহ্যসম্মত ভাষায় ও ভঙ্গীতে রচিত কবিতার সংকলন 'কোটিতে গোটিক' চোখে পড়ে। কেউ কেউ বলতে পারেন, কবিতার বেলায় আধুনিকতা আর ঐতিহ্যের সীমারেখা টানার কী সার্থকতা? চলতি কালে যে কবিতার জন্ম তা আধুনিক কবিতা হবে না তো কী হবে? এর উত্তর এই যে,

কবিতার ক্ষেত্রে ঠিক কালগত অর্থে 'আধুনিক' কথাটা আমি ব্যবহার করিনি; আধুনিক কবিতা বলতে এক বিশেষ মেজাজ ও মর্জির, বিশেষ আঙ্গিক ও শব্দশৈলীর কবিতা বোঝায়, যার ভোক্তা বৃহৎ পাঠকসমাজ নয়, ভোক্তা কেবল তাঁরাই যাঁরা নিজেরা কবিতা লেখেন কিংবা আধুনিক কবিকুলের বন্ধু বা ভক্ত পর্যায়ের অন্তর্গত। আমাদের সমস্ত সাহিত্যবিভাগের মধ্যে এই বিভাগটিতেই গোষ্ঠী-চেতনা সবচাইতে বেশী এবং পারস্পরিক পৃষ্ঠকণ্ডূয়ন হল ওই গোষ্ঠী-চেতনার অসংশয় লক্ষণ। আধুনিক বাংলা কবিতার মতো এরকম 'এসোটেরিক' বা গূঢ় বিভাগ বাংলা সাহিত্যে আর নেই। দীক্ষিত ভিন্ন অন্য মানুষের নিকট যেমন গুরুর দেওয়া মন্ত্রের অর্থ অব্যক্ত থাকে, তেমনি আধুনিক কবিতার পরিভাষা, শব্দসংস্কার, ছন্দপ্রকরণ ইত্যাদির সঙ্গে পরিচয় না থাকলে এর অন্তরে প্রবেশ করাও অত্যন্ত কঠিন। ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, আধুনিক কবিতার পঠন-পাঠন উপভোগ-আস্বাদন সবই 'মুগ্ধ মণ্ডলী'র মধ্যে সীমিত, বৃহত্তর সমাজ-মনের সঙ্গে এর তেমন যোগ নেই। এ শহরের চার দেওয়ালের সীমায় আবদ্ধ, জনজীবনের মুক্ত বিস্তৃতিতে এর সম্প্রসারণ ঘটেনি। এবং যে অনুপাতে আধুনিক বাংলা কবিতা নগরনিবদ্ধ হয়ে আছে, সেই অনুপাতেই তা খণ্ডিত রয়ে আছে। আধুনিক বাংলা কবিতার বিরুদ্ধে প্রায়শঃ যে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ আনা হয় সে আর কিছু নয়, দীক্ষিতসুলভ মন্ত্রগুপ্তির সঙ্গে পরিচয় না থাকার অপর নামই হলো দুর্বোধ্যতা। এই দুর্বোধ্যতার জন্ম বাংলা কবিতার ট্র্যাডিশনের সঙ্গে সংযোগ-রাহিত্য থেকে।

যাক, যে কথা বলছিলাম। আধুনিক কবিতার বই কিনে পড়েন কবিরা, কবিবন্ধু বা কবিভক্তেরা, কিংবা এই দুই শ্রেণীর বহির্ভূত ও তাঁদের সঙ্গে অসংশ্লিষ্ট মুষ্টিমেয়সংখ্যক কাব্যামোদী পাঠকেরা। কিন্তু এই ভোক্তার সংখ্যা যতই টেনে-বাড়িয়ে দেখা হোক-না কেন সমগ্র পাঠকসমাজের তা এক সামান্য ভগ্নাংশও নয়। তবে ক্ষুদ্র হলেও এই দল অত্যন্ত সঙ্ঘবদ্ধ, এইটেই লক্ষ্য করবার।

আজকাল অর্থকরী বৃত্তির সহায়ক নানা কারিগরী বিদ্যার বই বেরুচ্ছে, খুব আশার কথা। যেমন মোটরচালনা ও মেরামতি শিক্ষার বই, বৈদ্যুতিক কলা-কৌশল ও রেডিওসেট নির্মাণ শিক্ষার বই, সেলাই শিক্ষার বই, নানাবিধ আচার ও মোরব্বা তৈরী শিক্ষা করার বই, নার্সারী সংক্রান্ত বই, ইত্যাদি। এ সব বই তাঁরাই কেনেন বা পড়েন যাঁরা ওই ওই শিক্ষার মাধ্যমে স্বাধীন জীবিকার

পথ তৈরী করতে চান। এ সব বইয়ের সাহায্যে অনেকে স্বাধীন উপার্জনের পথ পেয়েও যান। সুতরাং এ-জাতীয় বই যত প্রকাশিত হয় ততই মঙ্গল। অবশ্য, খাঁটী অর্থে এসব সাহিত্যের বই নয় নিশ্চয়ই, কিন্তু আবর্জনাসদৃশ গোছা গোছা তৃতীয় শ্রেণীর উপন্যাস আর রম্য রচনার বইয়ের চেয়ে এসব বইয়ের প্রকাশ অনেক বেশী মঙ্গলকর। সমাজকল্যাণের এগুলি নিশ্চিত বাহন। অপাঠ্য ও কুপাঠ্য গাদা-গাদা উপন্যাস লিখে উপকৃত হয় শুধু লেখক আর তার প্রকাশক, সমাজের তাতে কোনো মঙ্গল হয় না বরং ক্ষতি হয় ষোলো-আনা।

ধর্মপুস্তকের চাহিদা এখনও আছে, এটা তাৎপর্যপূর্ণ। উগ্রপন্থী আর নানা দল-বেদলের মানুষের সংঘর্ষের কারসাজিতে পশ্চিমবঙ্গের সমাজের তো কত বৈপ্লবিক ভাঙচুর হচ্ছে, বাঙালীর জীবনযাত্রার পুরনো ধাঁচধরনের আর কিছুই প্রায় অবশিষ্ট নেই বলতে গেলে; তবু এরই মধ্যে ধর্ম তার প্রভাব একেবারে ক্ষয়ে যেতে দেয়নি এ প্রায় অবিশ্বাস্য ব্যাপার। আজকের এই পাশ্চাত্ত্য প্রভাবিত আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজে ধর্মের এই টিকে থাকবার প্রয়াসকে সমাজতাত্ত্বিকেরা কী দৃষ্টিতে দেখবেন জানি না; বলতে পারেন এটা পশ্চাৎটান, বলতে পারেন এটা সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ভগ্নাবশেষের উচ্ছিষ্ট; কিন্তু যিনি যেভাবেই এর ব্যাখ্যা করুন-না কেন, ঘটনাটি সত্য। আমার সহজে প্রত্যয় হতো না, কিন্তু সম্প্রতি প্রকাশক সমিতির একটি বিবরণ থেকে এই চমকপ্রদ তথ্যটি অবগত হলুম। অনুমান করা যায় যে, ধর্মপুস্তকের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হলেন প্রৌঢ় ও বৃদ্ধের দল। আয়ু যখন ফুরিয়ে আসতে থাকে, পরপারের ডাক না চাইলেও ঘন-ঘন কানে বাজতে থাকে, তখন স্বতঃই ধর্মের দিকে মানুষের মনের গতি ফেরে। সেটা মৃত্যুভয়ের জন্যেই হোক আর যে-কারণেই হোক, ফেরে। কিন্তু এই ভয় বা স্বার্থভাবনার প্রশ্ন ছেড়ে দিলেও, কিছু-কিছু মানুষ আছে যাঁদের মন বোধহয় সহজাতভাবে ধর্মপ্রবণ। তাঁরা বয়স থাকতেই ধর্মগ্রন্থের সন্ধান করেন। যৌবনে যোগী হবার পথ খোঁজেন। সুতরাং ধর্মগ্রন্থের আকর্ষণ একাধিক স্তরের মানুষের কাছে। মৃত্যুভয়ভীতরাই শুধু এ আকর্ষণের শিকার নন, জীবনবিমুখেরাও সমপরিমাণে এর শিকার। তবে নৈতিক আর আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নয়নের জন্য যাঁরা এই সাহিত্যের শরণ লন তাঁদের মনোভাব বাস্তবিকই প্রশংসার।

আরও অনেক প্রকারের বই বাজারে বেরয়, সব কটি প্রকারভেদের হিসাব দেওয়া সম্ভব নয়। তবে সম্প্রতি একটি নতুন প্রকারভেদ দেখা দিয়েছে,

যার উল্লেখ না করলেই নয়। প্রবন্ধের সূত্রপাতে এর খানিকটা আভাস দিয়েছি, এখানে প্রসঙ্গটি আর-একটু বিস্তারিত করি।

আমি হালের রাজনীতি-ঘেঁষা বই-এর কথা বলছি, যার তিনটি নমুনামাত্র গোড়ায় দেওয়া হয়েছে। এইরকম আরও বহু বই বেরিয়েছে, এসবে প্রায় বাজার ছেয়ে গেছে বলা যায়। এগুলি ঠিক রাজনীতির বই নয়, এদেশে ওদেশে সংঘটিত সাম্প্রতিক রাজনীতির ইতিহাসের কতকগুলি বিশিষ্ট ঘটনা ও তাদের সঙ্গে জড়ানো নেতাদের নিয়ে রোমাঞ্চ ও উত্তেজনার মিশোল-দেওয়া বই। কয়েকটি বইয়ের ইতস্ততঃ নাম করছি, তার থেকেই বইগুলির প্রকৃতি বোঝা যাবে। 'কিউবা থেকে কঙ্গো', 'আমি রেজি দ্যব্রে', 'সংগ্রামী ভিয়েতনাম ও হো-চি-মিন', 'আখের স্বাদ নোনতা', 'চে গুয়েভারা ও গেরিলা যুদ্ধ', 'কৃষ্ণ আফ্রিকার মুক্তিসংগ্রাম', 'অদ্বিতীয় চেকোস্লোভাকিয়া', ইত্যাদি। এই পুস্তকতালিকার সঙ্গে সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে বাংলাদেশ-এর রোমহর্ষক ঘটনাবলীর উপরে লেখা একাধিক বই। বেশীরভাগ বইই ত্রস্তব্যস্ততায় লেখা, তবে বইগুলি যে উত্তরোত্তর বর্ধমান পাঠকদের একটি সুতীব্র চাহিদা মেটাচ্ছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। পাঠকসমাজের এই চাহিদাটিই বর্তমানে সবচেয়ে প্রবল। সকলেই পূর্ববঙ্গের সংঘর্ষের পটভূমি, কার্যকারণ, বর্তমান স্থিতি ইত্যাদি সম্পর্কে আরও বিশদভাবে জানতে চান। খবরের কাগজের মারফতে যেটুকু জানতে পারছেন তা তাঁদের পিপাসা মেটাবার পক্ষে মোটেই যথেষ্ট নয়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, বইগুলির পিছনে ব্যবসায়িক তাগিদ থাকলেও সদুদ্দেশ্যের প্রেরণাও অনেকখানি আছে।

এই-জাতীয় বইয়ের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা এটাই প্রমাণ করেছে যে, বিশুদ্ধ সাহিত্যের প্রতি আর পাঠকের একটা উল্লেখযোগ্য অংশের তেমন টান নেই। তার জায়গা দখল করে নিয়েছে রাজনীতি, কিংবা রাজনীতির খাদমেশানো বই। এই পরিবর্তন সাহিত্যের অগ্রগতির বিচারে সবটাই শুভফলপ্রদায়ক হবে এমন কথা বলবার উপায় নেই।

এবার বাংলা বই পড়ার সমস্যা নিয়ে কিছু বলতে চাই। কী পড়ি ?— এই হলো ভাবনা। এ সমস্যার কিছু কিছু ইঙ্গিত পূর্ববর্তী আলোচনার ধারার মধ্যে আছে, তবে সেসব আভাস-ইঙ্গিত সাধারণভাবে দেওয়া হয়েছে, সমস্যাটিকে

ব্যক্তিগত স্তর থেকে দেখা হয়নি। আলোচনার এই পর্বে সে রকমের একটা চেষ্টা করা হবে।

পাঠকদের মধ্যে যাঁদের বয়স ধরা যাক পঞ্চাশ উত্তীর্ণ হয়েছে, বাংলা বই পড়তে গিয়ে তাঁদের বড়োই মুশকিল হয়। কী পড়বেন? কী বই আছে যে সে বই পড়তে অন্তরের সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়? বইখানি পড়বার জন্যে সমস্ত মনোযোগ একত্র সংহত করতে হয়? পঞ্চাশোত্তীর্ণ পাঠক চারপাশে বইয়ের স্তূপের দ্বারা পরিবৃত হয়েও নিতান্ত অসহায় বোধ করেন। চারদিকে শুধু জল আর জল কিন্তু পিপাসায় ছাতি ফেটে গেলেও সে জল এক ফোঁটা পান করবার উপায় নেই এম্নি অবস্থা।

অবস্থাটা একটু সরেজমিনে তদন্ত করে দেখা যাক। বাংলা বই দুইরকমের হতে পারে: পুরনো বাংলা বই আর নতুন বাংলা বই। পুরনো বাংলা বই বলতে বাংলা সাহিত্যের পূর্বাচার্যদের রচিত সর্বপ্রকার গ্রন্থাদিই বোঝাচ্ছে—বৈষ্ণব কাব্য, মঙ্গল কাব্য, শাক্ত পদাবলী, রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদ, ঈশ্বর গুপ্ত-রঙ্গলাল, হেম-নবীন, অক্ষয় বড়াল-বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রোত্তর যুগের কবিকুল যথা, যতীন্দ্রনাথ-মোহিতলাল-নজরুল প্রমুখের কাব্য-গ্রন্থাদি। কথাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র, তারকনাথ, রবীন্দ্রনাথ, ত্রৈলোক্যনাথ, শরৎ-চন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী, অনুরূপা-নিরুপমা, উপেন্দ্রনাথ, বিভূতিভূষণ,-তারাশঙ্কর-মানিক-প্রেমেন্দ্র-শৈলজানন্দ-বনফুল-মনোজ প্রভৃতি। প্রবন্ধসাহিত্যে অক্ষয়-কুমার, ভূদেব, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর, প্রমথ চৌধুরী, রাজশেখর বসু, সুনীতিকুমার, কালিদাস রায়, প্রবোধচন্দ্র সেন প্রভৃতি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ও সমালোচনায় বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দীনেশচন্দ্র, মোহিত-লাল, সুশীলকুমার, শ্রীকুমার, ব্রজেন্দ্র বন্দ্যো ও সজনীকান্ত, সুনীতিকুমার, সুকুমার সেন, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রভৃতি। আমি শুধু এখানে শীর্ষস্থানীয়দেরই নামোল্লেখ করলাম, এঁরা ভিন্ন আরও অনেক বিশিষ্ট বিখ্যাত ও বর্ষীয়ান্ লেখক আছেন, সকলের নামোল্লেখ সম্ভব নয়। অনুক্তদের কাছে সেইজন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

এখন কথা হলো, বয়স্ক পাঠকদের মধ্যে যিনি গ্রন্থকীট পর্যায়ের মানুষ, যাঁর ক্ষুধা সর্বগ্রাসী, তিনি তো এঁদের রচনাবলী ইতঃপূর্বেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছেন এবং সেসব প্রভূত আনন্দ নিয়ে পড়েছেন। বাংলা সাহিত্যের পুরাতন ও সদ্য-বিগত দিনের ভাণ্ডার সুসমৃদ্ধ হলেও এমন বিশাল নয় যে এক জীবনের পরিধিতে

তাকে আয়ত্তে আনা যাবে না। প্রয়োজনে অবশ্য এখনও তিনি বারবার এঁদের রচনার দ্বারস্থ হন কিন্তু তাকে তো আর নতুন পড়া বলে না, পুরনো পড়াকে ঝালিয়ে নেওয়া বলে। সেই ঝালিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রথম পাঠের বিদ্যুৎশিহরণ কোথায়? এ কথা অবশ্য খুবই ঠিক যে, ক্লাসিক সাহিত্য নামধেয় পাঠ্য একবারের পড়ায় তার সমস্ত অর্থ উদ্ঘাটন করে না, তার পাঠ্যবস্তুর তাবৎ ব্যঞ্জনা হৃদ্গত করতে হলে বারংবার সে সাহিত্য পড়তে হয়, তা নিয়ে মজে থাকতে হয়। কিন্তু ক্লাসিক সাহিত্যের যত গুণই থাকুক এ কথা তো মানতেই হয় যে, অভিনবত্বের ও সজীবতার রস আস্বাদনের জন্য আধুনিক সাহিত্যের মতো আর কিছু নয়? সমসাময়িক সাহিত্যে অকারণ মনোযোগ-বিক্ষেপকারী অনেক বাড়তি প্রসঙ্গের উপদ্রব থাকে ঠিকই কিন্তু তৎসত্ত্বেও তার প্রাণবন্ততা তো অস্বীকার করা যায় না। নতুন লেখার মতো তাজা আর টাটকা জিনিস কোথায় পাওয়া যাবে? কথায়ই বলে, ট্রাডিশনের বোধ পুষ্ট করবার জন্যে রয়েছে ক্লাসিক সাহিত্য, আর বেঁচে থাকবার আনন্দে ও উত্তেজনায় প্রাণ ভরপুর করে তোলবার জন্যে রয়েছে সমসাময়িক বা চলতি কালের সাহিত্য।

কিন্তু এই শেষোক্ত ক্ষেত্রে এসে কী দেখি? এইখানে আমাকে অপ্রিয় কথার অবতারণা করতে হবে, সুতরাং গোড়াতেই সকলের কাছে মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি। নতুন কালের লেখকদের একটা মোটা অংশই এমন পরিভাষায় এমন আঙ্গিকে এমন শব্দ-সংস্কারের আশ্রয়ে তাঁদের গল্প-উপন্যাস-কবিতা-প্রবন্ধ ইত্যাদি লেখেন যার মধ্যে পূর্বোক্ত প্রৌঢ় পাঠক তাঁর মানসিক উজ্জীবনের কোনো উপাদান-উপকরণ প্রায়ই খুঁজে পান না, খুঁজে না পেয়ে নিরাশ হন। তিনি ক্ষুব্ধবিস্ময়ে লক্ষ্য করেন, অধিকাংশ আধুনিক লেখকেরই বাংলা সাহিত্যের ট্রাডিশন বা ঐতিহ্যক্রমাগত ধারার সঙ্গে বিশেষ কোনো যোগ নেই, এমনকি চার দশক আগে মাত্র বিগত সর্বাতিশায়ী রবীন্দ্রনাথও তাঁদের চেতনায় কম-বেশী অনুপস্থিত। এঁদের মধ্যে কবি যাঁরা তাঁদের কাল শুরু হয় জীবনানন্দ-সুধীন্দ্রনাথ দত্তের আমল থেকে, এই দুই কবির আবির্ভাবের আগে অনেকগুলি শতক জুড়ে বাংলা কাব্যের যে বিশাল ক্ষেত্র পড়ে রয়েছে তার ঐশ্বর্যের গৌরববোধ এঁদের কল্পনাকে উচ্চকিত করে বলে মনে হয় না। পূর্বেই বলেছি, আধুনিক কবিতা তার মন্ত্রগুপ্তিসুলভ তুকতাকের ফলে নিতান্ত 'এসোটেরিক' হয়ে পড়েছে, অর্থাৎ কেবলমাত্র দীক্ষিতজনদেরই উপভোগের ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। বাংলা

সাহিত্যের বৃহৎ পাঠকসমাজকে স্পর্শ করবার এর না আছে সামর্থ্য, না আগ্রহ। এর দুর্বোধ্যতার একটা বড় কারণ বাংলা কাব্যের ট্রাডিশনের সঙ্গে সহানুভূতির যোগের অভাব। নতুন কালের প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন ভাষা সৃষ্টি করতে হবে বৈকি কিন্তু তার মানে এ নয় যে, ট্রাডিশনকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে এ কাজ করতে হবে। অথচ আধুনিক কবিতার ভাষা ও শব্দ-প্রকরণ থেকে এ রকমেরই একটা ধারণার সৃষ্টি হয় প্রায়শঃ। ব্যতিক্রম-দৃষ্টান্ত আছে নিশ্চয়ই কিন্তু ব্যতিক্রম দিয়ে কবে আর বিচার-বিবেচনা হয়, প্রবহমান অবস্থাকেই বিচারের সূত্র হিসাবে মানতে হয় সচরাচর।

উপন্যাসের ক্ষেত্রে অবস্থা এতটা অসহ না হলেও এখানেও দেখি নানা অবান্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষার উৎপাত। বলতে গেলে আমাদের প্রচলিত স্ট্যাণ্ডার্ড গল্প ভাবার সকল সম্ভাবনাই এখন পর্যন্ত পরীক্ষা-প্রয়োগ করে দেখার বাকী আছে সেই অবশ্যকরণীয় পরীক্ষণ-প্রক্রিয়ায় ছেদ ঘটিয়ে কোনো কোনো নবীন উপন্যাস-লেখক যা করছেন তার নাম উৎকেন্দ্রিক ভাষা-রীতির চর্চা। এঁদের ওই শিকড়-বর্জিত কিম্ভূত ভাষাভঙ্গীর কোনো পূর্বনজীর নেই বাংলা সাহিত্যে, তা একান্তই এঁদের ব্যক্তিগত উচ্ছৃঙ্খল কল্পনাপ্রসূত। প্রায়ই দেখা যায় এই কিম্ভূত রীতি সবচেয়ে বেশী প্রযুক্ত হয় 'স্ট্রীম্ অব্ কনসাসনেস' বা 'চৈতন্য-প্রবাহ' নামীয় পশ্চিমী তত্ত্বের রূপায়ণের বেলায়। কিন্তু অক্ষমের হাতে পড়ে অনুকরণ অনু-করণের পর্যায়েই থেকে যায়, তা আর সৃষ্টির লক্ষণে ভূষিত হয় না। হেনরি জেমস, ভার্জিনিয়া উল্ফ্ বা জেমস জয়েসকে যে-জিনিস মানায়, তা যে-কোনো রামা-শ্যামা লেখকের কলমে সার্থকতামণ্ডিত হয়ে দেখা দেবে, এমন আশা করা বাতুলতা। আমাদের সাহিত্যে চৈতন্য-প্রবাহের ঢঙে উপন্যাসের ঘটনাবলীর বর্ণন করেন প্রথম ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর অন্তঃশীলা-আবর্ত-মোহানা এই 'ট্রিলোজি' বা ত্রিধারা উপন্যাসে। কিন্তু ধূর্জটিপ্রসাদ শক্তিমান লেখক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ব্যক্তিক গঠনে মননশীলতার আধিক্যহেতু উপন্যাসত্রয়ী ঠিক রসবস্তুতে পরিণত হতে পারেনি। পরে সঞ্জয় ভট্টাচার্য তাঁর একাধিক উপন্যাসে এই অন্তঃ-শীলা রীতির প্রয়োগ করেন। কিন্তু অন্যথা-শক্তিশালী হয়েও তিনিও এক্ষেত্রে খুব সাফল্যমণ্ডিত হতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না। এঁরা তো তবু ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন কৃতী লেখক, কিন্তু এখন যাঁরা এই ভঙ্গীতে লিখছেন তাঁদের বেশীর-ভাগেরই রচনায় অনুকরণের উৎসাহ ভিন্ন আর কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। ফলে

এসব পরীক্ষণ-প্রচেষ্টা 'না-ঘরকা না-ঘাটকা' হয়ে থেকে ব্যর্থতার স্তূপকেই পুঞ্জীভূত করছে মাত্র।

সাম্প্রতিক উপন্যাসে আরেকটি দৌরাত্ম্য অশালীনতার, অশ্লীলতার। শ্লীল-অশ্লীলের সমস্যা নিয়ে 'কল্লোল'-এর সময় থেকে এই সেদিন পর্যন্ত বাংলায় কম জল ঘোলা হয়নি। অশ্লীলতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে 'শনিবারের চিঠি'-র ভূমিকা স্মরণীয়। আমরা ভেবেছিলাম অশ্লীলতার দানোকে চিরকালের জন্যেই বোতলে পোরা গেছে, তার আর বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু সন্ত্রস্ত হয়ে লক্ষ্য করছি, সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে ওই ভূত বোতল ফুঁড়ে নতুন করে প্রবলতর আকারে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং সাহিত্যক্ষেত্রে নানা অনাসৃষ্টি বাধিয়ে তুলেছে। যে সব লেখক অশ্লীলতাকে একটা প্রগতিশীল বিদ্রোহী মনোভঙ্গী মনে করে আত্মপ্রসাদ অনুভব করছেন তাঁদের অবগতির জন্যে জানান প্রয়োজন, এত বড় বস্তাপচা পুরনো আদর্শ সাহিত্যক্ষেত্রে আর দ্বিতীয়টি নেই। অভিনবত্বের বা প্রগতির এতে নাম-গন্ধও নেই, প্রকৃতপক্ষে উনিশ শতকেই এই সাহিত্যিক সংস্কার বা কুসংস্কারের হদ্দ করে ছেড়েছেন ফরাসী লেখকেরা তাঁদের 'প্রকৃতি-অনুগ' (ন্যাচারেলিস্টিক) লেখার ধারা-ধরনের মধ্যে। স্তেঁদাল, ফ্লোবেয়ার, জোলা-প্রমুখ লেখকদের রচনাবলী তার উদাহরণ। ইংলণ্ড-আমেরিকার সাহিত্যেও এ বস্তুটিকে নেবু-তেতো করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং প্রগতি-অভিমানী আমাদের নতুন অশ্লীল লেখকবৃন্দ আর নতুনত্বের কী জাঁক করছেন? বরং বর্তমানে-পরিত্যক্ত একটি পুরনো মতাদর্শকে (সত্যিকার সাহিত্যের মানদণ্ডের কথা মনে রেখে একথা বলছি, পোর্নোগ্রাফীর কথা হচ্ছে না, পোর্নোগ্রাফীর আবিল জোয়ারের ঢল আজও সমান অব্যাহত) কবর খুঁড়ে বার করে পাঠকের মনোযোগের সামনে হাজির করবার চেষ্টায় তাঁরা ঘড়ির কাঁটাকে পিছন থেকে ফিরিয়ে নেবার অপরাধেই অপরাধী হচ্ছেন।

কাব্য ও কথাসাহিত্যে নিত্য-নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার সমর্থনকারীদের একটা কথা হলো, যুগবদলের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর মানসিকতারও দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপান্তর ঘটেছে, রূপান্তর শুধু নয় ফলতঃ বাঙালীমনের গোত্রান্তর হয়ে গেছে। এই গোত্রান্তরিত মানসিকতাকে রূপ দিতে গেলে পুরনো ভাষারীতিতে কুলোবে না, তার জন্যে চাই নতুন ভাষাভঙ্গী, নতুন শব্দব্যবহারপ্রণালী। একালের 'যুগযন্ত্রণা'কে—কথাটা সাহিত্যমহলে খুব চালু— যথোচিত রূপ দিতে হলে তার জন্যে অবশ্যই

যুগোচিত প্রকাশশৈলী উদ্ভাবিত হওয়া আবশ্যক। প্রথাবদ্ধ ভাষার কাল ফুরিয়েছে।

বাঙালীর চিন্তাভঙ্গীর যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, তার জীবনযাত্রা-পদ্ধতির দৃষ্টিগ্রাহ্য বদল হয়েছে সেটাও স্বীকার্য ; কিন্তু এই পরিবর্তিত মানসিকতাকে ভাষায় অভিব্যক্তি দিতে হলে প্রথাসিদ্ধ স্ট্যাণ্ডার্ড ভাষার খোলনৈচে একেবারেই বদলে ফেলতে হবে এটা কোনো কাজের কথা নয়। একটা বিশিষ্ট চিন্তার ছাঁচ ও তদনুযায়ী বিশিষ্ট প্রকাশশৈলী গড়ে উঠতে দীর্ঘদিনের সাধনার প্রয়োজন হয় ; যুগের দাবি মান্য করবার অজুহাতে সেই বহু যত্নে আয়ত্তীকৃত দীর্ঘকালীন ভাষারীতিকে দুমড়ে-মুচড়ে তার জায়গায় লেখকবিশেষের ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশীজাত কিম্ভূত উচ্চণ্ড ভাষাকে প্রশ্রয় দেওয়ার কোনো অর্থ হয় না। অনেক সময় এই ভাষার উচ্ছৃঙ্খলতার ছিদ্রপথেই চিন্তার উচ্ছৃঙ্খলতা সাহিত্যে প্রবেশ করে, যদিও চিন্তা থেকে ভাষার জন্ম এইটেই সাধারণ বিধি।

ভাষার নৈরাজ্য প্রবন্ধ তথা সমালোচনা সাহিত্যেও কম প্রকট নয়। আধুনিক কবিদের ভিতর যাঁরা পাণ্ডিত্যাভিমানী তাঁদের মধ্যে আজকাল এক ধরনের সাহিত্য-প্রবন্ধ লেখার রেওয়াজের সৃষ্টি হয়েছে যার আগাগোড়াই কমবেশী হেঁয়ালির ভাষায় রচিত। গদ্যের ভাষা হলো প্রাঞ্জলতার ('ক্ল্যারিটি') ভাষা, যাথাযথ্যের ('প্রিসিশন') ভাষা, যুক্তির ('রিজনিং') ভাষা। তার সেই অভ্যস্ত রীতির হেরফের ঘটিয়ে তাতে যদি অকারণ কাব্যকুয়াসার সৃষ্টি করা হয়, প্রচলিত বাক্যবিন্যাসে অহেতুক, উদ্ভট মোচড় দিয়ে তার অর্থ অনর্থক ঘোলাটে করে তোলা হয়, তাহলে আলোচিত বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ সত্ত্বেও পাঠের উৎসাহ বেশীক্ষণ বজায় রাখা যায় না। উল্লিখিত দুর্বোধ বাগ্‌ভঙ্গী কবিতার আলোচনাতেই বেশী প্রযুক্ত হতে দেখা যায়। কবিতা, রচনার বিষয়বস্তু হলেই রচনাটি কাব্যিক ঢঙে, সাংকেতিক ভাষায় লিখতে হবে তার কী কথা আছে ? কই, প্রসিদ্ধ কবিরা যখন কবিতা বিষয়ে আলোচনা করেন যেমন রবীন্দ্রনাথ, যেমন এলিয়ট, তাঁরা তো কখনও 'সন্ধ্যা ভাষায়' তাঁদের বক্তব্য উপস্থিত করেন না ? রবীন্দ্ররচনায় উপমার ঐশ্বর্য আছে কিন্তু সে তো তার এক বাড়তি আকর্ষণ।

এইসব কারণে আমার মতো প্রৌঢ় পাঠক আধুনিক বাংলা সাহিত্য পড়বার উদগ্র আগ্রহ নিয়ে পড়তে গিয়েও পড়ায় বেশীদূর এগোতে পারেন না, নানা কারণে তাঁর আগ্রহ প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে। তাঁর আছে সাহিত্যের সর্ব

বিভাগে সঞ্চরণের অভ্যাস, নানা বিষয় জানার ও বোঝার কৌতূহল; কিন্তু কেবলই যদি তাঁর সর্বভুক্ গলনালী দিয়ে দুর্গন্ধ উপন্যাস, দুর্বোধ কবিতা আর দুষ্পাচ্য প্রবন্ধ সেধোবার চেষ্টা করা হয়, তবে আত্মরক্ষার স্বাভাবিক তাগিদেই তাঁকে হা-হা করে উঠতে হয় "আর নয়, আর নয়, যথেষ্ট হয়েছে" বলে। বেগতিক দেখে তখন তাঁর বাংলা চিরায়ত (ক্লাসিক) সাহিত্য আর আধুনিক ইংরেজী সাহিত্য পড়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। অবশ্য আধুনিক ইংরেজী সাহিত্যেও অনেক ভ্যাজাল আছে কিন্তু ভ্যাজাল নয় এমন পাঠ্যবস্তুও সেখানে অপরিমাণ। কিন্তু দুঃখের হলেও একথা না বলে পারা যাচ্ছে না যে, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের চোদ্দ-আনাই ভ্যাজাল।

আর এ সাহিত্যের সমালোচনার মানও তথৈবচ। কেবল পারস্পরিক পৃষ্ঠ-কণ্ডুয়ন আর ব্যাজস্তুতি। আর ধরা-করার ব্যাপার। তদ্বির-তদারকি। স্বপক্ষ-ভুক্ত বশংবদ লেখকদের দিয়ে আত্মপ্রচারের ব্যবস্থা, তদভাবে নিজের ঢাক নিজেই পেটানো। মোহিতলালের পরে সত্যনিষ্ঠ নির্ভীক সমালোচক বাংলায় আর কেউ আসেননি, অধিকাংশই মুখ-চেয়ে-লেখা সমালোচক, মন-রাখা সমালোচক, প্রতিষ্ঠাভিখারী সমালোচক। সাহিত্যগ্রন্থের মূল্যায়নে সরকারী-বেসরকারী ক্ষমতাসীন সংস্থাগুলির নিজেদের কোনো মতামত নেই, প্রায়শঃ এঁরা পরের মুখে ঝাল খেতে ভালোবাসেন। নয়তো এমন অবিশ্বাস্য, অসম্ভব ব্যাপার কেমন করে ঘটে যে, কফি-হাউসে জমায়েত তরুণ-তরুণীর মাতামাতি আর হুল্লোড়কে কেন্দ্র করে নিতান্ত চুটকি-চটুল বিষয়ের উপরে লেখা উপন্যাস রবীন্দ্র-পুরস্কার লাভ করে? যেদিন আমাদের সাহিত্য-বিচারকদের এমনতরো মতির পরিচয় পেয়েছি, সেদিন থেকে বাংলা উপন্যাস পড়া ছেড়ে দিয়েছি।

সাহিত্য পাঠে বয়স একটা সুনিশ্চিত গণনীয় বিষয়। সব বয়সে সব বিষয় পড়তে ভালো লাগে না, যার কথা আগেই বলেছি। এখনকার বাংলা উপন্যাসে এমন সব বিষয়ের আর প্রসঙ্গের অবতারণা থাকে যার সঙ্গে পঞ্চাশোত্তীর্ণ পাঠকের মানসিকতার দূরতম সম্পর্কেও নেই। সকলেরই তো আর শিং ভেঙে বাছুরের দলে মেশবার ক্ষমতা থাকে না। এ এক দেবদুর্লভ ক্ষমতা। মনে পড়ে, আজ থেকে বছর পঞ্চাশেক আগে অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের (লোকান্তরিত এই মনীষীর আত্মার শান্তি হোক!) অন্যতর প্রধান কাজ ছিল কল্লোল-কালি-কলম-প্রগতি গোষ্ঠীর উদীয়মান তরুণ লেখকদের যখনই কোনো নতুন বই

বেরুত, তিনি খবরের কাগজের স্তম্ভে তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসার জন্যে এগিয়ে আসতেন। বুদ্ধদেব বসুর 'যেদিন ফুটলো কমল' উপন্যাসটির তিন-কলম-ব্যাপী উদার প্রশস্তি করেছিলেন তিনি অমৃতবাজার পত্রিকার পৃষ্ঠায়। আজ সে উপন্যাসের নাম কারও মনেও নেই। প্রবীণের এমন তরুণজনোচিত উৎসাহ সকলের মধ্যে আশা করা যায় না।

বলা হবে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও তো এ কথার ব্যতিক্রম নন। যখন তাঁর বয়স সত্তরের কাছাকাছি কি ওই সীমারেখা ইতোমধ্যে ছুঁয়েছে, তখন তিনি একাধিক আধুনিক নবীন লেখকের রচনার প্রশংসায় অবারিত হয়েছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পাঁক', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'বেদে' এই দুটি উপন্যাস ও বুদ্ধদেব বসুর কবিতাবলীকে তিনি প্রভূত স্বাগত জানিয়েছিলেন। এ তো তাঁর বয়সের পক্ষে অপরিসীম সচলতা ও গ্রহিষ্ণুতারই প্রমাণ। বার্ধক্যেও যে তাঁর মন তরুণের মতো সজীব ছিল তার অসংশয় পরিচয় বহন করছে এই তথ্য। নিতান্ত বাল্যে উপনিষদের আত্ম-সমাহিত ধ্যান দিয়ে যিনি তাঁর জীবন শুরু করেছিলেন, পরিণত বয়সের প্রান্তে পৌঁছে তাঁর চিত্তের এই নবীনত্ব-প্রীতি বাস্তবিক আমাদের অপরিসীম বিস্ময় উৎপাদন করে। অস্বীকার করব না, আমাদের চোখে সেটা একটু বিভ্রান্তিকরও ঠেকে। জ্ঞানেগুণে অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তিতে ও প্রগাঢ়তায় যাঁর প্রাবীণ্যের কোনো তুলনা হয় না, তাঁর পক্ষে কয়েকজন কচি ও কাঁচা নবীন লেখকের রচনার এমনতরো উচ্ছ্বসিত প্রশংসা কেমন করে সম্ভব হলো ?

চোখের উপর যেটা দেখা যায় সেইটেই সব নয়। ভিতরের খবর যাঁরা জানেন তাঁরা জানেন বৃদ্ধ বয়সে কবিকে দায়ে পড়ে এ ধরনের সার্টিফিকেট দিতে হয়েছে। উল্লিখিত লেখকত্রয় ছাড়াও আরও অনেকে এরকম সার্টিফিকেট পেয়েছেন। ব্যক্তিত্বে সুমহান্ প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তিতে সমাজের অভ্রভেদী চূড়াস্পর্শী বর্ষীয়াণ্ কবির নবীনের প্রতি এ উদার মমতার অভিব্যক্তি মাত্র। নবীনকে উৎসাহদানেচ্ছা থেকেই ওই প্রশংসার উদ্ভব। প্রশংসার মধ্যে এর বাড়া মানে খুঁজতে গেলে কবির প্রতি, বয়সের প্রতি, বয়সোচিত প্রজ্ঞার প্রতি অবিচার করা হবে।

সহিত্য পাঠের আনন্দ

সাহিত্য পড়ে আনন্দ পাওয়া একটা দৈব আশীর্বাদের মতো। . আশীর্বাদ এই জন্য যে, এ আনন্দ যে পায় সে পায়, যে পায় না সে পায় না— এর আর কোনো চারা নেই। সাহিত্যানুরাগের এইটেই হলো সবচেয়ে বড়ো নিশানা যে, বই পড়ে আনন্দ পাওয়া চাই আর সে আনন্দ বিশুদ্ধ হওয়া চাই। অর্থাৎ, বইয়ের কী জাত, বইয়ের কে লেখক, লেখকের কী জ্ঞাতি-গোত্র এ সব প্রশ্ন আনন্দের ভোজ্য গ্রহণের সময় গণনার বহির্ভূত বিষয় হলে তবেই সাহিত্য পাঠের স্বাদ পুরোপুরি মেলে। অর্থাৎ, আগে রচনাটি ভালো লাগা চাই, তার নিজস্ব গুণে ও আকর্ষণে, কোনরকম অবান্তর বিবেচনার খাদ-না-মিশানো অবস্থায় ; তারপর কে লেখক কী বৃত্তান্ত এ সব জল্পনার অবসর দেখা দিতে পারে। বইয়ের ভালো-লাগা মন্দ-লাগা দিয়েই বইয়ের গুণাগুণের নিরিখ ঠিক হবে, অন্যান্য প্রশ্ন তার পরে।

এমন বলি না যে লেখকের প্রশ্নটা সম্পূর্ণ বাহ্য। ঠিক তা নয়। তা হওয়া সম্ভবও নয়। বইটি ভালো লাগলে স্বতঃই কৌতুহল জাগবে তার লেখক কে তা জানবার। তার পর সে লেখকের আরও বই পড়বার জন্যে মনে আগ্রহ জন্মাবে। এইভাবে পুস্তক থেকে পুস্তকান্তরে আগ্রহকে চালনার দ্বারা, এবং প্রথম ভালো লাগাটা আরও কয়েকটি বইয়ের ক্ষেত্রে সুপরীক্ষিত আর সমর্থিত হওয়ার ফলে, 'প্রিয় লেখক' নামক দর্শন-স্পর্শনগ্রাহ্য বিশেষ চিহ্ন ও আকার বিশিষ্ট এক সজীব সত্তার জন্ম নেয়। কিন্তু যে কথাটা এখানে বলবার তা হল এই যে, প্রথমে বিশুদ্ধ সাহিত্য পাঠের আনন্দ, তার পর প্রিয় লেখক-এর প্রতি পক্ষপাত। যখন একবার মনের ভিতর 'প্রিয় লেখক'-এর প্রতি অনুরাগ জন্মে যায়, তখন আর সাহিত্য পাঠের আনন্দ অনাবিল বা অবিকৃত থাকে না ঃ প্রিয় লেখকের প্রতি অহেতুক পক্ষপাতিত্ব অহেতুকী সাহিত্যপ্রীতিকে মলিন করে দেয়।

আমার ধারণা, এই দৃষ্টিতে দেখলে, সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পাঠক হচ্ছে শিশু কিশোর, যার বয়স পাঁচ-ছ বছর থেকে বারো থেকে তেরোর মধ্যে। শিশু ও কিশোর সাহিত্য পড়ে যে আনন্দ পায়, কোনো বয়স্ক-পাঠকের ভাগ্যে তার সিকির-সিকি আনন্দও বুঝি জোটে না। হতে পারে, শিশু মন অপরিণত,

তার চিন্তা ও বিবেচনাশক্তি অগঠিত, বয়স্কের ভোগ্য অনেক কিছু বিষয়ই তার আয়ত্তের বাইরেকার জিনিস ; কিন্তু এই সব অভাবেরই পূরণ হয়ে যায় তার অপরিসীম কল্পনার ঐশ্বর্যে। আর এই অন্তহীন অফুরন্ত বহুবিচিত্র কল্পনায় বেঁচে শিশু যে আনন্দের অধিকারী হয়, পশ্চাৎস্মৃতির সহায়ে আমাদের নিজ নিজ বাল্যের দৃষ্টান্ত স্মরণ করলে আমরা তার স্বরূপের আভাস পেতে পারি। কিন্তু হায়, সেই আনন্দের স্বর্গে ফিরে যাওয়ার আর কোনো উপায়ই আমাদের হাতে নেই।

শিশুর এই অপরিসীম কল্পনাবৃত্তি তার সাহিত্য পাঠের আনন্দের সবচেয়ে বড় রক্ষাকবচ। রূপকথার মধ্যে কাল্পনিকতার অবসর সর্বাপেক্ষা অধিক, তাই দেখা যায়, রূপকথার গল্প পেলে শিশু নাওয়া-খাওয়া ভুলে যায়, তার সময়ের জ্ঞান লোপ পায়। শুধু তা-ই নয়, এই ধরা-ছোঁয়ার পৃথিবী তখন তার চেতনার স্তর থেকে মিলিয়ে যায়, দেখা দেয় তারই সমান্তরালে আর-এক জগৎ, যার ধরন-ধারণ করণ-কারণ সবই অদ্ভুত। সেখানে সোনার গাছে হীরের ফল ফলে, রাজপুত্র পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চড়ে তেপান্তরের মাঠ এক লহমায় পেরিয়ে যায়, হীরামন তোতা মানুষের মতো কথা কয়, খাঁ-খাঁ করা শূন্য রাজপুরীর মধ্যিখানে যে মণি-মাণিক্য খচিত কুঠরী, তার সোনার পালঙ্কের মখমলের শয্যায় অপরূপ লাবণ্যবতী এক রাজকন্যা, দুধে-আলতার মতো যার গায়ের রঙ, ফুলের মতো পেলব যার দেহ, রাক্ষসীর জাদুমন্ত্র-প্রভাবে অঘোর ঘুমে ঘুমিয়ে থাকে ; সাত-সমুদ্দুর তেরো নদীর পার থেকে পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চেপে আসা রাজকুমার সোনার-কাঠি রূপোর-কাঠির ঠাঁই বদল করে রাজকন্যার কাল ঘুম ভাঙায় ; রাজপুরীর সংলগ্ন দীঘির সাত হাত জলের তলায় লুকিয়ে রাখা কৌটোর ভিতর আছে রাক্ষসীর প্রাণ এক ভোমরার প্রাণকে আশ্রয় করে, রাজকুমার অমাবস্যার নিশীথে জলের তলায় ডুব দিয়ে সেই কৌটো করে উদ্ধার, তার পর ভোমরাকে পিষে মারতেই রাক্ষসীর হয় প্রাণ সংহার,—বাস্তব জীবনে এসব কাহিনীর অবিশ্বাস্যতা যত প্রকট শিশুর কল্পনায় ততটা পরিমাণেই সেগুলি সত্য। শিশু কল্পনার রঙে মিশিয়ে, নিজের অস্ফুট অনুভব যোগ করে, এ সব কাহিনী থেকে যে রস সংগ্রহ করে, আমরা বয়স্ক পাঠকেরা শত চেষ্টা করলেও তার শতাংশের একাংশ রসও তার থেকে পাবার আশা করতে পারি না। কেন না বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সে মনটাই মরে যায়, যে মন নিয়ে শিশু অপরূপ

বিস্ময়ে আর কৌতূহলে জগতের দিকে তাকায়, দৃশ্য জগতের আড়ালে আর একটি যে অন্তর্জগৎ আছে তার গভীরে ডুব দেয়, ডুব দিয়ে সেখান থেকে ভাল ভাল সোনা কুড়িয়ে আনে। বয়স্ক পাঠকের চিন্তা পরিণত, বিচার-বিবেচনা সুগঠিত সন্দেহ নেই, কিন্তু কল্পনার দৌড়ে শিশুর কাছে তার পুরামাত্রায় হার। আনন্দ যদি সাহিত্য পাঠের সবচেয়ে বড় অন্বিষ্ট হয় তা হলে শিশুর আনন্দের কাছে বয়স্কের আনন্দ লাগে না।

ছোটবেলায় বাংলা শিশু সাহিত্যের জাদুকর দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুমার ঝুলি' 'ঠাকুরদার ঝুলি' সকলেই আমরা পড়েছি, পড়েছি সত্যচরণ চক্রবর্তীর 'ঠাকুমার ঝোলা' 'ঠাকুরদার ঝোলা' 'দাদামশায়ের থলে' প্রভৃতি রূপ-কথার গল্পের বই। সেই সঙ্গে উপেন্দ্রকিশোর রয়চৌধুরীর 'ছেলেদের রামায়ণ' 'ছেলেদের মহাভারত', 'টুনটুনির গল্প', কুলদারঞ্জন রায়ের 'পুরাণের গল্প', সুখলতা রাওয়ের গল্পের বই ও 'আরো গল্প', অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাজকাহিনী' ও 'নালক', সুকুমার রায়ের 'আবোলতাবোল' ও 'হ-য-ব-র-ল', সীতা দেবী, শান্তা দেবীর 'হিন্দুস্থানী উপকথা,' 'হুক্কাহুয়া', 'আজব দেশ', রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত আরব্য উপন্যাসের গল্প ইত্যাদি বিচিত্র ধরনের শিশুসাহিত্য পড়ে কত-না আনন্দ পেয়েছি, কত না পুলক শিহরণ অনুভব করেছি। সেই আনন্দের স্মৃতিটাও আনন্দের— ভাবতে গেলেই কালের দূর ব্যবধান ভেদ করে হারানো শৈশব যেন চেতনায় উঁকি দিয়ে যায়। কিন্তু স্মৃতির গবাক্ষপথে মাত্রই সেটা উঁকিঝুঁকি, হারানো শৈশব আর কখনও ফিরে আসবে না!

পরিণত বয়সে পূর্বোল্লিখিত সব ক'টি বই-ই নাড়াচাড়া করে দেখেছি, কিন্তু মর্মান্তিক এই সত্য যে, বাল্যের আনন্দের সামান্য অংশই সে-সব গ্রন্থ থেকে আহরণ করতে পেরেছি। হয়তো পুরাতন আনন্দের ছেঁড়া-খোঁড়া টুকরো কখনও-সখনও চেতনায় ভেসে উঠেছে, বলা বাহুল্য সেটা নতুন করে আনন্দ পাওয়া নয় পুরাতন আনন্দের স্মৃতির আলোড়ন মাত্র। আমাদের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে কড়া পড়ে গেছে, আমাদের কল্পনাবৃত্তি নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। বয়স্কজনোচিত নানারূপ ভাব-অনুভাব-ধ্যান-ধারণা-বিশ্বাস-রুচি-পছন্দ আমাদের মনের উপর পুরু হাতে প্রলেপ বিছিয়ে দিয়েছে; সুতরাং সাধ্য কি আর পুরনো পড়ার স্বাদ ফিরে পাব? অবিকৃত, অনাবিল বিশুদ্ধ সাহিত্য পড়ার আনন্দ?

সাহিত্য সৌন্দর্যের জগৎ আনন্দের জগৎ— সেই জগতের পরতে পরতে জাদু, রন্ধ্রে রন্ধ্রে কল্পনার কুহর। বয়স্ক পাঠকের মুশকিল এই যে, সে যখন সাবালক চোখে পৃথিবীর দিকে তাকায় তার দৃষ্টিতে আর শিশুর মায়া-কল্পনার রঙ্ মাখানো থাকে না, তার দৃষ্টিতে ফোটে জিজ্ঞাসা, কৌতূহল, এক কথায় স্থুল জানবার স্পৃহা। জানবার স্পৃহা অর্থাৎ জ্ঞানের ক্ষুধা। এখন জ্ঞানের ক্ষুধার সঙ্গে কল্পনাবৃত্তির প্রায় অহি-নকুল সম্পর্ক, বলা যেতে পারে বিপরীত হারের সম্পর্ক : অর্থাৎ মানুষের জ্ঞানের তৃষ্ণা যত বৃদ্ধি পায় তত তার কাল্পনিকতা মন্দীভূত হয়ে আসে। শিশুর অফুরন্ত কৌতূহল, কিন্তু সে কৌতূহলের সুস্পষ্ট কোনো আকার নেই, তা আকাশের নীহারিকাপুঞ্জের মতো নিরবয়ব, ইতস্ততঃ সঞ্চরমাণ, দূরবিস্তৃত ; কিন্তু তার অনুভবের ক্ষমতা আর মনের চোখে রঙীন ছবি দেখবার শক্তি বিশাল। জ্ঞানের অভাব সে কল্পনায় পূরণ করে নেয়। এই কল্পনাবৃত্তিই হল সাহিত্যরসের অফুরান উৎস। বই পড়ে আনন্দ পাওয়ার, উল্লসিত বোধ করার যদি কিছু অপরিহার্য প্রাথমিক শর্ত থাকে তো তা এই কল্পনার শক্তি, চিত্তের গভীর গূঢ় সংবেদনশীলতা, যার মূল, খতিয়ে দেখলে, ওই কল্পনাতেই নিহিত।

বয়স্ক পাঠকের আরও অসুবিধা এই যে, জ্ঞানটাই তাঁর সাহিত্য উপভোগের পথের একমাত্র প্রতিবন্ধক নয় ; আরও নানা কারণে তাঁর উপভোগের প্রক্রিয়ায় খাদ ও ভেজাল এসে মেশে। বয়স্ক পাঠক যখন সংসার ক্ষেত্রে প্রবেশ করে, কর্ম-জীবনের নানা দায়-দায়িত্ব বহন করতে হয় বলে তাঁর জীবনে এক প্রকার কঠিন বাস্তবচৈতন্যের সঞ্চার হয়। এই বাস্তব চেতনা মানুষের স্বপ্ন দেখার অভ্যাসের মূল কুরে কুরে খায়, তার কল্পনাবৃত্তিকে ধীরে ধীরে অসাড় করে আনে। এমন কথা নিশ্চয়ই বলা আমার উদ্দেশ্য নয় এবং বলা ক্ষতিকরও বটে, যে কর্মের দায়-দায়িত্ব স্বীকার করে নেওয়া জিনিসটা খারাপ, কিংবা সংসারের জোয়াল কাঁধে না নিয়ে হেলায়-ফেলায় আলস্য-বিলাসে সময় কাটিয়ে দেওয়াটাই ভালো। মোটেই তা নয়। সংসারে যখন এসেছি, সংসারের কাজের দাবি মেনে নিতে হবে বইকি। কাজ ফাঁকি দিয়ে বা কাজকে এড়িয়ে নিয়ত দিবাস্বপ্নের জাল বোনার অভ্যাসকে কঠোর ভাষায় ধিক্কার জানানো প্রয়োজন। কাজের দিকে পিঠ দিয়ে থেকে ক্রমাগত আকাশ-কুসুম রচনা করতে থাকলে শেষ পর্যন্ত দেখা যায় আকাশের পরিসর ক্রমশঃ সংকীর্ণ হতে হতে একফালি আয়তনে এসে দাঁড়িয়েছে এবং কুসুমের সব ক'টি পাপড়িই ঝরে গেছে। কর্মবন্ধনকে অস্বীকার

করা নয় কর্মবন্ধনকে স্বীকার করে নেওয়ার মধ্যেই মনুষ্যত্বের স্ফূর্তি। সংসারে যার যার উপর যে কর্তব্য আরোপিত, নির্দিষ্ট, সেই কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালনের মধ্যে অদ্ভুত একটা আনন্দ আছে। কিন্তু দেখতে হবে কর্তব্য পালন করতে গিয়ে জীবন থেকে স্বপ্ন না মরে যায়। কল্পনা না উবে যায়। সেই ভয়টা বাস্তব এবং সদা বিদ্যমান বলেই উপরের অসুবিধার কথা বলতে হল। দেখা যায়, তাঁরাই সাহিত্যের সবচেয়ে রসিক পাঠক হন যাঁরা পরিণত বয়সেও বাল্যকালীন মনের সজীবতা বজায় রাখেন। যাঁদের জীবনে স্বপ্নালুতা শেষ অবধি জীবিত থাকে, যাঁদের মনের দিগন্ত থেকে কল্পনার রঙ্ মুছে যায় না। সত্যিকার সাহিত্য ভোক্তা তো আসলে সত্যিকার সাহিত্য স্রষ্টারই রকমফের মাত্র। রূপান্তরিত ভূমিকায় সাহিত্য রসজ্ঞ পাঠক আসলে সৃষ্ট সাহিত্যকে নতুন করে সৃজন করেন তাঁর মনে, স্রষ্টার আনন্দে তাঁরও থাকে আনন্দের ভাগ। স্রষ্টা ও ভোক্তা দুইয়ে মিলে সাহিত্যের পূর্ণতা।

এইখানে স্রষ্টার কথা অনিবার্য ভাবে এসে পড়ে। পৃথিবীর সাহিত্যে যাঁরাই প্রতিভাধর স্রষ্টার মর্যাদা পেয়েছেন, লোকসমাজে বিখ্যাত হয়েছেন প্রথম শ্রেণীর শিল্পী বলে, দেখা যায় তাঁদের প্রায় সকলেরই হাতে সাহিত্য আনন্দের লীলায় পরিণত হয়েছে। সৃষ্টির নেশায় বুঁদ হয়ে থেকে তাঁরা সাহিত্য-সরোবরে নিত্য নূতন সৌন্দর্যের কমল ফুটিয়েছেন। এই আনন্দ বা এই নেশা কখনই তাঁদের অধিগত হতে পারত না যদি তাঁরা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনের দিক্ দিয়েও বুড়িয়ে যেতেন। তা তাঁরা যান না, শৈশবের বিশুদ্ধ আনন্দ চেতনা আর কল্পনা বৃত্তিকে তাঁরা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আপনার মধ্যে ধরে রাখেন। বৃদ্ধ বয়সে অনেক মহাকবিই দেখতে পাই দ্বিতীয় শৈশবে উপনীত হন। এই দ্বিতীয় শৈশব বুদ্ধির জাড্য নয়, অনুভবের অসাড়তা নয়, বরং ঠিক তার উলটো। সৃষ্টি করতে করতে কোনো বড়ো কবির বা বড়ো শিল্পীর কাছে শিল্পকর্ম এমনই হস্তামলকবৎ হয়ে যায় যে তখন আর শিল্পসৃষ্টির প্রয়াসের ভিতর সচেতন চেষ্টার ছাপ থাকে না, তা হয়ে দাঁড়ায় শিশুর রূপজগতের সরল, নিশ্চেতন অনুভূতির মতো বিশুদ্ধ নর্মলীলা।

রবীন্দ্রনাথের জীবনে, অবনীন্দ্রনাথের জীবনে, আমাদের সাহিত্যের আরও কোনো কোনো স্রষ্টার জীবনে এই দ্বিতীয় শৈশবের লীলা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। তার অর্থ আর কিছু নয়, 'দ্বিতীয় শৈশব' কথাটার মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্থে

শ্রেষ্ঠ যে সকল লক্ষণ নিহিত আছে, তার সব ক'টিই পরিমূর্ত হয়ে উঠেছিল এঁদের শেষ জীবনকে ঘিরে। রবীন্দ্রনাথ জীবনের মধ্যবয়সে একবার আত্মকথা-মূলক 'জীবনস্মৃতি' লেখার পর জীবনের শেষ পর্বে এসে আর একবার আত্ম-কথা লিখেছিলেন 'ছেলেবেলা'। বইটি শিশু-কিশোরদের বিশেষ উপযোগী হলেও ঠিক যে শিশু-কিশোরদের উদ্দেশ্যেই তিনি তা লিখেছিলেন তা নয়। আসলে ছেলেবেলা শিশুর খাদহীন বিশুদ্ধ সরস অনুভবের দৃষ্টিতে লেখা, তাই তার পাঠ এত হৃদয়গ্রাহী, এত প্রত্যক্ষ তার আবেদন। রবীন্দ্রনাথের 'সে' 'খাপ-ছাড়া', 'ছড়া ও ছবি' প্রভৃতি গ্রন্থ কিংবা তাঁর ছবি আঁকা— বিচিত্র রঙের সমা-বেশে নির্জ্ঞান মনের গহনে লুকিয়ে-থাকা জন্তু-জানোয়ারের জগৎটাকে আলোর সামনে মেলে ধরার প্রয়াস— এগুলিও কি তাঁর পরিণত বয়সের সমুদ্র-মোহানা থেকে শৈশবেরই উৎসে উজান স্রোতে ফিরে যাওয়ার চেষ্টার নিদর্শন নয়? রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের লেখায় ও রেখায় সৃষ্টির শিশু সুলভ সহজ আনন্দ অনাবিল প্রাণের লীলায় উচ্ছলিত হয়ে উঠেছিল বললে মোটেই বাড়িয়ে বলা হয় না। বার্ধক্যের ক্লান্তি বা মালিন্যের ছাপ সে-সব সৃষ্টির গায়ে মোটেই দাগ ফেলতে পারেনি।

অবনীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের 'কুটুম-কাটুম'-এর কথাই ধরা যাক। তার মধ্যেও শিশুর নিশ্চেতন সৃষ্টির লীলার শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ। যে অবন ঠাকুর ছবি আঁকে আর 'ছবি লেখে', যিনি শিশুর মনোজগতের সহিত সম্পূর্ণরূপে একাঙ্গীভূত হয়ে তাঁর অনবদ্য স্বাদের শিশুগ্রন্থগুলি লিখেছিলেন, তাঁর পক্ষেই শুধু জীবনের প্রান্ত সীমায় এসে এইরূপ অবলীলায়িত সৃষ্টির লীলায় মেতে ওঠা সম্ভব। 'কুটুম-কাটুম' রেখা বা লেখা এ দুয়ের কোনোটাই নয়, ওটা আসলে হস্তশিল্পের কারিগরি— নানা রকম টুকিটাকি যথা, গাছের ডাল বা কাঠের টুকরো বা নারকোলের ছোবড়া ইত্যাদির সাহায্যে খেয়াল খুশিমাফিক নানারকম 'প্যাটার্ন' বা নক্সা তৈরীর শিল্প। কিন্তু তা যে ছাঁদের শিল্পই হোক, তার ভিতর প্রকাশ পেয়েছে শিশু-কল্পনার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি, শৈশব স্বপ্নের মায়া-ঝুমঝুমির রুনুঝুনু বোল তার মধ্য দিয়ে ছন্দিত ও নন্দিত হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ আর অবনীন্দ্রনাথের বেলায়, শৈশব আর বার্ধক্য সৃষ্টির পারাবারে এক বিন্দুতে এসে মিলিত হয়ে গেছে।

কিংবা ধরুন টলস্টয়ের বৃদ্ধ বয়সের লেখা। তাঁর 'টুয়েন্টি-থ্রি টেলস্'-এর

গল্পগুলির মধ্যে শিল্পের যে সহজ রূপের পরিচয় পাই, তার মধ্যে নেই নাগরিক শিল্পীর জটিলতা, নেই তথাকথিত বিদগ্ধ মননের 'সফিস্টিকেটেড' সংস্কার। সমগ্র জীবনের সাধনায় অর্জিত সচেতন শিল্পনৈপুণ্য, ভাষা সংস্কার, বিষয়কৌলীন্য ইত্যাদি জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের মতো পথের ধুলায় হেলায় নিক্ষেপ করে টলস্টয় এখানে শৈশবের আদিম সারল্যে আর নগ্নতায় ফিরে গেছেন— কি বিষয়বস্তুর নির্বাচনে, কি চিত্র-চরিত্রের উপস্থাপনায়, কি প্লট ও ভাষার বিন্যাসে। খেটে খাওয়া রুশ চাষী কিংবা মুচি কিংবা খুদে বণিক ইত্যাদির ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন টলস্টয় গল্পগুলিতে। গল্পগুলির রূপকলায় প্রকাশ পেয়েছে শিশুসুলভ সারল্য, সেই সঙ্গে শিশুসুলভ শক্তিমত্তা। কেননা সারল্যের মধ্যেই শক্তির বিকাশ। টলস্টয় জেনে-বুঝে, তাঁর সিদ্ধান্তের সম্ভাব্য সকল পরিণামফল বিচার করেই, নগর-জীবনের দরবারী শিল্পরীতি ত্যাগ করে জীবনের পরিণত পর্যায়ে এসে এই শিশু শিল্পকে গ্রহণ করেছিলেন। এবং এ কথা কে না জানেন যে রসের আবেদনের দিক্ দিয়ে এই গল্পসমূহের কোনো তুলনা হয় না!

তাই বলছিলুম, প্রকৃত সাহিত্য ভোক্তা হতে গেলে খানিকটা শৈশব সংস্কার মনের মধ্যে ধরে রাখা দরকার। শৈশবের কাল্পনিকতা, স্বাপ্নিকতা, সহজ অনুভবের ক্ষমতা এসব লক্ষণ উত্তর জীবনে যত বেশী আমরা জীইয়ে রাখতে পারব তত বেশী অপ্রতিরোধ্য অধিকার নিয়ে আমরা সাহিত্যের গহনে প্রবেশ করতে পারব। কাব্য উপভোগের দেউড়িতে যে কড়া পাহারাদার মোতায়েন আছে, সে হিসাবী কেজো লোককে তো নয়ই, এমনকি শুষ্ক জ্ঞানের কারবারী ব্যক্তিকেও প্রবেশের ছাড়পত্র দেয় না, কল্পনাবৃত্তির ঐশ্বর্যরসিক সুজনের জন্যই শুধু ওই ছাড়পত্র সংরক্ষিত আছে। স্বপ্ন দেখার অভ্যাস যার নেই তার পক্ষে কাব্য-সাহিত্যের দুয়ার রুদ্ধ। অবশ্য এ কথা বলার মানে এ নয় যে, শিশুর অপরিণত মনন আর অসংগঠিত বুদ্ধিবৃত্তিই সাহিত্য উপভোগের উৎকৃষ্ট ছাড়পত্র। মোটেই তা নয়। পরিণত বয়সী পাঠককে পরিণত মন বুদ্ধি নিয়েই চলতে হবে, শুধু উপরন্তু হিসাবে, তাঁর ভিতর স্বপ্ন আর কল্পনার সম্পদ থাকা চাই এইটুকু শুধু নিবেদন করবার।

বাঙালীর সাহিত্যপ্রীতি

বাংলা-সাহিত্যে আজ বহু বহু লেখক লিখননিরত আছেন। তিন বা চার দশক আগেও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এত লেখকের সমাবেশ অকল্পনীয় ছিল। এখন রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের মতো প্রতিভাধর লেখকের আবির্ভাবের আর সম্ভাবনা নেই হয়তো, কিন্তু প্রতিভার চোখ-ধাঁধানো বিচ্ছুরণের বদলে আজ বহু-সংখ্যক ক্ষুদ্র বা নাতিক্ষুদ্র আলোকের মিলিত ঔজ্জ্বল্যের সমারোহ সাহিত্যের আকাশকে প্রদীপ্ত করে রেখেছে। গুণের স্বল্পতা সংখ্যার বহুলতায়, পরিমাণের ব্যাপ্তিতে পূরিয়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। আজ সাহিত্য সম্বন্ধে সমাজ-মানসে উৎসাহের অন্ত নেই। সাহিত্যসেবীর সংখ্যা যেমন দৃষ্টিগ্রাহ্য ভাবে বেড়েছে তেমনি পাঠকের সংখ্যাও নিত্যক্রমবর্ধমান। মাসে মাসে বাংলায় যত নতুন বই বেরচ্ছে তার একটা গড় কষলে বোঝা যায় সাহিত্যের ক্ষেত্রে রচনাতৎপরতা কী পরিমাণ বেড়েছে এবং পাঠকমহলে তদ্বাবদে কতটা উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে। এ সমস্তই যে শুভ লক্ষণ তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বাংলার সাহিত্যের এই বিস্তারমুখী প্রবণতার কথা স্মরণ করেই প্রমথ চৌধুরী অনেক দিন আগে বলেছিলেন, বাংলা সাহিত্য গণতান্ত্রিকতার পথে অগ্রসর হচ্ছে, প্রতিভার কাল আর নেই। মুষ্টিমেয়ের অপরিমিত শক্তি এখন বহু বহু লেখকের ক্ষুদ্র শক্তিতে বিভক্ত। তাতে সাহিত্যের আভিজাত্য হয়তো কমেছে, কিন্তু ওই ক্ষতিকে পুষিয়ে নিয়েছে সাহিত্যের ক্রমবর্ধনশীল জনপ্রিয়তা। এটা জনতার যুগ সুতরাং অনিবার্যভাবে সাহিত্যের আবহের মধ্যেও জনতার আদর্শের ছাপ পড়েছে।

এতে লাভ-ক্ষতি দুই-ই হয়েছে। ক্ষতি হয়েছে গুণের অপকর্ষে, লাভ হয়েছে ব্যাপ্তিতে। সাহিত্যের ঊর্ধ্বগতি ব্যাহত হয়েছে; বিস্তারমুখী গতি প্রবল হয়েছে। হিসাব কষে দেখা যেতে পারে লাভ আর ক্ষতির হরণ-পূরণের পর আমরা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি। তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, সাহিত্যের উৎসাহ আজ জনজীবনে বিপুলভাবে ছড়িয়ে গেছে। বিশেষতঃ নবীন-বয়সীদের মধ্যে এই উৎসাহ তো প্রায় বাঁধ-ভাঙা বন্যারই মতো ব্যাপক ও উচ্ছ্বসিত। এ দেশের স্কুলের এবং কলেজের ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রায় শতকরা আশি-পঁচাশি-

জন্যই সাহিত্য বিষয়ে কৌতূহলী বলা যায়। এদের মধ্যে একটা অংশ নিজেরা সাহিত্যরচনার চেষ্টা করে এবং এই ব্যাপারে বড়দের অনুকরণ করে। অনেকেরই জীবনে কবিতা দিয়ে সাহিত্যজীবনের সূত্রপাত হয়। বাঙালীর ছেলে সাহিত্য-রচনার প্রয়াস করেছে অথচ কবিতা লেখেনি এরকম দৃষ্টান্ত খুব কম পাওয়া যাবে। একাধিক সুপ্রতিষ্ঠিত গদ্যলেখক, এমনকি কাটখোট্টা বিষয়াবলম্বী গদ্য-লেখকের প্রথম জীবনের ইতিহাস সন্ধান করলে জানা যাবে তাঁরা কবিতা দিয়ে সাহিত্যজীবনের সূচনা করেছিলেন।

হয়তো প্রথম শ্রবণে কথাটা অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে, কিন্তু কথাটা সত্য। বাঙালীর সহজাত সাহিত্যপ্রীতির কথা স্মরণ রাখলে এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। বাংলাদেশের ছেলেমেয়ে স্বতঃই সাহিত্য ভালবাসে। তাদের ভিতর যে কল্পনাপ্রবণ মন আছে সেই কল্পনাপ্রবণ মনের খোরাক জোগায় সাহিত্য। সাহিত্য তাই তাদের নিকট এত প্রিয়। ছেলেমেয়েদের মধ্যে সকলেই কিছু লেখবার চেষ্টা করে না, তবে সাহিত্য পড়ার বাতিক অধিকাংশের। সাহিত্যেব বই পেলে বাঙালীব ছেলে সে বই গোগ্রাসে গেলে— ভাল-মন্দের বাছ-বিচারের কথা তখন তার আদপে মনেই হয় না। তার এই নবীন পড়ার উৎসাহটাই উত্তর-জীবনে গভীরতর অধ্যয়নের রূপ লাভ করে এবং বিচিত্র বিষয়ে সঞ্চরণশীল হয়। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তখন স্বতঃই কৌতূহলের বিস্তৃতি ঘটে।

বাঙালী ছেলেমেয়েব এই মজ্জাগত সাহিত্য-অনুরাগ জাতীয় জীবনের এক বড় সম্পদ। এটি তরুণ বয়সেব কাঁচা মনের উৎসাহের পরিচায়ক সুতরাং তাকে অবহেলা করলেও ক্ষতি নেই— এই মনোভাব সমর্থনযোগ্য নয়। বাংলাদেশের বর্তমান উৎকেন্দ্রিক শিক্ষাপরিস্থিতি লক্ষ্য করে আমরা তরুণ সমাজের যতই সমা-লোচনা করি না কেন, একথা আমাদের মুহূর্তেকের জন্যও ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, তরুণ সমাজ বিভ্রান্ত হলেও যথেষ্ট প্রাণবান। তাদের উচ্ছৃঙ্খলতা তাদেব প্রাণশক্তির বিকারের পরিচয় দিচ্ছে, কিন্তু সেটি যে প্রাণশক্তিরই প্রকাশ তাতে সন্দেহ কী।

ওই প্রাণশক্তিরই লীলার অপর এক প্রমাণ তাদের স্বাভাবিক সাহিত্য-অনুরাগ। এই অনুরাগের মাধ্যমে তারা জীবনকে মাত্র বহিরঙ্গে নয়, অন্তরঙ্গ-ভাবে অনুভব করবার প্রেরণা পায়। সংসারের বিচিত্র কর্মের অভিব্যক্তির তলায় তলায় যে একটি ভাবের জগৎ, কল্পনার জগৎ প্রচ্ছন্ন রয়েছে তা অস্পষ্ট অনুভূতির

দ্বারা জীবনের ওই গোড়ার কালেই বুঝতে পারে। মানুষ যে শুধু বাস্তবেই বাঁচে না, কল্পনাতেও বাঁচে— এই বোধ তরুণ-মানসে মুদ্রিত হয়ে যাওয়ার ফলে পরবর্তী জীবনে নিছক বাস্তবের বাঁচার মধ্যেই তার শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায় না, কিছু স্বপ্ন সে শেষ অবধি বহন করে চলতে পারে। বাঙালী কর্মে বড় নয় কল্পনায় বড়— এই বাক্য তার বিরুদ্ধে কখনও প্রশংসার ছলে কখনও অপ্রশংসার ছলে বলা হয়। কিন্তু প্রশংসা-অপ্রশংসা যাই হোক এইটেই বাঙালীর মজ্জাগত স্বভাব এবং এই স্বভাব-নিয়তি থেকে তার নিস্তারলাভের উপায় নেই। বিধাতা যে জাতিকে যে স্বভাব-বৈশিষ্ট্য দিয়ে পাঠিয়েছেন সেই স্বভাব-বৈশিষ্ট্যকে বহন করে চলাই সে-জাতির ভাগ্যলিপি। বাঙালীর যা-কিছু শ্রেষ্টত্ব ও উৎকর্ষ, জগৎ-সভায় তার যা-কিছু পরিচয়, সে তার সংস্কৃতি ও সাহিত্যের গৌরবের জন্য। আমাদের মাথার মণি রবীন্দ্রনাথ কাব্যজগতের প্রধানপুরুষ এবং তদ্দরুন শুধু বাঙালীর নয়, সমগ্র ভারতবাসীর শিরোভূষণ। বাঙালী যদি রাজস্থানী ব্যবসায়ীদের মতো আর সব কর্ম অবহেলা করে শুধু অর্থসঞ্চয়ে মন দিত কিংবা উত্তর ভারতের পার্বত্য অঞ্চলের কোন কোন সম্প্রদায়ের মতো শুধু যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ হত, তা হলে তার গৌরব কি বাড়ত? আমার তা মনে হয় না। ব্যবসায় দক্ষতা বা সামরিক বিদ্যার শৃঙ্খলা (সামরিক বিদ্যার মানুষ-হননের দিকটি বাদ দিয়ে অবশ্য এ কথা বলছি) খারাপ তা বলছিনে, কিন্তু যে জাতির জাতীয় প্রতিভা যে কর্মে সবচেয়ে বেশী স্বাভাবিক স্ফূর্তিলাভ করে, সে জাতিকে সেই কর্মের ভূমিকাতেই মূলতঃ অধিষ্ঠিত হতে দেখলে মনে স্বস্তিবোধ হয়। এটা অবিসম্বাদী যে, বাঙালী কাব্য-প্রিয় জাতি। কল্পনাচর্চায় জাতিগতভাবেই তার স্বভাব-অনুরাগ। এই বৈশিষ্ট্যটিকে সমালোচনার চোখে না দেখে যাতে তার অনুশীলনের আরও বেশী সুযোগ সৃষ্টি হয় জাতির জীবনে, সেইটে দেখাই জাতিপ্রেমিক মাত্রের কর্তব্য। বাঙালী সাহিত্য ভালবাসে সেটা তার দুর্নাম নয়, তা স্পষ্টতই একটি জাতীয় সুনাম।

উপরে যে সব কথা বলা হল তার থেকে এমন মনে হতে পারে বাঙালীমাত্রের পক্ষেই বুঝি সে সকল কথা প্রযুজ্য। না, সেকথা সত্য না-ও হতে পারে। নিয়ম থাকলেই নিয়মের ব্যতিক্রম থাকে, এবং ব্যতিক্রম দিয়ে নিয়মকে চেনা যায়। বস্তুতঃ ব্যতিক্রম নিয়মেরই প্রমাণক। বাঙালী সমাজেও সংস্কৃতি-বিমুখতা আছে এবং সমাজের যে-অংশে তা আছে, অতি প্রবলভাবেই আছে। কথাটা আমাদের পক্ষে মোটেই শ্লাঘার নয় অথচ তা অনস্বীকার্য যে, বাঙালী প্রাপ্ত বয়সে একবার

যদি বৈষয়িকতার স্বাদ পেয়ে যায় তা হলে সে নেশা থেকে তাকে মুক্ত করানো বড় শক্ত। কত ছেলেকে জানি যারা প্রথম বয়সে কাব্যচর্চা করেছে, সংস্কৃতি-আন্দোলন করেছে, সাহিত্য বিষয়ে প্রবল উৎসাহের পরিচয় দিয়েছে, এবং নিজেদের শুধু নয়, সেই উৎসাহের দ্বারা চারিদিকের আবহাওয়াকেও উদ্দীপ্ত করেছে, তারাই আবার পরিণত জীবনে সাহিত্য ও সুকুমারকলায় তাদের এতকালের অনুরাগে জলাঞ্জলি দিয়ে নিতান্ত ভালমানুষটির মতো বিষয়-চর্চায় একান্তভাবে মনোনিবেশ করেছে। পরিবার-জীবনের নির্দিষ্ট সাংসারিক কৃত্যের বৃত্তের মধ্যে একবার যেই বিধিমতে আসন গেড়ে বসা হয়েছে, অমনি সকল কল্পনা ও সুকুমার অনুভূতির ভরাডুবি ঘটেছে।

কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্তা অনেক শিক্ষার্থিনী সম্পর্কেও ওই অপ্রিয় মন্তব্য করা যায়। কলেজে বা পোস্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাশে পাঠরতা থাকাকালে ওঁদের অনেকেরই মধ্যে শিল্প-সংস্কৃতি সম্বন্ধে উৎসাহের পরিচয় পাওয়া যায়। কেউ ছাত্রী-ইউনিয়ন গড়েন, কেউ কলেজের ডিবেটে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন, কেউ কলেজ-ম্যাগাজিন সম্পাদন করেন, কেউ গল্প-কবিতা লিখে নিজেদের বাড়তি উদ্যমের পরিচয় দেন। খুবই প্রশংসার কথা, কিন্তু যা-ই একবার বিবাহের গাঁটছড়া-বন্ধনে এঁদের জীবন পরিবারের নির্দিষ্ট আয়তনের মধ্যে বাঁধা পড়ে গেল, অমনি এঁদের সকল সাংস্কৃতিক অধ্যবসায় কর্পূরের মতো উবে গেল। তখন একান্তভাবে নিজের স্বামী ও সন্তানদের ঘিরে নিতান্ত আত্মকেন্দ্রিক জগৎ-খণ্ড রচনা চলতে থাকে এবং তার বাইরে জগৎ-সংসারে আর যা-কিছু আছে তা দৃষ্টি-সীমার আড়ালে পড়ে যায়। স্বামী-সন্তানের প্রতি মমতা অবশ্যই মহৎ কর্ম, তবে সে মমতা আত্মকেন্দ্রিকতা তথা আত্যন্তিক অধিকারবোধের অভিশাপ মুক্ত না হলে তার গৌরব থাকে না। নিজের সন্তানের প্রতি বাৎসল্য খুব ভালো কথা, কিন্তু প্রতিবেশীর সন্তানের অভাব-দৈন্য অপুষ্টি-অনাহার দেখে যে মায়ের মনে মাতৃভাব না জাগে সে মায়ের সন্তানস্নেহকে আমি খুব বড় মর্যাদা দিতে পারব না। ওই স্নেহ আত্মাদরেরই একটি ছদ্মবেশ মাত্র। এই আত্মাদরের পথেই ধীরে ধীরে সকল শিল্পানুরাগের অবলুপ্তি ঘটতে থাকে এবং তার জায়গায় আস্তে আস্তে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে শাড়ি-গয়নার মোহ, প্রসাধনের সমারোহ এবং সর্বশেষে বাড়ি-গাড়ির স্বপ্ন। সংস্কৃতি ও সাহিত্য-প্রীতি এঁদের বেলায় প্রায়শঃ শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায় গিয়ে সস্তা ও হাল্কা-চটুল নবেল পড়ে দিবানিদ্রা আকর্ষণের আয়োজনের

মধ্যে এবং সমস্ত উত্তম পর্যবসিত হয় স্বামীকে দিয়ে উল্টোরথ-মার্কা সিনেমা-পত্রিকা স্টল থেকে আনিয়ে পড়ানোর ব্যস্ততায়। বৈষয়িক গৃহস্বামী আর ততোধিক বৈষয়িকতায় আসক্ত গৃহস্বামিনী মিলে একটি দম্পতি সংসার-রচনার যে ঢালাও আয়োজনে ব্যাপৃত থাকেন দিনরাত তার কোন ফাঁক দিয়েই আর সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির প্রবেশের কোন পথ থাকে না।

আমরা বাংলার যুব-সম্প্রদায়ের অনেক সময় অকরুণ সমালোচনা করে থাকি কিন্তু এতটা অকরুণতা তাদের প্রাপ্য কিনা সেটি বিচার করে দেখা উচিত। খতিয়ে দেখতে গেলে, যুব-শক্তিই বাংলাদেশের শিল্প-সংস্কৃতির প্রদীপটিকে অনির্বাণ শিখায় জ্বালিয়ে রেখেছে। তাদেরই চেষ্টায় সমাজের মধ্যে শিল্প-সংস্কৃতির এত বিস্তার। সাহিত্য সম্পর্কে এত যে উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়, তার বারোআনা উৎসাহের যোগান যুবকেরা দিয়ে থাকে। তাদের সজীবতা সাহিত্যের সজীবতার কারণ, তাদের চাহিদা সাহিত্যের কর্ম-তৎপরতার ক্রমবর্ধমান বিস্তৃতির মূলে। তারাই লেখকদের উত্তমকে জাগিয়ে রাখে, লেখকদের নূতন-নূতন রচনায় উৎসাহিত করে। বাংলাদেশের শহরে বন্দরে যেসব সাহিত্য-সম্মেলনের অনুষ্ঠান হতে দেখা যায়, যুবক-সম্প্রদায় আর ছাত্রসম্প্রদায়ই অবধারিতভাবে সে সকল অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা। কেজো আর হিসাবী বুদ্ধির কারবারী অভিভাবকের দল হয় দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখেন নয়তো নিখরচার পরামর্শ দিয়ে কর্তব্য সম্পাদন করেন।

এ সকল সাংস্কৃতিক সম্মেলনে হুজুগেপনা নেই, বাড়াবাড়ি হয় না, তা বলছিনে। কিন্তু সকল সম্মেলনের উপরেই কিছু আর হুজুগেপনার অভিযোগ চাপানো যায় না। একাধিক সাহিত্য-সম্মেলন, সাংস্কৃতিক সম্মেলন দেখতে পাই যাদের প্রযত্ন আন্তরিক, যাদের আয়োজনের মধ্যে নিষ্ঠা আছে। এই সকল সম্মেলনের দ্বারা আর কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হোক আর না হোক এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, সংস্কৃতির প্রবাহকে সমাজ-মানসে সচল আর গতিশীল করে রাখার ব্যাপারে এদের কার্যকারিতা অপরিসীম। সমাজে, সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতির অনুকূলে 'আবহাওয়া' এরাই জীইয়ে রাখে। এদের মাধ্যমেই সমাজ-জীবনে শিল্পানুরাগ ছড়িয়ে পড়তে সাহায্য হয়।

কিন্তু কই এ সকল অনুষ্ঠানে তো প্রবীণবয়সীদের টিকিরও দেখা পাওয়া যায় না! এ জাতীয় অনুষ্ঠানে গিয়ে দেখেছি চারিদিকে কেবল তরুণ-বয়সীদের মাথা

আর শিশু-মুণ্ডের ছড়াছড়ি— কচিৎ কখনও দু'-একজন অভিভাবকের দেখা মেলে তো অতিশয় ভাগ্যের কথা। পল্লীতে যখন এই জাতীয় কোন অনুষ্ঠান হয় তখন এই পল্লীর অভিভাবকেরা কী করেন? কী আর করবেন, বাড়িতে বসে গৃহিণীর সঙ্গে মিলে ছেলের বিয়েতে কন্যাপক্ষ থেকে কতটা দাঁও মারা যায় তার ফর্দ তৈরী করেন, নয়তো ব্যাঙ্কে জমার পরিমাণ সুদে-আসলে কোথায় গিয়ে দাঁড়ালো তার হিসাব কষেন, নয়তো ঘরে বসে স্থপতির সাহায্য ব্যতিরেকে নিজে নিজেই নতুন বাড়ির প্ল্যান আঁকেন, নয়তো— স্রেফ গৃহিণীর সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপ করেই সময়টা কাটিয়ে দেন। সমাজ-প্রগতিতে এঁদের অবদান বেশী, না, তথা-কথিত চালচুলোহীন যুবকদের অবদান বেশী সেটি নির্ণীত হওয়া প্রয়োজন। সমাজে আমরা হিসাবী আর কেজো বুদ্ধির জয় দেখতে চাই না; সকল বন্ধন তুচ্ছকারী সর্বপ্রকার কৃত্রিম অনুশাসনের ছেদক বাঁধভাঙা ক্ষ্যাপামির প্রতীক যৌবনধর্মেরই জয় দেখতে চাই।

বুদ্ধিজীবীর সংকট

সমাজের যে শ্রেণীর মানুষেরা প্রধানতঃ বুদ্ধি বা মস্তিষ্ক চালনা করে জীবিকার উপায় করে থাকেন তাঁদের এককথায় বলা হয় 'বুদ্ধিজীবী'। বুদ্ধিজীবী সমাজ কথাটার ইংরাজী রূপান্তরিত প্রতিশব্দ হলো 'ইনটেলিজেন্টসিয়া'। বুদ্ধিজীবী নানান স্তরের ও নানান বৃত্তির হতে পারেন। উকীল, ডাক্তার, শিক্ষক, সাংবাদিক-শিল্পী-সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, সরকারী সংস্থা কিংবা বাণিজ্যিক সংস্থার আমলাকুল ও করণিক, প্রকাশক-সম্পাদক-পেশাজীবী লেখক প্রভৃতি বিভিন্ন জীবিকায় ও কর্মে নিযুক্ত লোকদেরই একটি মাত্র কথার আশ্রয়ে 'বুদ্ধিজীবী' এই লেবেলের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। তবে সংকীর্ণ অর্থে বুদ্ধিজীবী কথাটাকে বিশেষভাবে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতের সঙ্গে সংযুক্ত করে ব্যবহার করাই সচরাচরের রেওয়াজ। আমরাও এখানে এই সংকুচিত অর্থেই কথাটাকে ব্যবহার করব।

দেখা যাচ্ছে যে, সমাজে বুদ্ধিজীবীর এককালে যে প্রতিষ্ঠা ছিল সেই প্রতিষ্ঠায় ইদানীং বেশ কিছুটা ঘাটতির সূচনা হয়েছে। একদা শিল্পী-সাহিত্যিক-বিজ্ঞানী, দার্শনিক প্রভৃতি সাংস্কৃতিক শ্রেণীর মানুষ সমাজের মুখ্য চালক-শক্তি ছিলেন। অন্ততঃ তাঁদের মধ্যে যাঁরা শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তি রূপে গণ্য ছিলেন— যেমন বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রফেসর সত্যেন বোস, দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, আচার্য রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখরা —তাঁরা তাঁদের স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব প্রভাবেই সমাজের অভিভাবকত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সব মনীষীরা নিজ নিজ কালে তাঁদের পারিপার্শ্বিকের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন এবং নানাবিধ প্রশ্নে জনমত নিয়ন্ত্রণে তাঁদের একটা বিশেষ গণনীয় ভূমিকা ছিল। সকলেই তাঁদের ও তাঁদের অনুরূপ কৃতি ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন অন্যান্য লোকদের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনতো, এবং পারুক বা না পারুক তদনুযায়ী চলবার চেষ্টা করত। জনসাধারণের রুচি গঠনে ও আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণে এইসব দিক্‌পাল মনস্বীদের অস্তিত্ব তত্তৎ সময়ে একটা সদা-বিদ্যমান দৃষ্টান্তের মতো সর্বদাই চোখের সামনে বিলম্বিত থেকে লোকের অনুসরণ ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার মধ্যে সমাজকে সঠিক পথে চালিত করতে সাহায্য করত

যতটা পারা যায়।

কিন্তু এখন অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। এখন আর বুদ্ধিজীবীদের হাতে ক্ষমতার রশ্মি বিধৃত নেই, এখন সে ক্ষমতা তাঁদের হাত থেকে স্খলিত হয়ে কম বা বেশী পরিমাণে রাজনীতিকদের হাতে চলে গেছে। রাজনীতিকরা সমাজের মঙ্গলের জন্য কাজ করেন না এমন কথা বলা আমার অভিপ্রায় নয়, অন্ততঃ তাঁদের মধ্যে যাঁরা প্রগতিশীল চিন্তাধারার ধারক ও বাহক এবং সুনির্দিষ্ট কোন বৈজ্ঞানিক রাষ্ট্রনৈতিক দর্শন অনুযায়ী সমাজবদলের নীতি ও কার্যক্রম অনুসরণ করে চলেছেন তাঁরা তো সর্বৈব সমর্থনযোগ্য একটি গোষ্ঠী বা দল ; কিন্তু এখানে আমি সাধারণভাবে রাজনীতি-ব্যবসায়ীদের কথা বলতে চাইছি— এ-দল বা ও-দল আমার সমালোচনার লক্ষ্য নয়। অর্থাৎ রাজনীতি যাঁদের ব্যসন, ক্ষমতা করায়ত্ত করণ ও ক্ষমতা একবার করায়ত্ত হলে তার সংরক্ষণ চেষ্টাতেই যাঁদের সময় ও উদ্যম নিয়োজিত সেই পেশাদার রাজনীতিওয়ালাদের হাতেই এখন সামাজিক ক্ষমতা সবচেয়ে বেশী কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছে। আর যেহেতু তাঁদের হাতে মূল ক্ষমতা কেন্দ্রিত, সেই কারণে তাঁদের অনুগ্রহ বিতরণ ও সম্ভ্রম আকর্ষণের ক্ষমতাও সেই অনুপাতে বেশী। জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তারের একটা বড় হেতুই হলো তাদের বৈষয়িক মঙ্গলামঙ্গল সাধনের ক্ষমতার চাবিকাঠিটি নিজের হাতে বিধৃত রাখা। এ চাবিকাঠি যাঁর হাতে থাকে তাঁরই জনগণের উপর ছড়ি ঘোরা-বার অধিকার সবচেয়ে বেশী জন্মায়। স্পষ্টতঃই এ অধিকার এখন রাজনীতিকদের একচেটিয়া ভোগদখলভুক্ত।

রাজনীতিকদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব বৃদ্ধির আবহাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বুদ্ধি-জীবীদের প্রভাব যে ওই অনুপাতেই হ্রাস পাবে সে কথা একপ্রকার দুয়ে দুয়ে চারের মতোই স্বতঃসিদ্ধভাবে বলা যায়। কেননা রাজনীতিক আর বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্ক কম বা বেশী পরিমাণে প্রতিযোগীর সম্পর্ক। রাজনীতিকের ক্ষমতা বাড়লে বুদ্ধিজীবীর ক্ষমতা কমে আবার বুদ্ধিজীবীর ক্ষমতা বাড়লে রাজনীতিকের ক্ষমতা ক্ষীয়মাণ হয়। এই বিপরীত হ্রাস-বৃদ্ধির সম্পর্ক তাঁদের কাজের প্রকৃতির মধ্যে নিহিত।

যদি বলেন রাজনীতিকরাও এক ধরনের বুদ্ধিজীবী, তাঁদেরও তো বুদ্ধি নিয়েই কারবার, মগজ খাটানোই তাঁদের কাজ ; তাহলে তার উত্তর হবে 'হ্যাঁ'-বাচক এবং 'না'-বাচক দুই-ই। কথাটা মানাও যেতে পারে আবার নাও মানা

যেতে পারে। রাজনীতিকরা যখন বিশুদ্ধ রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে চিন্তাচর্চা করেন, বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মতাদর্শের তুলনামূলক আলোচনা করেন এবং সে বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে ভাববিনিময় করেন তখন তাঁদের অবশ্যই বুদ্ধিজীবী বলব, ওই অবস্থানে যতক্ষণ তাঁরা আছেন তাঁদের বুদ্ধিজীবী না বলার কোন কারণই থাকতে পারে না। কিন্তু ওই একই রাজনীতিক যখন রাজনৈতিক নেতার স্তরে অবনীত হয়ে ক্ষমতা লাভ তথা ক্ষমতা সংরক্ষণের বেসাতিতে মেতে ওঠেন তখন আর তাঁকে বুদ্ধিজীবী বলা যায় না। তখন তাঁকে বুদ্ধিজীবী না বলে রাজনীতি-ব্যবসায়ী বলাই উচিত। বুদ্ধিবাদের অনুশীলন একটা বড় রকমের মূল্যবান কাজ, মস্তিষ্ক চালনার মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যায়াম আর কী হতে পারে? কিন্তু ক্ষমতা আহরণ চেষ্টার সংস্পর্শে এলেই তার মৌলিক বিশুদ্ধি আর থাকে না, তাতে মলিন স্বার্থের ধুলোবালি লেগে যায়। দলীয় বা উপদলীয় বা গোষ্ঠী স্বার্থ সংগঠনের উদ্দেশ্যে যখন মগজকে ব্যবহার করা হয় তখন বুদ্ধিবাদের মধ্যে এক উৎকট রকমের স্থূলতা প্রবেশ করে। তখন আর বুদ্ধিবাদ বুদ্ধিবাদ থাকে না তা হয়ে ওঠে বুদ্ধির বিকার। বুদ্ধিজীবী তখন বুদ্ধি-অজীবী হয়ে পড়ে।

উপরের বিশ্লেষণের আলোকে বুদ্ধিজীবী ঘটিত সমস্যাটির বিচার করলে তবেই বুদ্ধিজীবীর প্রকৃত পরিপ্রেক্ষিতটি ধরা পড়বে। সত্যিকারের বুদ্ধিজীবী সর্বদাই জনসাধারণের পাশে দণ্ডায়মান থাকেন, কখনও ক্ষমতার মদমত্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে হাত মেলান না। তিনি যেকোন রকমের অন্যায় ও অবিচারের ঘোরতর বৈরী— তা সে অন্যায়-অবিচার সামাজিক ক্ষেত্রেরই হোক আর অর্থনৈতিক কিংবা রাষ্ট্রিক স্তরেরই হোক। সামাজিক ন্যায়বিচার আর আর্থিক সাম্যের তিনি প্রবল সমর্থক। ধনবন্টনের দুস্তর বিভেদ-বৈষম্য যা আজকের সমাজকে অনেকগুলি অসমান থাকে বিভক্ত করে রেখেছে তার দ্রুত অবসান তিনি সমস্ত অন্তর দিয়ে কামনা করেন। নির্যাতিত শোষিত শ্রেণীর মানুষজনদের তিনি অকৃত্রিম সুহৃদ এবং তাঁদের ভাগোন্নয়নের জন্য সতত চেষ্টা করে থাকেন— অবশ্য সমাজসেবার মাধ্যমে নয়, বুদ্ধিচালনার মূল যে ক্ষেত্র, শিল্প-সাহিত্য-নাট্য-সংবাদ-পত্র সেবা প্রভৃতি— সেগুলির মাধ্যমে। গণমানুষের অবস্থার সমুন্নতি হলে প্রকৃত বুদ্ধিজীবীর আনন্দের সীমা-পরিসীমা থাকে না।

এইখানে একটি কথা উঠবে। বুদ্ধিজীবীর মানব দরদী রূপটি কেউ কেউ হয়তো স্বীকার করতে চাইবেন না। তাঁরা বলবেন, বুদ্ধিবাদ একটি নিছক মগজ

খাটানোর কাজ, তার সঙ্গে হৃদয়বৃত্তির কোন সম্পর্ক নেই। মানুষের প্রতি প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা, স্নেহ-মমতা, দরদ, সহানুভূতি ইত্যাকার ভাবের সঙ্গে বুদ্ধিচর্চার যোগ খুবই ক্ষীণ, নেই বললেই চলে। মস্তিষ্ক চালনা একটা আগাগোড়া বৌদ্ধিক ব্যাপার, তার এলাকা থেকে দরদ-সহানুভূতি-করুণা প্রভৃতি মানবিক অনুভূতি-গুলি বহু দূরে অবস্থিত। ভাবাবেগে আর্দ্র মানবপ্রীতি আর বিশুদ্ধ বুদ্ধিচর্চার জগৎ দুই বিপরীত মেরুতে বিরাজ করে বললেও অত্যুক্তি হয় না।

এই অভিযোগের জবাবে বলব, রাজধানী শহরের চার দেয়ালের সীমায় আবদ্ধ জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, অভাব-অভিযোগের সঙ্গে সম্পর্করহিত 'মেট্রোপলিটান এলিটিস্ট'দের সম্পর্কে হয়তো একথা বহুল পরিমাণে সত্য, এমনকি যাঁদেরকে আমরা সচরাচর 'ইনটেলেকচুয়াল' বলে অভিহিত করে থাকি— একান্তভাবে মনন নিবদ্ধ ও হৃদয়বৃত্তির স্পর্শ শূন্য ব্যক্তি— তাঁরাও নিশ্চয় এই অভিযোগের আওতার মধ্যে পড়বেন ; কিন্তু যে সব বুদ্ধিজীবী-শিল্পী-সাহিত্যিক-সংস্কৃতিকর্মীর কাজের সঙ্গে বৃহত্তর জনজীবনের সুখদুঃখের সহানুভূতিগত যোগ রয়েছে তাঁদের উপর এননতর অপবাদ কোনমতেই চাপানো ঠিক হবে না। এই শেষোক্ত শ্রেণীর বুদ্ধি-বাদী সাংস্কৃতিকেরা নিছক বুদ্ধিরই অনুশীলন করেন না, মস্তিষ্ক চালনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা হৃদয়বৃত্তিরও সম্যক্ চালনা করেন। এই সব বুদ্ধিজীবীর দল নিজেরা মধ্য-বিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি হতে পারেন এবং তাঁরা মূলতঃ শহর এলাকাতেই বসবাস করতে পারেন রুজিরোজগারের তাগিদে কিন্তু গ্রামে-গঞ্জে-মফঃস্বল শহরে ছড়িয়ে থাকা অগণিত খেটে খাওয়া মেহনতী স্তরের মানুষের সঙ্গে তাঁদের আত্মীয়তার সম্পর্ক কখনই বিচ্ছিন্ন থাকে না। কলে-কারখানায় শ্রমরত মজদুর ভাই আর খেতে-খামারে রোদেপোড়া জলেভেজা চাষী ভাই সর্বদাই তাঁদের প্রাণের প্রীতিতে অভিষিক্ত, সৌহার্দ্যের উত্তাপে তপ্ত। নিজেরা মধ্যশ্রেণী-ভুক্ত হলেও এই সব বুদ্ধিজীবীর জীবন সামাজিক সহানুভূতির দৌলতে জনজীবনে সম্প্রসারিত। তাঁরা শহরে বাস করেন কিন্তু তাঁদের মন পড়ে থাকে সমাজের অবজ্ঞাত অনাদৃত এলাকাগুলিতে।

কথাগুলি ভাল করে বুঝতে হবে। এ না বুঝলে আমরা সকল শ্রেণীর বুদ্ধি-জীবীকে এক গোত্রে ফেলা রূপ বিচারের ভ্রমে পড়ব। মুড়ি-মিছরি তখন এক দরে বিকোতে থাকবে, সেটা কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নয়। শহুরে 'এলিটিস্ট' বা তথাকথিত 'ইনটেলেকচুয়াল' নিশ্চয়ই কমবেশী হৃদয়তাপশূন্য, নিরবচ্ছিন্ন মস্তিষ্ক-

নির্ভর এক জীব, তা বলে সব ধরনের বুদ্ধিজীবীকে একই ধূসর রঙে রাঙাতে যাওয়া কি উচিত? বুদ্ধিজীবীতে বুদ্ধিজীবীতে পার্থক্য আছে, আর সে পার্থক্য মৌলিক।

'বুদ্ধিজীবীর সংকট'— আমার প্রবন্ধের শিরোনাম রেখেছি। কেন বুদ্ধিজীবীর সংকট? সংকট এ কারণে যে, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের একটি বৃহৎ অংশেরই মস্তিষ্কের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এঁরা নিতান্ত মস্তিষ্কের উপর নির্ভর করে বাঁচবার চেষ্টা করেন এবং নানাবিধ সমস্যার সমাধানে হৃদয়কে মোটে আমলই দেন না। অন্তরের সহজাত আবেগ-অনুভূতি-ভাবপ্রবণতাকে তাঁরা প্রায়শঃ সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেন এবং মনে করেন এজাতীয় হৃদয়দৌর্বল্য থেকে দূরে থাকতে পারলেই তাঁদের বুদ্ধির কৌলীন্য অক্ষুণ্ণ রইল।

কিন্তু এটা একটা ভুল ধারণা। হৃদয়কে বাদ দিয়ে মস্তিষ্কের চর্চা কখনও পূর্ণতা পেতে পারে না। বরং পদে পদে তেমন মস্তিষ্ক চর্চা বিপথে চালিত হওয়ার আশংকা থাকে। চালিত হয়ও। আমাদের নাগরিক 'এলিট' আর 'ইনটেলেকচুয়াল'দের দেখলেই একথার সত্যতা উপলব্ধি হতে পারে। এই যে আজকের সমাজে বুদ্ধিজীবীদের দর ও কদর কমে গেছে তার অন্য অনেক কারণের মধ্যে এই এক প্রধান কারণ যে, তাঁদের অনেকেরই মগজের সঙ্গে তাঁদের হৃদয়ের বচ্ছেদ হয়ে গেছে। তাঁরা 'ব্রেন' সর্বস্ব হয়ে উঠেছেন। মানুষের দুঃখে তাঁদের প্রাণ কাঁদে না, বহু মানুষের দুর্গতিতে তাঁদের হৃদয় বিচলিত হয় না। সেই বুদ্ধিজীবীকে কি বুদ্ধিজীবী বলা যায়, যিনি পর্বতপ্রমাণ সামাজিক অন্যায় অবিচার আর অপরিমেয় মানবিক দুঃখ-দুর্দশার দৃষ্টান্তের সামনেও অবিচল? সংজ্ঞার্থে বুদ্ধিজীবী বলতে হয়ত বুদ্ধির প্রাধান্যেরই ব্যঞ্জনা প্রকাশ পায়, তাহলেও বুদ্ধিবাদকে হৃদয়তাপ বর্জিত মনে করা ভুল। হৃদয়ের উত্তাপেই বুদ্ধিবাদের গরিমা। এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী যিনি হৃদয়ৈশ্বর্যেও সমান ধনী। দয়া-দাক্ষিণ্য-বদান্যতা-মহানুভবতা-মমতা ও করুণা ভিন্ন বুদ্ধিজীবিতা কল্পনা করা যায় না। এই সকল গুণ ব্যতিরেকে বুদ্ধি অপবুদ্ধির নামান্তর হয়ে দাঁড়ায়।

সম্প্রতিককালে বুদ্ধিজীবীদের যে বাজারদরের হানি ঘটেছে তার মূলে আছে —পূর্বেই বলেছি— মস্তিষ্কের সঙ্গে হৃদয়ের বিচ্ছেদ। এই বিচ্ছেদ বা বিযোজন সবচাইতে বেশী মর্মান্তিকভাবে প্রকট হয়েছিল ১৯৭৫ সালের জরুরী অবস্থার কালে। আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবী সমাজের একটা বড় অংশ তাঁদের সামাজিক

দায়িত্ব পালনে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিলেন ওই চরম সংকটের কালে। অত্যাচারীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কণ্ঠ সোচ্চার করার ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবীদের যে একটা বৃত্তিগত দায়বদ্ধতা আছে তা ভুলে গিয়ে তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের একটা গরিষ্ঠ সংখ্যক অংশ সেই সময় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সন্ত্রাসী কার্যকলাপকে জয়ধ্বনি দেবার কাজে মেতেছিলেন। জরুরী অবস্থাকালীন শাসনতান্ত্রিক নিষ্ঠুরতার জাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে কত কত নিরপরাধ, নির্দোষ মানুষ সেই সময় অকথ্য লাঞ্ছনা ভোগ করেছে তার লেখাজোখা নেই। শত সহস্র বিপক্ষদলীয় রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীর নির্বিচার কারাবরোধ তো আছেই, তার উপরে আছে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে অবর্ণনীয় নিগ্রহ যার ফলে একাধিক জনের কারাভ্যন্তরেই প্রাণহানি ঘটেছে। এর উপরে আছে লেখক-শিল্পী-নাট্যকার-সঙ্গীতজ্ঞ-সংবাদিক প্রমুখ বিভিন্ন স্তরের সাংস্কৃতিক কর্মীদের কণ্ঠদলন, তাঁদের চিন্তার স্বাধীনতার বলপূর্বক অঙ্গচ্ছেদ। ১৯৭৫ সালের ২৫শে জুনের রাত্রিকাল থেকে আরম্ভ করে ১৯৭৭ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত পুরা উনিশ মাস কাল গোটা ভারত একটা প্রকাণ্ড জেলখানায় রূপান্তরিত হয়েছিল বললেও অত্যুক্তি হয় না।

অথচ লজ্জা ও দুঃখের বিষয় এই যে, সে সময় সর্বভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের একটা মোটা অংশ ওই সর্বব্যাপক অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কণ্ঠ উত্তোলন করা তো দূরের কথা, শাসক শক্তির জুলুমের ভয়ে নীরব থাকাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেছেন। শুধু তাই নয়, শ্রীমতী গান্ধীকে খুশী করার তাগিদে কেউ কেউ আগ বাড়িয়ে জরুরী অবস্থার প্রতি তাঁদের সমর্থন জানাতেও পেছপা হননি। শিল্পীর চিন্তাপ্রকাশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ, সাংবাদিক ও লেখকের রচনাদির প্রি-সেন্সরশিপ ব্যবস্থা, মানুষের এক জায়গায় জমায়েত হয়ে সভামঞ্চ থেকে মতামত প্রচারের অধিকারের দলন— এ সমস্ত অনুচিত কাজই তাঁরা নির্বিচারে সমর্থন করেছিলেন। বৃত্তিগত দায়বদ্ধতার আদর্শের প্রতি অনুরক্তি বশতঃ তাঁরা প্রতিবাদের ময়দানে এগিয়ে আসবেন এটা প্রত্যাশিত ছিল ; সেই প্রত্যাশা তো তাঁরা পুরণ করেনইনি, উল্টো,— অন্যায় ও অবিচারের ঘটনাদৃষ্টে মানবস্বভাবের সহজাত বিবেকের আলোড়ন বলে যে একটা কথা আছে, সেই মানবিক আলোড়নেরও বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি তাঁদের বাক্যে ও আচরণে সেই সময়ে। দিল্লীর জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঘা বাঘা

সব অধ্যাপক বোধকরি 'যার নুন খাই তার গুণ গাই' নীতির আনুগত্য করেই ওইকালে আফিম-খেকো শার্দুলবরের মতো নিস্তেজ হয়ে পড়ে রয়েছিলেন। সম্ভবত নেহেরু নামের জাদু তাঁদের মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের মতো অকেজো করে রেখেছিল।

সত্যি কথা বলতে কি, জরুরী অবস্থার নিতান্ত দুঃসময়ের দিনগুলিতে বোম্বাই-য়ের কিছু নির্ভীক সাংবাদিক যাঁরা 'ওপিনিয়ন' পত্রিকাটিকে কেন্দ্র করে জরুরী অবস্থার স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন এবং জনমানুষের কাছে দায়বদ্ধ পশ্চিমবাংলার কিছু বিবেকী লেখক-বুদ্ধিজীবী-শিল্পী-নট-সাংবাদিক বাদ দিলে গোটা ভারত জুড়ে তখন ক্লীবতার নিষ্ক্রিয়তা বিরাজ করছিল। বৃহত্তর বুদ্ধি-জীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবেকের মন্থন যদি ঘটেও থাকে, সেই দৃশ্য বিসদৃশভাবেই লোকচক্ষুর অগোচর ছিল, সমাজমনের উপর তার কোন প্রভাব পড়েনি বা তার ফল.ফল কেউ প্রত্যক্ষ করেনি।

তাই বলছিলাম, বুদ্ধিজীবীদের আবার তাঁদের বৃত্তিগত ভূমিকা সার্থকভাবে পালন করার দিন এল। যে, আত্মিক ও মানসিক সংকটের মধ্যে তাঁরা বর্তমানে রয়েছেন সেই সংকট কাটিয়ে উঠতে হলে তাঁদের নিষ্ক্রিয়তা ঝেড়ে ফেলতে হবে, নির্জীবতার অবসান ঘটিয়ে নির্ভীকতায় জ্বলে উঠতে হবে। বুদ্ধিজীবী যদি তাঁর অন্তরের কথা প্রকাশ্যে বলতে ভয় পান তবে তিনি বুদ্ধিজীবীই নন। ক্ষমতা-বানের ভ্রূকুটি, শাসক শ্রেণীর আরোপিত বাধা-বিপত্তি অথবা লোকনিন্দার ভয় অগ্রাহ্য করে স্বীয় বিবেকের প্রতি দায়বদ্ধ ও জনসাধারণের মঙ্গল পরায়ণ বুদ্ধি-জীবী সর্বদাই মানুষের প্রতি তাঁর কর্তব্য করে যাবেন। এ যদি তিনি করতে পারেন তাহলে জনসমাজে তাঁর সম্মানের স্থান সুনিশ্চিত। সে ক্ষেত্রে কোন বিরূপ অবস্থাই তাঁকে তাঁর মর্যাদার অধিকার থেকে ভ্রষ্ট করতে পারবে না।

বই পড়ার অভ্যাস

বই পড়ার অভ্যাস একটা মহৎ অভ্যাস। এই অভ্যাসকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখা একটা দৈব আশীর্বাদের মতো। যিনি এই অভ্যাস আমৃত্যু বাঁচিয়ে রাখতে পারেন তাঁর আর ভয় থাকে না, তিনি কর্ণের কবচ কুণ্ডলের মতো সহজাত বর্মের অধিকারী হয়ে থাকেন। কেননা পড়ার অভ্যাস সর্ব সময়ের জন্য বাঁচিয়ে রাখার অর্থ হলো জীবনকে সজীব রাখা, সতেজ রাখা, স্বাস্থ্যবান রাখা।

কৌতূহলকে জীইয়ে রাখা হল আসল কথা। বই পড়ার সাহায্যে এই কৌতূহল সর্বক্ষণ জীইয়ে রাখা সম্ভব হয়। কৌতূহল মরে গেলে মানুষের অপমৃত্যু ঘটে। নূতন নূতন জিনিস জানবার, শেখবার, উপভোগ করবার আগ্রহটাই যদি মরে গেলো তাহলে জীবনে থাকলো কি ? বই পড়ার লাভ এখানে যে, বই পড়ার ফলে ওই আগ্রহটা বেঁচে থাকে। নিত্য নতুন জিনিস জানবার বুঝবার তাগিদে জীবনে আসে সচলতা, গতিবেগ, উৎসাহ আর যে কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হবার মতো প্রয়োজনীয় বুদ্ধি ও মনোবল। নিত্য নূতন বইয়ের সঙ্গে সংযোগ রেখে চললে মন বুড়িয়ে যেতে পারে না, দেহে বয়সের ভার নেমে এলেও অন্তরের তারুণ্য সঞ্জীবিত থাকে। মনের বয়স কাঁচা রাখতে পারার মতো দেহের সম্বল আর কিছু হতে পারে না।

বইয়ের উপকারিতা

অনেকেই দেখা যায় স্কুল কলেজের দেউড়ি পেরোবার পর কর্মজগতে নেমে বইয়ের সঙ্গে আর সংযোগ রাখেন না, তখন খবরের কাগজ পড়াটাই সার হয়, কেউ কেউ খবরের কাগজটাও ছুঁয়ে দেখেন কিনা সন্দেহ। এঁদের বেলায় পড়ার অভ্যাস বাঁচিয়ে রাখা তো পরের কথা, পড়ার ইচ্ছাটাই যেন মরে যায়। এটা মোটেই সুলক্ষণ নয়। পড়ার ইচ্ছা মরে যাওয়ার অর্থই হলো মন ঝিমিয়ে পড়া, মন অবলম্বনশূন্য হয়ে পড়া। কাজের মধ্যে মনকে ব্যাপৃত রাখা যায় কিন্তু কাজের অন্তে মন যখন নির্বস্তুক হয়ে পড়ে তখন তাকে ভরিয়ে রাখবার কি উপায় ? এই ক্ষেত্রে বইয়ের তুল্য সহায়ক বন্ধু আর নেই।

অবশ্য রুচিভেদ বা প্রবণতাভেদে অবসরের সময়গুলিকে অনুপ্রাণিত করে

তোলবার জন্য কেউ কেউ সঙ্গীতের আশ্রয় গ্রহণ করেন, কেউ রেডিও শোনেন বা হালের রেওয়াজ অনুযায়ী টেলিভিসন দেখেন, কেউ থিয়েটারে সময় কাটান, কেউ কেউ আবার এ সবের কিছুই করেন না, স্রেফ গল্প-আড্ডা বিশ্রম্ভালাপে অবসর বিনোদন করেন। কিন্তু যিনিই যাই করুন, তাঁকে এক সময় না এক সময়ে বইয়ের শরণ নিতেই হবে। কেননা বই ঘুমন্ত মনকে জাগিয়ে তোলে, ক্লান্ত মনকে চাঙ্গা করে তোলে, অবলম্বনশূন্য মনকে অবলম্বন করবার মতো একটা নিরেট বস্তু জোগায়।

শেষোক্ত কথাটা বিশেষ ভেবে দেখবার মতো। মন কখনও শূন্যের মধ্যে বিচরণ করতে পারে না। তাকে একটা না একটা কিছু নিয়ে ব্যাপৃত থাকতে হয়, তা সেটা ভালই হোক আর মন্দই হোক। ভাল চিন্তার অবলম্বন না পেলে মন হয় অর্থহীন চিন্তায় সময় কাটাবে, না হয় ক্ষতিকর চিন্তার দিকে ঝুঁকবে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই মন শূন্যতায় বিরাজ করবে না, করতে চাইবে না। মনের সেটা ধর্মই নয়। এই কারণেই বলা হয়, 'অলস মন শয়তানের কারখানা'। এর তাৎপর্য আর কিছুই নয়, এইটে বোঝান যে, মনকে যদি ভাল চিন্তায় ব্যস্ত রাখা না যায়, তাহলে তা হয় অসার চিন্তা করবে নয়ত অনিষ্ট চিন্তার দিকে ঝুঁকবে। প্রায়শঃ অনিষ্টকর চিন্তার দিকেই নিরালম্ব মনের পক্ষপাত দেখা যায়। উদ্ভট, অসংলগ্ন, অর্থহীন চিন্তাও যথেষ্ট ক্ষতিকর। কেননা তার থেকে চিন্তা রোগের জন্ম হয়। চিন্তার যখন কোনো লক্ষ্য থাকে না, তখন তা ব্যাধিরই নামান্তর। আমাদের দেশে মনের যথার্থ অবলম্বনের অভাবে কত লোক যে চিন্তা ব্যাধিতে ভোগে তার ইয়ত্তা নেই।

মনীষীদের অভিমত

এইখানেই বইয়ের ভূমিকা। বই, অবশ্য ভাল বই, যেমন তেমন বইয়ের কথা বলছি না। সদ্‌গ্রন্থ মানুষের জীবনে সত্যিকারের বাঁচার মতো অবলম্বন এনে দেয়, তাকে সক্রিয় করে, প্রাণবান্ করে, স্বাস্থ্যময় করে। পৃথিবীর তাবৎ মনীষী ব্যক্তিরাই বইয়ের প্রশংসায় মুখর। মধ্যযুগের ইউরোপের শ্রেষ্ঠ কবি দান্তে গ্রন্থ পাঠকেই তাঁর জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান কাজ বলে মনে করতেন। বস্তুতঃ তাঁর চোখে জীবনটাই ছিল গ্রন্থ পাঠের এক অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ। "ইল লুঙ্গো স্টুডিস"। কবি মিল্টন বলেছেন, একখানি ভাল বই হলো একটি মহৎ আত্মার বহুমূল্য

শোণিত যা পরবর্তী কালের জন্য (মিশরের মমির মতো) সঞ্জীবিত ও সংরক্ষিত থাকে। কবি সাদে বইকে বলেছেন, "তাঁর সর্বক্ষণের বন্ধু, যার সঙ্গে তিনি দিন-রাত সংলাপ চালিয়ে থাকেন"। বেকন বইয়ের শ্রেণীভেদের প্রসঙ্গে বলেছেন, এমন কিছু কিছু বই আছে যা বার বার পড়ার অপেক্ষা রাখে, সেগুলিকে বার বার পড়ে "পরিপাক ও জীর্ণ" করতে হয়। বারট্রাণ্ড রাসেল বলেছেন, 'সংসারে জ্বালা যন্ত্রণা এড়াবার প্রধান উপায় হচ্ছে, মনের ভিতর আপন জগৎ সৃষ্টি করে নেওয়া এবং বিপদকালে তার মধ্যে ডুব দেওয়া। কিন্তু এই আপন জগৎ সৃষ্টি কি উপায়ে করা যায়? একাধিক উপায় হয়ত আছে। তবে তার মধ্যে বই পড়া যে একটি সেরা উপায়, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। মনোমতো বই হাতের মুঠোয় পেলে তার সাহায্যে কি মনোমতো জগৎ সৃষ্টি করা যায়? এই প্রসঙ্গে কেউ কেউ হয়তো দেশ ভ্রমণের উল্লেখ করতে পারেন। কিন্তু দেশ ভ্রমণ প্রভৃত উদ্যম-সাপেক্ষ, ব্যয়সাপেক্ষ। বই পড়ার খরচ তার চেয়ে অনেক, অনেক কম, বঞ্চাটও তুলনায় নিতান্তই স্বল্প। আর, এমন অনেক পাঠক আছেন যাঁরা বই পড়েই ভ্রমণের সুখ পান। ভ্রমণের স্থানগুলিতে কল্পনায় বিচরণ করে মনে মনে ভ্রমণের আনন্দ অনুভব করেন। কথায়ই বলে "মনসা মথুরাগমন"। ভ্রমণের গন্তব্যস্থানরূপ মথুরায় বইয়ের পাতায় ভর করে অনায়াসে পাড়ি দেওয়া যায়, এ বহু পাঠকের পরীক্ষিত অভিজ্ঞতা।

মনীষীদের কথায় আমাদের দেশের প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের কথা মনে পড়ে। তিনি তাঁর 'প্রবন্ধ সংগ্রহ, ১ম খণ্ডে' লাইব্রেরির উপকারিতা বর্ণনা করতে গিয়ে এমন পর্যন্ত বলেছেন যে, "লাইব্রেরির সার্থকতা হাসপাতালের চাইতে কিছু বেশি।" এ কথায় এই গরিব দেশে অনেকে খুব সম্ভবত চমকে উঠবেন। কিন্তু একটু তলিয়ে চিন্তা করলেই বোঝা যাবে এতে চমকাবার কিছু নেই। লাইব্রেরি কিছু নিরবয়ব বস্তু নয়, তা বইয়ের সংগ্রহ ও সমষ্টি। বই যত পড়া যায় তত লাইব্রেরির সার্থকতা। আর বই পড়া মানেই হলো সমাজে আলো ছড়িয়ে পড়া। এক একটি ভাল বই পড়ার অর্থ এক একটি প্রদীপ জ্বলে ওঠা। প্রদীপের আলোতে অন্ধকার দূর হওয়া। অজ্ঞানতার অন্ধকার। অজ্ঞানতাও একটা ব্যাধি, দেহজ ব্যাধির চেয়ে তার ক্ষতিকর প্রভাব কোনো অংশেই ন্যূন নয়, বরং বেশি। এই পরিপ্রেক্ষিতেই চৌধুরী মহাশয় লাইব্রেরির সার্থকতা হাসপাতালের চেয়ে কিছু কম নয় বলে মন্তব্য করেছেন।

শিক্ষক সমাজের কর্তব্য

সমাজে বইয়ের প্রচার যত বাড়ে ততই মঙ্গল। বইয়ের প্রচার বাড়া মানেই হলো অন্ধকার এলাকা ক্রমশঃ সংকুচিত হয়ে আসা, এক্ষেত্রে আমাদের শিক্ষক সমাজের একটি বিশেষ দায়িত্ব আছে বলে মনে করি। বিশেষতঃ, স্কুলের শিক্ষক সম্প্রদায়ের। স্কুলের শিক্ষক মহাশয়দের উচিত খুব ছোটবেলা থেকেই ছাত্র-ছাত্রীদের মনে বইয়ের অনুরাগ জন্মিয়ে দেওয়ার জন্য সচেষ্ট হওয়া। নানা কৌশলে এ কাজ সম্পাদন করা যায়। পাঠ্য পুস্তকের প্রতি ভীতি দূর করে, ক্লাশ পাঠ্যের বাইরেকার বইয়ের জগতের প্রতি বিদ্যার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে, চিত্তাকর্ষক বই পড়তে তাদের সচেতনভাবে উৎসাহিত করে, অধীত বইয়ের বিষয়বস্তুর ভালমন্দ সম্পর্কে ছেলেমেয়েদের আলোচনার সুযোগ দিয়ে। এমনি আরও একাধিক উপায় উদ্ভাবন করা যায়। তা না করে শিক্ষক মহাশয়েরা যদি সর্বদা বেত্রপাণি হয়ে থাকেন এবং পড়া যথাযথ না বলতে পারার দরুন শিক্ষার্থীদের কেবলই লাঞ্ছিত করতে থাকেন তাহলে সেই যে বালক-বালিকার কচি মনে পড়াশোনার প্রতি আতঙ্ক জন্মে যেতে পারে, তা আর হয়ত সারা জীবনেও দূর হওয়া সম্ভব হয় না। ভয়ের মনস্তত্ত্ব তখন পাঠ্য কেতাবের গণ্ডী অতিক্রম করে যে কোনো ধরনের কেতাবের অভিমুখেই পরিব্যাপ্ত হতে পারে। ভয় যদি একবার মনে শিকড় গেড়ে বসবার সুযোগ পায়, সেক্ষেত্রে ভয়ের অব-সেপে পাঠ্যবই আর সাধারণ জ্ঞান ও আনন্দের বই দুই-ই অবিলপ্ত হয়ে ওঠে। এই বিপদ থেকে নবীন বয়সী ছাত্রছাত্রীদের রক্ষা করবার জন্য বিশেষ অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

সাহিত্য পাঠকের প্রতি নিবেদন

সম্প্রতি পত্রান্তরে একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ পড়লাম। তাতে সম্পাদকীয় লেখক আক্ষেপ করেছেন যে, বর্তমান বাংলাসাহিত্যে ভালো জ্ঞানমূলক বইয়ের আর কদর নেই। কদর নেই বলে, প্রকাশকেরাও আর ওই জাতীয় বই তেমন আগ্রহ করে ছাপাতে চান না। একখানা উৎকৃষ্ট সৎ গ্রন্থের মাত্র পাঁচ শত কপি বাজারে কাটতে অনেক বৎসর লেগে যায়। প্রকাশকেরা ব্যবসায় করতে বসেছেন, বই বিক্রি করে কিছু অন্ততঃ মুনাফা তাঁরা করতে পারবেন এই আশাতেই তাঁদের পুস্তকব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়া। নিছক সৎ গ্রন্থ প্রকাশের আকর্ষণে তাঁদের সৎ গ্রন্থ প্রকাশ করতে বলা তাঁদের কাছ থেকে একটু বেশী আশা করার সামিল হয়। সৎ গ্রন্থ প্রকাশ রূপ আদর্শবাদের পোষকতা করতে গিয়ে কেবলই যদি তাঁদের লোকসান দিতে হয় তবে প্রাণ ধরে তাঁদের সৎ গ্রন্থ প্রকাশের জন্য অনুরোধ করাও যায় না, সেটা সংগতও হয় না। আর যাই হোক, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার জন্য তো কেউ ব্যবসায়ে অবতীর্ণ হননি।

বর্তমান বাংলা সাহিত্যের এই যে সমস্যা, এই সমস্যার সমাধানের উপায় কী। এটা আজ অতি প্রত্যক্ষ যে, সম্পাদকীয় লেখক যাকে 'ভূষিমাল' রূপে অভিহিত করেছেন সেই তথাকথিত সৃষ্টিমূলক গল্পোপন্যাসের প্লাবনে বাংলাসাহিত্য ভেসে যাবার উপক্রম হয়েছে। প্রকাশকদের ঘর থেকে উপন্যাস বা গল্পের বই যদি ছাপা হয় আশিখানা, তো সব রকমের জ্ঞান-বিজ্ঞানমূলক বই একত্র মিলিয়ে ছাপা হয় মাত্র কুড়িখানা। অর্থাৎ শতাংশের হিসাবে দুই ধরনের বইয়ের অনুপাত হল ৮ : ২। স্বর্গত রাজশেখর বসু মহাশয় একবার বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বিভিন্ন শ্রেণীর পুস্তকাবলীর সংখ্যানুপাত প্রকাশ করেছিলেন। তার থেকে দেখা যায়, তাঁর হিসাব অনুযায়ী নাটক, নবেল, কাব্য, রম্য রচনা জাতীয় 'সুকুমার সাহিত্য' আখ্যাধারী বইয়ের গড় হল সত্তর আর অবশিষ্ট ভাগে পড়ে অন্য সকল শ্রেণীর বইয়ের সাকুল্য সংখ্যা। বসু মহাশয়ের পরলোকগমনের পর অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে। পুস্তক প্রকাশন জগতের নানা ধরন-ধারন লক্ষ্য করে এবং অন্যান্য আরও কতিপয় অনুমানের ভিত্তিতে আমরা আমাদের উপরের

সিদ্ধান্তে (৮ : ২ অনুপাত) উপনীত হয়েছি। এই অনুপাত-নিরূপণে যদি ভুল হয়ে থাকে তো মনে করতে হবে যে সেই ভুল ন্যূনতার দিকেই হওয়া সম্ভব, অতিরঞ্জনের দিকে নয়। আমরা সংখ্যাতত্ত্ববিদ্ নই, সংখ্যাতত্ত্ববিদ্‌রাই শুধু বৈজ্ঞানিকভাবে নির্ভুল হিসাব উপস্থাপিত করতে পারেন।

এই যে বাংলা পুস্তক প্রকাশন জগতের একটা চিত্র উপস্থিত করা গেল, এর ভিতরের কথাটা কি? ভিতরের কথাটা কি এই নয় যে, ভূষিমালের দৌরাত্ম্যে ও বাহুল্যে সাহিত্যের ক্ষেত্র থেকে সরেস মাল অন্তর্হিত হবার উপক্রম? অর্থনীতির সূত্রে পাই: খারাপ টাকা নাকি ভালো টাকাকে বাজার থেকে খেদিয়ে বিদায় করে। এও কি সেই ধরনের একটি ব্যাপার নয়? অধম মুদ্রা কর্তৃক উত্তম মুদ্রার এইরূপ ক্রমিক বিতাড়ন যদি অনির্দিষ্ট কালের জন্য চলতেই থাকে তো এমন দিন কি খুব সুদূর, যখন বাংলা ভাষায় পড়বার মতো জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই আর খুঁজেই পাওয়া যাবে না, বাজার জুড়ে থাকবে শুধু উপন্যাস আর উপন্যাস আর উপন্যাস এবং অনুরূপ ধরনের বই? অবস্থাটা কল্পনা করতেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

এ কথা অনুমান করবার কোনোই হেতু নেই যে, বর্তমান লেখক উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক প্রভৃতি সুকুমার সাহিত্যের বিরোধী। মোটেই তা নয়। বরং সত্যিকারের ভালো উপন্যাস গল্প নাটক জাতীয় বইয়ের তিনি একজন উৎসাহী পাঠক। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, তাঁর মনোযোগ শুধু এই ধরনের পুস্তকপাঠেই নিবদ্ধ, তিনি সমপরিমাণ উৎসাহ নিয়ে, তেমন তেমন বইয়ের বেলায় অধিকতর উৎসাহ নিয়ে, ইতিহাস, ধর্ম, রাষ্ট্রনীতি, সমাজ-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের বইও পড়েন। পাঠকের মনের বিকাশের পক্ষে তাঁর পাঠক্রিয়ায় এই বিষয় বৈচিত্র্য অতীব আবশ্যক। তা নয় তো মন একপেশে হয়ে যায়, সব দিকে মাত্রাসাম্য রেখে মনের বাড় হয় না।

আর তা ছাড়া কল্পনাই তো মানুষের একমাত্র উপজীব্য নয়, জ্ঞানান্বেষণের প্রবৃত্তি আর চিন্তাশীলতাও তাতে সহজাত। মনের একদিককার ক্ষুধাকে সম্পূর্ণ অপরিতৃপ্ত রেখে কেবলমাত্র অন্য এক দিকের ক্ষুধাকেই যদি পরিতৃপ্ত করবার চেষ্টা করা যায় তো সেই মনের যথাযথ পরিপুষ্টি কোনোমতেই হতে পারে না। যে জাতি শুধু কল্পনায় বাঁচে, চিন্তায় বাঁচে না, তার অতিমাত্রা কল্পনাপ্রিয়তা পরিণামে তার ধ্বংসের কারণ হয়। মানুষের কল্পনানুভূতি থাকা ভালো, নইলে

জীবন বিশুষ্ক হয়ে যায়, রসের অভাবে প্রাণ আনন্দহীন হয়ে পড়ে। কিন্তু সেই কল্পনানুভূতি যদি জ্ঞানের দ্বারা সুরক্ষিত না হয়, চিন্তাভ্যাসের দ্বারা বাস্তব ভিত্তি না পায়, তা হলে ওই কল্পনানুভূতির সূত্রেই আসে অলস ভাববিলাস, কর্মবিমুখতা, চিন্তাশৈথিল্য এবং আরও নানাবিধ অনর্থ। মন যখন বাড়তে থাকে, তার সামনে নানা ধরনের মানসিক খাদ্য সাজিয়ে দিতে হয়। একজন বয়স্ক পাঠক কেবলই যদি রম্য সাহিত্য পড়ে, আর কিছু না পড়ে, তাহলে তার কর্মস্পৃহা ও বাস্তববুদ্ধি লোপ পেতে বাধ্য। ক্রমাগত বানানো গল্প পড়তে পড়তে জীবনটাকেও তার বানানো বলে মনে হবে এবং তার ফলে জীবন থেকে বাস্তববোধ লোপ পেয়ে যাবে। এ অতি সাংঘাতিক অবস্থা— এই কর্মজ্ঞানশূন্য কল্পনাপ্রিয়তার অভ্যাস।

এই কারণেই দেখা যায়, শিশুর যখন দন্তোদ্‌গম হয়, তখন মা তাকে শুধু দুধই খেতে দেন না, তরল খাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে তাকে কিছু পরিমাণ নিরেট খাদ্যও খেতে অভ্যাস করান— দু-চার গ্রাস করে তাকে ভাতের ডেলাও খাওয়ান। এর তাৎপর্য হচ্ছে, বর্ধমান দেহের পক্ষে তরল খাদ্যই যথেষ্ট নয়, নিরেট খাদ্যও সমপরিমাণে, কিংবা অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণে আবশ্যক। বর্ধমান দেহের বেলায় যে কথাটা প্রযোজ্য, বিকশমান মনের বেলায়ও সে কথা সমান প্রযোজ্য। উপমা রূপান্তরিত করে বলা যায়, তরল খাদ্য হল গল্প, উপন্যাস জাতীয় মূলতঃ কল্পনাশ্রিত সাহিত্য ; আর নিরেট খাদ্য ইতিহাস, জীবনী, ধর্ম, দর্শন, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি মূলতঃ জ্ঞানমার্গের বই। বিজ্ঞানমূলক বই। দুই জাতীয় পাঠ-ক্রিয়ার মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটাতে না পারলে পাঠক্রিয়া একদেশদর্শী হয়ে পড়ে। জীবনের সকল বিভাগের মতো এই বিভাগেও একদেশদর্শিতা ক্ষতিকর।

অনেকে এই যুক্তিতে গল্পোপন্যাসকে সমর্থন করেন বা প্রাধান্য দেন যে, গল্পোপন্যাস জাতীয় রচনা হল সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য ; পক্ষান্তরে ইতিহাস, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞান-জাতীয় বই সৃজনী আবেগবঞ্চিত নিছক মননধর্মী রচনা মাত্র। সে সব বইয়ে জ্ঞানের প্রভূত উপাদান থাকলেও যেহেতু তাদের ভিতর সৃজনধর্মী আবেগ নেই, সেই কারণে সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের সঙ্গে তাদের কোনো তুলনাই চলতে পারে না।

এই যুক্তিক্রমকে আপাতদৃষ্টিতে অখণ্ডনীয় বলে মনে হতে পারে, কিন্তু যতটা অখণ্ডনীয় বলে মনে করা হচ্ছে ততটা অখণ্ডনীয় নয়। ওই যুক্তির ভিতর ফাঁক

আছে। ফাঁক বিবিধ। যেমন, 'সৃষ্টিধর্মী' কথাটার সংজ্ঞা প্রথমে নির্দিষ্ট হওয়া দরকার। কোন্ ধরনের রচনাকে সৃষ্টিধর্মী বলে আর কোন্ ধরনের রচনাকে বলে না, সে সম্বন্ধে ধারণার অস্পষ্টতা থাকলে ওই ভিত্তিতে বিচার ক্রিয়ায় অগ্রসর হওয়াই অসম্ভব। কোনো বইয়ের উপর 'সৃষ্টিধর্মী' ছাপ দিলেই সেটা সৃষ্টিধর্মী হয়ে যায় না, আর কোনো বই সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য রূপে পরিচিত না হওয়া সত্বেও এমন হতে পারে যে, তার ভিতর সৃষ্টির আবেগ থাকতে পারে। বানানো লেখা মানেই কল্পনাকুশল লেখা নয়; পক্ষান্তরে জ্ঞানবাদী লেখা মানেই কল্পনা বর্জিত লেখা নয়। সবটাই নির্ভর করে লেখকের মানসিক প্রস্তুতি, বিদ্যা-বৈদগ্ধ্য ও দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিকতার উপর। আমাদের সাহিত্যে 'সৃষ্টিধর্মী' সাহিত্য নাম নিয়ে যে সব বই বাজারে চলে ও চালানো হয়, তার অধিকাংশ হল সংকীর্ণ মধ্যবিত্ত মানসিকতাপ্রসূত সাহিত্য, গার্হস্থ্য সাহিত্য, আরও স্পষ্ট করে বললে, হেঁসেল সাহিত্য। এ সাহিত্য যতই বানানো হোক, তার বিষয়বস্তু এতই মামুলী আর সাদামাঠা ও প্রাত্যহিকতার মালিন্যযুক্ত যে এর ভিতর প্রকৃত কল্পনা বা সৃজনী অভীপ্সা থাকে বলে তার হাওয়া মোটে খেলতেই পারে না— ও জিনিস যাকে বলা হয়েছে 'ভূষিমাল' সেই বর্গেরই সাহিত্য, অবশ্য 'সাহিত্য' যদি তাকে আদৌ বলা যায়। আমাদের দেশের কোনো কোনো লেখক বা লেখিকা দেখা যায়, নিছক দাম্পত্য সাহিত্য বা হেঁসেল সাহিত্যের চর্চা করে বাজারে সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যিকরূপে নাম কেনেন। তাঁদের এই খ্যাতির ভিত্তি অতিশয় নড়বড়ে, পলকা। সামান্য একটা টোকাতেই ওই ভিত্তি বিপর্যস্ত করে দেওয়া যায়।

এঁদের গল্পোপন্যাসের বিষয়বস্তু কি? হয় নতুন ডিজাইনের গয়নার বায়নার সুবাদে কিংবা স্বামীর প্রতিরোজ রাত্রি ক'রে বাড়ী ফেরার অভ্যাসের সূত্রে স্বামী-স্ত্রীর ভিতর মান-অভিমানের পালা; নয়তো বাজার নিয়ে বাড়ী ফিরতে দেরী হওয়ার দরুন কর্তার আপিসের ভাত বেড়ে দেওয়ার বেলা হয়ে যাওয়ায় নেত্যকালী ঝিয়ের সঙ্গে গিন্নীমায়ের বচসা— এগুলি কি সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য? না তাতে কল্পনার কোনো খেলা আছে? নিতান্তই দৈনন্দিনতায় মলিন গতানুগতিক ঘটনার ছবি এগুলি। কিন্তু তাই নিয়েই সৃষ্টিধর্মিতার কত অভিমান, লেখক-মহলবিশেষে আত্মপ্রসাদের কত বায়নাক্কা। ওঁদের ওই অহংকারে পরিস্ফীত বেলুনটিকে এক লহমায় চুপসিয়ে দেওয়া যায়— কেননা ধোঁয়া ছাড়া ওতে আর কিছু নেই।

সেই তুলনায় যাঁরা সমগ্র জীবনের সাধনায় একনিষ্ঠ জ্ঞানের চর্চায় দ্বারা ইতিহাস, অর্থনীতি, দর্শন বা ধর্মতত্ত্বের বিষয়ের উপর উত্তুঙ্গ ও বিশাল রচনাসৌধ গড়ে তোলেন, তাঁরা অনেক বেশী সৃষ্টিধর্মী, অনেক বেশী কল্পনাপ্রবণ, অনেক বেশী সমাজের হিতকারক। হাল্কা গল্প-উপন্যাস রম্যরচনা প্রভৃতি চুটকি বইয়ের কারবারী লেখক সাহিত্যসৃষ্টির নামে সাহিত্যের অহিতই করেন বেশী, আর এঁদের দ্বারা দেশ ও জাতির কত ভাবে যে উপকার হয় তা বলে শেষ করা যায় না। একজন গিজো, গিবন বা আর্নল্ড টয়েনবী যখন তাঁদের সমগ্র জীবনের অনুশীলনের সারাৎসাররূপে ইতিহাসের নূতন মূল্যায়ন উপস্থিত করেন তখন তাঁদের কল্পনার বিশালতায়, জ্ঞানের ভূয়িষ্ঠতায়, অধ্যবসায়ের অদম্যতায় চমৎকৃত হয়ে পড়তে হয়। এঁরা সৃষ্টিধর্মী লেখক নন তো সৃষ্টিধর্মী লেখক হলেন তুচ্ছ বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবনের ছাই-পাঁশ আবর্জনা পরিবেশনকারী তথাকথিত 'কল্পনা-কুশল' লেখকের দল? বটে! যে সৃষ্টিধর্মিতার ধারণার ভিতর বৃহত্তর জীবনের হাওয়া চলাচল করতে পারে না, মহৎ জীবনের আলোর ঝিলিক প্রবেশ করে না, তেমন সৃষ্টিধর্মিতাকে আমরা দূর থেকে দণ্ডবৎ করি।

দ্বিতীয়তঃ, সুকুমার সাহিত্য নামধেয় রচনা আর জ্ঞানবাদী সাহিত্য নামধেয় রচনা— এ দুইয়ের ভিতরে বোধ হয় প্রতিতুলনা না করাই ভালো। দুটো দু'-জাতের জিনিস, কাজেই একের শ্রেষ্ঠত্ব আর অপরের অপকৃষ্টত্বের কোন কথাই এখানে উঠতে পারে না। আমও ভালো, সন্দেশও ভালো, কিন্তু আম বেশী ভালো, কি সন্দেশ বেশী ভালো এই নিয়ে প্রতিতুলনায় অগ্রসর হয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। দুয়ের স্বাদ বিচারের মানদণ্ড আলাদা। দুটি দুই জাতের বস্তু আর দুইয়ের স্বাদনিরূপণে ব্যক্তির রুচি পছন্দের ভেদ একটি মুখ্য গণনীয় বিষয়। কে কি ভাবে ওই দুইকে গ্রহণ করছে তারই উপর নির্ভর করছে ওই দুইয়ের স্বাদের শ্রেষ্ঠাশ্রেষ্ঠত্বের ধারণা।

এই যদি প্রকৃত অবস্থা হয় তো উপরে দুয়ের ভিতর আমি প্রতিতুলনা করলুম কেন?— করলুম স্বতঃপ্রবৃত্ত ইচ্ছার বশে নয়, তথাকথিত সৃষ্টিধর্মিতার অভিমানযুক্ত ব্যক্তিদের আত্মপ্রসাদের ভিত্তি যে কত শিথিল সেটি দেখাবার জন্য। তাঁদের অহংকারই বর্তমান লেখককে এই প্রতিতুলনামূলক বিশ্লেষণে প্ররোচিত করেছে। নয় তো দুই বিসদৃশ বস্তুর ভিতর প্রতিতুলনার কোনো কথাই উঠতে পারে না। ইংরেজী সাহিত্যে এই দুই গোত্রের রচনাকে পরিষ্কার

আলাদা করে চিহ্নিত করা হয়েছে— 'লিটারেচার অব্ পাওয়ার' ও 'লিটারেচার অব্ নলেজ' ব'লে। সুতরাং তাদের ভিতর সংঘর্ষের কোনো অবকাশ থাকা উচিত নয়। তবে এ কথা এই প্রসঙ্গে সর্বদা স্মরণ রাখলে ভালো হয় যে, 'লিটারেচার অব্ পাওয়ার'-এর লেবেল এঁটে সাধারণ্যে যা কিছু আত্মপ্রকাশ করে তাই 'লিটারেচার অব্ পাওয়ার' নয়— শক্তির লক্ষণযুক্ত সাহিত্যের নামে আসলের ছদ্মবেশে অনেক ফাঁকী ও মেকী সেখানে চলে।

আমাদের মনে হয় বাংলা সাহিত্যের পাঠকসম্প্রদায় যদি প্রথম থেকে সংকল্পবদ্ধ হন যে, তাঁরা বাছ-বিচার না করে উপন্যাস-সাহিত্য পড়বেন না, যা-কিছু হাতের কাছে আসে তা-ই গ্রাহ্য করবেন না; পক্ষান্তরে সমাজের অগ্রগতির সহায়ক সত্যিকারের উপাদেয় জ্ঞান-বিজ্ঞান মূলক বইয়ের উত্তরোত্তর আনুকূল্য তাঁরা করবেন; তা হলে বাংলা সাহিত্যের বর্তমান শোচনীয় অবস্থার কিছু পরিবর্তন হতে পারে। এমন আবহের সৃষ্টি করা চাই যাতে মননশীল সাহিত্য পোকায় না কেটে বাজারে কাটে। আর আবর্জনা-সাহিত্যের অতি-প্রচার রুদ্ধ হয়।

এই ক্ষেত্রে পাঠকদের ভূমিকাটাই প্রধান। পাঠক অর্থে এখানে পুস্তকক্রেতা এবং পুস্তকপাঠক দুইকে একত্র করে দেখা হচ্ছে। খতিয়ে দেখতে গেলে পুস্তকক্রেতার ভূমিকা পুস্তকপাঠকের ভূমিকার চেয়ে বড়। প্রকাশক তো পুস্তক প্রকাশ করেই খালাস, কিন্তু প্রকাশিত পুস্তক যদি ক্রেতা কিনতে অস্বীকার করে তবে প্রকাশকের বড়ই মুশকিল। এই জন্যই বলেছিলাম যে, কোন্ বই সমাজে চলবে, না চলবে সে ব্যাপারে প্রকাশক অপেক্ষা পুস্তকক্রেতা তথা পুস্তক-পাঠকের ভূমিকাটাই অধিক তাৎপর্যপূর্ণ, অধিক মূল্যবান।

উপরে যে ধারার সংকল্পের কথা বললুম, পাঠকসমাজ অনুরূপ সংকল্পে উদ্বুদ্ধ হোন, এই প্রতিজ্ঞা নিন যে, তাঁরা আর এখন থেকে সাহিত্যের আনুকূল্য করার নামে ভূষিমালের আনুকূল্য করবেন না— দেখতে না দেখতে বাংলা সাহিত্যের আবহাওয়া শোধিত হয়ে যাবে। সত্যিকারের সুকুমার সাহিত্য এবং সত্যিকারের জ্ঞানবাদী সাহিত্য— এই দুই দণ্ডের উপর ভর করে বাংলাসাহিত্য অব্যাহত গতিতে জয়যাত্রায় এগিয়ে চলুক।

বইমেলা

বই মেলা আমাদের দেশে একটা নতুন উৎসব। এই ধরনের উৎসব দেশে আগে ছিল না। আমাদের দেশে ধর্মীয় পালপার্বণ উপলক্ষ্যে মেলা হতো, স্মরণীয় লৌকিক ঘটনা উপলক্ষ্যে মেলা হতো, মহাপুরুষদের স্মৃতি পালনোদ্দেশ্যে মেলা হতো, আরও রকমারি কারণে মেলা হতো ; কিন্তু বইয়ের মেলা আগে কখনো হয়নি। এ জিনিসের কোন পূর্ব নজীর দেখা যায় না।

হয়ত রেওয়াজটি গোড়ায় গোড়ায় ছিল বিদেশী, বিদেশ থেকে আমরা এটা ধার করেছি। কিন্তু ধারের জিনিস হলেও তার ধার বা ভার কোনটাই কম নয়। ভাল বস্তু যে-সূত্র থেকেই আহৃত হোক না কেন তাকে স্বাগত জানাবার মতো খোলা মন (এবং প্রসারিত হাত) সর্বদাই আমাদের থাকা উচিত। অনুকরণ মহদুদ্দেশ্য প্রণোদিত তথা কল্যাণআশ্রিত হলে তার দোষ নষ্ট হয়ে যায়। হতে পারে বই মেলার ধারণাটা পশ্চিম থেকে এদেশে আমদানি হয়েছে। কিন্তু জনসাধারণ তাকে এমন সাগ্রহে ও সোৎসাহে লুফে নিয়েছে যে, রেওয়াজটিকে এখন আর বিদেশাগত বলা চলবে না, তা ইতোমধ্যেই জাতীয় সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হয়ে গেছে।

বই মেলা এখন শুধু ভারতের বড় বড় শহরেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে না, জিলায় জিলায় এমনকি কখনও কখনও মহকুমা শহরেও হতে দেখা যাচ্ছে। গত এক-দশক সময়ের ভিতর রাজধানী দিল্লী শহরে এবং কলকাতায় বেশ বড় রকমের কয়েকটি বই মেলা সংগঠিত হয়েছে। তার মধ্যে দু' একটি আন্তর্জাতিক মানের। জার্মানীর ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে যে ধরনের বিশ্ব বই মেলা হয় তার ধাঁচে দিল্লীতেও বিশ্ব বই মেলার অনুষ্ঠান হয়ে গেছে। কলকাতা শহরের আয়োজিত বই মেলাগুলিতে উত্তরোত্তর জনসমাগম বৃদ্ধি পাচ্ছে, বই কেনার আগ্রহও সমানুপাতে বর্ধমান। পুস্তক প্রীতির একটা প্রধান নিদর্শন হলো পুস্তক-ক্রয়ের ইচ্ছা। এই মানদণ্ডে বিচার করে বলতেই হয় কলকাতার বাসিন্দাদের পুস্তকানুরাগ ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। এটা খুবই শুভ লক্ষণ সন্দেহ নেই। বই মেলার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে এ কথা বোধ করি এক প্রকার নিঃসংশয়েই বলা যায় যে, বই মেলা ইদানীং বঙ্গীয় সংস্কৃতির বিবিধ অত্যাবশ্যক উপচারের অন্যতম এক উপচার।

বই মেলাকে বাদ দিয়ে আজ আর বাংলা সংস্কৃতির পূর্ণতার কথা ভাবা যায় না। এই উৎসবটি কলকাতার নগর জীবনের একটি সাম্বৎসরিক অবশ্যকৃত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে জনজীবনের উপর এমনি এর অবধারিত প্রভাব।

জনশিক্ষার বাহন

যে উৎসব বইকে কেন্দ্র করে পরিকল্পিত ও গঠিত, সে উৎসবের লক্ষ্য অতি পরিষ্কার। সমাজজীবনের স্তরে স্তরে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়াই সেই লক্ষ্য। শিক্ষার ভিতর এখানে আনন্দও অন্তর্ভুক্ত। বইয়ের মাধ্যমে বিদ্যা অর্জন এবং বিনোদন, জ্ঞান এবং চিত্তস্ফূর্তি, এই দুইয়েরই ক্ষুধা এককালীন পরিতৃপ্ত। সেই জন্যই বইয়ের এত আদর ও কদর। আর যে উৎসবের মূল কেন্দ্রবিন্দুই হলো বই, বই-ই যার শুধু মুখ্য নয়, একমাত্র উপজীব্য, সে উৎসবের আকর্ষণও একই কারণে স্বতঃসিদ্ধ বলা চলে। বই মেলা স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রন্থাগার, গ্রন্থালয়, প্রকাশনালয়— এগুলির উপরে অতিরিক্ত একটি উপকরণ, যার উদ্দেশ্য সমাজমনে জ্ঞানের আলোর প্রসার এবং সেই সঙ্গে আনন্দও বিতরণ। সমাজে যত বেশী সংখ্যক বইয়ের প্রচার হবে তত বেশী অন্ধকার দূর হয়ে আলোর বিস্তার হবে, নিরানন্দ কেটে গিয়ে আনন্দের উল্লাস ঘটবে। এই নিরিখে বই মেলা জনশিক্ষার একটি প্রকৃষ্ট মাধ্যম রূপে গণ্য হওয়া উচিত। গ্রন্থাগারের চেয়েও এর প্রভাবের পরিমাণ ব্যাপক, কেননা গ্রন্থাগার বা লাইব্রেরী একটি বিশেষ স্থানে ও আয়তনে সীমিত, বই মেলার সম্ভাবনা সেই তুলনায় অশেষ। তার প্রচার ও প্রসার লোক মুখে মুখে ও হাতেহাতে বহুগুণে বেশী সুনিশ্চিত।

অবশ্য বই মেলার সজ্জিত স্টলগুলির ব্যবস্থাপনায় যাঁরা কারক সেই পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সংস্থাগুলির ভূমিকা এ ক্ষেত্রে স্বভাবতঃই আলোচ্য। বই মেলার প্রদর্শিত বই সমূহের বিপণনে তাঁদের ব্যবসায়িক স্বার্থ থাকতে পারে কিন্তু খতিয়ে দেখলে ওই স্বার্থ ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য হওয়া উচিত নয়। ধর্তব্য নয় এই কারণে যে, বিক্রীত বইয়ের প্রচারে ও সম্প্রসারের ফলে সমাজের যে বৃহত্তর মঙ্গল সাধিত হয় তা পুস্তক প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতাদের ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত স্বার্থবুদ্ধিকে ছাপিয়ে ও ছাড়িয়ে বহু দূরে পরিব্যাপ্ত হওয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় এই ব্যবস্থার দ্বারা। পুস্তকব্যবসায়ীদের বাণিজ্যিক ভাবনা একটি আপতিক (incidental) ভাবনা মাত্র, বই মেলার সুফল কিন্তু হয় সুদূরপ্রসারী ও অত্যন্ত

দীর্ঘস্থায়ী। সমস্ত সমাজ এই ব্যবস্থার দ্বারা উপকৃত হয়। এই দিক থেকে দেখতে গেলে বই মেলার ব্যবস্থাপকদের ভূমিকা আর্থিক লাভ-ক্ষতির চিন্তার দ্বারা কতকাংশে নিয়ন্ত্রিত হলেও তাঁরা নিমিত্ত মাত্র, তাঁদের কাজের শুভংকর প্রভাব বহু দূর পর্যন্ত গড়ায় ও বহুকাল অবধি টিকে থাকে। ভাল কাজের নিমিত্ত হওয়াও একটা মস্ত বড় গৌরবের কথা।

পাঠের অভ্যাস

অবশ্য বই কেনা হলেই যে বই পড়া হবে তার কোন গ্যারান্টি নেই। কখনও কখনও ঘর সাজাবার প্রকরণ রূপে বইয়ের ব্যবহার হতে দেখা যায়। প্রসিদ্ধ লেখকদের রচিত গ্রন্থাবলীর সুদৃশ্য সেট দিয়ে আলমারী সজ্জিত করে ঘরের শোভাই শুধু বাড়াবার চেষ্টা করা হয় না, গৃহকর্তার কৌলিন্য বাড়াবারও চেষ্টা করা হয়। শোভন গ্রন্থমালায় সারিবদ্ধ বিন্যাসের দ্বারা গ্রন্থাধিকারীর সুরুচির প্রমাণ মেলে, সেটা একই সঙ্গে তার স্ট্যাটাস সিম্বলও বটে। বই পড়া হোক চাই না হোক, ঘরে বইয়ের অবস্থানই একটা শ্লাঘনীয় বস্তু, যা আগন্তুক মাত্রেরই সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেটা আর কোন কারণে নয়, এই জন্য যে, বই জিনিসটাই এমন যে তা মনে সম্ভ্রম না জাগিয়েই পারে না। তা বই পড়া হোক আর নাই হোক গৃহে বইয়ের অধিষ্ঠান বিদ্যার আদর্শের প্রতি অনুরাগের সূচনা করে, যার মূল্য অনেকখানি। বই দেখতে দেখতেই বই পড়ার বাসনা জাগা স্বাভাবিক। যিনি যত বই নাড়াচাড়া করবেন তাঁর তত বইয়ের অন্তরে প্রবেশ করবার সাধ জাগবে। সুতরাং বই দিয়ে ঘর সাজাবার অভ্যাস মোটেই নিন্দনীয় অভ্যাস নয়, ওই পথেই বিদ্যা'র দেবীর গৃহে আবির্ভাব ঘটে। চঞ্চলা লক্ষ্মীকে সহজে গৃহে বেঁধে রাখা যায় না কিন্তু দেবী সরস্বতীকে একবার বাঁধতে পারলে পরিবারের মানুষজনদের ভিতর পুরুষানুক্রমে তার অনুগ্রহের উত্তরাধিকার বর্তাতে থাকে। একাধিক ক্ষেত্রে পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে এই পাঠের ধারা অব্যাহত থাকতে দেখা যায়।

তাছাড়া, কথায়ই বলে "ধনবানে কেনে বই, জ্ঞানবানে পড়ে।" বই তো পড়বারই জন্য, তা ধনীই কিনুন আর যিনিই কিনুন। এক হিসাবে ধনীর ব্যক্তিগত বইয়ের সংগ্রহ পাবলিক লাইব্রেরীর পুস্তক সংগ্রহের ক্ষুদ্রতর প্রতি-রূপক মাত্র। অনেকের মিলিত চাঁদার দানে পাবলিক লাইব্রেরীর সৃষ্টি ও পুষ্টি,

সেইটেই যখন একক দানে গড়ে ওঠে সেটি ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু উভয়ের মধ্যে মূলে তেমন প্রভেদ নেই। কেননা লাইব্রেরী ব্যক্তিগত সংগ্রহেই গড়ে উঠুক, আর সমষ্টির চেষ্টাতেই গড়ে উঠুক, দুয়েরই সত্যিকারের উপযোগিতা সংগৃহীত পুস্তকাদির পাঠে। যে লাইব্রেরীর যত বেশী ব্যবহার তার তত সার্থকতা। অপঠিত পুস্তক সংগ্রহ উর্বর কিন্তু অকর্ষিত ভূমিখণ্ডের মতো কম বেশী নিষ্ফল।

আজকাল বিয়ের উপহার হিসাবে বইয়ের বেশ প্রচলন হয়েছে। এই অভ্যাসটিকেও আমাদের সর্বপ্রকারে উৎসাহিত করা কর্তব্য। দুদিন বাদে অকেজো হয়ে যাবে এমন পাঁচটি ইলেট্রিক ইস্ত্রি কিংবা কিছুকালের ব্যবহারে দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে যাবে এমন নড়বড়ে কয়েকটি ঝালর দেওয়া টেবিল ল্যাম্প এককালীন পাওয়ার চেয়ে গোটা কতক মূল্যবান (মূল্যবান দামে নয়, উৎকর্ষে) বই উপহার পাওয়ার সার্থকতা অনেক বেশী। এ জাতীয় উপহারের তাৎক্ষণিক মূল্য হয়ত চোখ ধাঁধাবার মতো কিছু নয়, কিন্তু তার দীর্ঘমেয়াদী মূল্য প্রভূত। কেননা বইয়ের মধ্যে জ্ঞান ও আনন্দের সঞ্চয় পোরা থাকে, ধীরে ধীরে তার মহিমা প্রকটিত হতে থাকে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের উপমার অনুকরণে বলি, শঙ্খধ্বনির মধ্যে যেমন সমুদ্র গর্জন, লোহার তারের মধ্যে যেমন বিদ্যুৎ শক্তির সঞ্চরণ, তেমনি বইয়ের কালো কালো ক্ষুদে অক্ষরের মধ্যে মনীষী ও ভাবুকদের দীর্ঘকালসঞ্চিত অমূল্য জ্ঞান ও কল্পনার ঐশ্বর্য সংহত হয়ে আছে। আপাতদৃষ্টিতে দুই মোড়কের ভিতর আবদ্ধ বইকে স্তব্ধ ও স্থির বলে মনে হয় কিন্তু একটু টোকা দিলে তার ভিতর হাজার বছরের কল-কোলাহল শুনতে পাওয়া যায়। বই দৃশ্যতঃ নীরব কিন্তু পাতা খুললেই প্রবলভাবে সরব হয়ে ওঠে। বিয়ের উপহার রূপে পাওয়া শাড়ী গয়না কিংবা খেলনা দ্রব্যের সঙ্গে তুলনীয় পূর্বোক্ত পলকা সরঞ্জামগুলির কাজ নয় দীর্ঘমেয়াদী উপযোগিতার ক্ষেত্রে বইয়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। বইয়ের জাতই আলাদা।

বইয়ের প্রকারভেদ

বইয়ের জাত আলাদা হলেও বইয়ের মধ্যে আবার নানান প্রকারভেদ আছে। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী, সমালোচনা, রম্য রচনা ইত্যাদি। তাছাড়া ইতিহাস, অর্থনীতি, নৃতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিদ্যা, ধর্ম

প্রভৃতি বিষয়ক বই। অর্থাৎ জ্ঞানমূলক বই। 'বেস্ট সেলার' জাতীয় বই, হালকা মেজাজের সুখপাঠ্য বই, মরশুমী ফুলের মতো ক্ষণিকের শোভা সম্পদ বিস্তারকারী কিন্তু পরক্ষণেই ফুরিয়ে যাওয়া বাহারী ধাঁচের বই ; আবার ধ্রুপদী বা চিরায়ত মূল্যের বই। 'বেস্ট-সেলার' বই হলেই সেটা 'বেস্ট' বই হয় না। বরঞ্চ প্রায় উল্টোটা হতে দেখা যায়। সাহিত্যের বাজারে তথাকথিত জনপ্রিয়তা আর শিল্পোৎকর্ষ বেশীর ভাগ সময় বিপরীত অনুপাত রক্ষা করে চলে। বিক্রির বাজারে সত্যিকারের উৎকৃষ্ট বইয়ের প্রায়ই কপাল পোড়া হয়। টমাস ফুলার এইসব মন্দভাগ্য বইয়ের কথা মনে রেখেই লিখেছিলেন, "Learning hath gained most by those books by which the printers have lost." অর্থাৎ সেইসব বই থেকেই মানুষ সমধিক জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েছে যেগুলি ছেপে প্রকাশক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

কাজেই এ ব্যাপারে ক্রেতা সাধারণের একটি বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। বই মেলার বিপণনে প্রদর্শিত রাশিকৃত বই থেকে যথার্থ ক্রয়যোগ্য বই বাছাইয়ের বেলায় তাঁদের বিচারশক্তি প্রয়োগ করতে হবে। আগে ভালমন্দের নিরিখ ঠিক করে তারপর তাঁরা বই কিনবেন। কেবলমাত্র বইয়ের চটক দেখেই তাঁরা ভুলবেন না, বইয়ের অন্তঃসার কিছু আছে কিনা সেটা বিধিমতে বাজিয়ে দেখে নেবেন। ঠুনকো জিনিসের মায়ায় বিভ্রান্ত হয়ে যাতে তাঁরা সেরা বস্তু হেলায় না হারান তার জন্য তাঁদের সতর্ক থাকতে হবে। আর যাই করুন, কাঞ্চন ফেলে কাঁচ খণ্ড যেন তাঁরা আঁচলে না বাঁধেন। বই মেলার উদ্দেশ্যকে জয়যুক্ত করতে হলে এই সাবধান বাণী অবশ্যই মেনে চলতে হবে।

নির্ঘণ্ট

লে. পা. স.-১০